আলো ছায়ার খেলা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বীণাপাণি নিকেতন
১৭এফ, নলিন সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
পৌষ, ১৩৪৭ ; ডিসেম্বর, ১৯৪০

পরিচয়

এই উপন্যাস খানির প্রথম রূপটি 'মাসিক বসুমতী' এবং দ্বিতীয় [illegible] 'শারদীয়া বার্ষিক বসুমতী'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইলেও, বর্ত্তমানে উপন্যাসের আকারে নূতন রূপ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় রূপের সম্পর্কে পরিকল্পিত ইউনিভারসিটীর যে অংশটুকু এই গ্রন্থে আছে, তাহার বিকাশ ও বিভূতি পারিপার্শ্বিক ঘটনাপঞ্জির সংযোগে 'ইউনিভারসিটী' নামে এক সুদীর্ঘ উপন্যাসে রূপায়িত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে।

এই প্রসঙ্গে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত সুবিখ্যাত ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণের সহায়তার উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। এই লাইব্রেরীর সহৃদয় লাইব্রেরীয়ান, বিচক্ষণ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও গ্রন্থরক্ষকগণ আবশ্যক গ্রন্থাদি সম্পর্কে আমাকে প্রচুর সাহায্য করায় 'ইউনিভারসিটি' নামক কঠিন গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। এজন্য আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বীণাপাণি নিকেতন
১৭এফ, নলিন সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
পৌষ, ১৩৪৭ ; ডিসেম্বর, ১৯৪০

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রেষ্ঠ কথা-শিল্পীদের বিজয় অভিযান

১। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
হুইপ ২৲

২। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী প্রণীত
জল আর আগুন ২।০

৩। অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
উই আর সেভেন ২৲

৪। সরোজনাথ ঘোষ প্রণীত
১। চাবুক ২।০
২। কুয়োভেডিস্ ২৲
(ইংরেজী বইএর বাংলা অনুবাদ)

৫। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত
ধোঁয়া ২৲

৬। মতিলাল দাশ প্রণীত
১। ডাক বাংলো ২৲
২। সহচরী ২৲

৭। কুমারনাথ বসু প্রণীত
পলকে প্রণয় ১॥০

৮। ক্ষিতিনাথ ঘোষ প্রণীত
মেঘদূত ২॥০

৯। শ্রীঅমৃতলাল সেন প্রণীত
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধনা ও উপদেশ ৪৲

টেক্‌নিক্যাল বুকস্

১০। উপেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত
মাষ্টার টেইলর ২॥০

১১। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত
মোটর বিজ্ঞান ২॥০

সুকুমারমতি শিশুদের নিমিত্ত

১। পদ্মচাকী ॥৵০ ২। ভাইভ ।৵০

৩। চীনের পাখী ৸০ ৪। ময়ুরপঙ্খী রাজকন্যা ।৵০

৫। কন্যার প্রতি উপদেশ ৸০

৬। হিন্দুনারীর শিক্ষা সমস্যা ৸০ ৭। অ্যালফেবেট বুক ।৵০

মানব জীবনের
আলো ও ছায়ার খেলা
যাঁহাকে কোন দিন
অভিভূত করিতে পারে নাই
ডিক্রীতে যিনি অপ্রমত্তা
ডিসমিসেও তদ্রূপ অবিচলিতা
সুখ ও দুঃখকে যিনি
সাড়ীর অঞ্চলে ধরিয়া
হাসি মুখে
আলো-ছায়ার-খেলা
দেখিতে অভ্যস্ত
কর্ম্ম-জীবণের
সেই আদর্শ সহধর্ম্মিণীর করকমলে
এই গ্রন্থখানি শ্রদ্ধাসহকারে
সমর্পিত হইল

আলো ছায়ার খেলা

প্রথম রূপ

—এক—

ঘৃতের কারবারে প্রতাপ গাঙ্গুলী সর্ব্বস্বান্ত হইলে, কাশীর সকল সমাজেই বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। এই ব্যবসায়সূত্রে সুসময়ে গাঙ্গুলী মহাশয় বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালী সকল সমাজেরই সংস্পর্শে আসিয়া নানা অনুষ্ঠানে যে বদান্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া গুণ-গ্রাহিগণ তাঁহার পতনে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইলেন। আবার ব্যবসায়সূত্রে যাঁহারা তাঁহার প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষা করিতেন, তাঁহারা গাঙ্গুলী মহাশয়ের সর্ব্বস্বনাশে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

অথচ গাঙ্গুলী মহাশয় সকল ব্যাপারেই ব্যয়বাহুল্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার নির্ম্মল মনটির কোনখানেই অহঙ্কারের ছায়ামাত্র পড়িত না। এ কথা সকলে জানিলেও দুর্দ্দিনে এ অপবাদ হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন না।

সুসময়ে গাঙ্গুলী মহাশয়ের বন্ধু-ধুরন্ধরদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন—প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয়। ইনি শুধু টাকার কুমীর ছিলেন না, বুদ্ধিরও ছিলেন—মানোয়ারী জাহাজ! গৃহীর অলক্ষ্যে ঊর্ণনাভ যেমন ঘরের চারিধারে জাল পাতে, ইনিও তেমনই গাঙ্গুলী মহাশয়ের অলক্ষ্যে তাঁহার ব্যবসায়টির উপর নিপুণভাবে বুদ্ধির জাল অনেকদিন ধরিয়াই পাতিতেছিলেন। যে দিন গাঙ্গুলী মহাশয় সহসা তাহার সন্ধান পাইলেন, তখন আর মুক্তিলাভের কোনও উপায় ছিল না—তিনি সেই

দুশ্ছেদ্য জালে জড়াইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে ব্যবসায়টি তাঁহার সুহৃদরূপী মজুমদার-কুম্ভীর-মহাশয়ের জঠরে সমর্পণ করিয়া কোনওরূপে নিষ্কৃতি পাইলেন।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিল, তাঁহার প্রতিবেশী নিরক্ষর কাহার, গোয়ালা, জোলা প্রভৃতি অনুন্নত অন্ত্যজ সমাজ। আপদে-বিপদে গাঙ্গুলী মহাশয় এই সমাজের সহিত অসঙ্কোচে মিশিতেন, তাহাদের কাজকর্ম্মে নিজের পরিবারবর্গকেও দেখা-শুনা করিতে পাঠাইতেন। তাঁহার এই সহৃদয়তা ও উদারতা সম্বন্ধে অনেকেই অপ্রকাশ্যে ঘোঁট পাকাইলেও ইন্ধনের অভাবে তাহা সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইত না। কেন না, তখন গাঙ্গুলী মহাশয়ের সুসময়,—লোকবল, অর্থবল, মিত্রবল অপরিমেয়। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তর্জ্জনী তুলিবার সামর্থ্য তাঁহার শত্রুদেরও ছিল না।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের এই বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যথা দিল তাঁহার গুণমুগ্ধ এই সকল কাহার, গোয়ালা ও জোলার নির্ম্মল অন্তরে। তাহারা হাহাকার করিয়া উঠিল। ঘোট বাঁধিয়া তাহারা যেন বিশ্বনাথের সঙ্গেই যুঝিতে চায়! কি অপরাধে এমন পরোপকারী পুণ্যাত্মার সর্ব্বস্ব গেল! বিশ্বনাথের এ কি বিচার!—দেনার দায়ে গাঙ্গুলী মহাশয়ের সুসজ্জিত বাস-ভবন ও মূল্যবান আসবাবপত্র যখন নীলামে উঠিল,—তখন ইহাদের কি আক্রোশ, কি মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাস! দলে দলে হিন্দু-মুসলমান লাঠি হস্তে গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ী ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হিন্দুরা বলে,—এ দেউল; মুসলমান বলে,—এ আমাদের দারগা;—গাঙ্গুলী বাবুর এ অস্তানা দখল করে কে?—তার একটি চীজ যে ছোঁবে—আমরা তার শির নেব।—সে কি সঙ্কট-সঙ্কুল অবস্থা! কোতোয়ালীতে খবর গেল—বাঙ্গালীটোলায় সাম্প্রদায়িক

হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে লাল পাগড়ীর পল্টন ছুটিল। গাঙ্গুলী মহাশয় সমস্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দলের চৌধুরীদের ডাকাইয়া অতি কষ্টে নিরস্ত করিলেন।—দুর্দ্দিনে যেমন এই গণ-দেবতাদের আসল রূপটি গাঙ্গুলী মহাশয় দেখিয়া বিস্ময়ানন্দে স্তব্ধ হইলেন, তেমনই তাঁহার বন্ধুরূপী পরম হিতৈষী ভদ্রাসুরদের মুখের মুখোষ খুলিতে দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন!—গাঙ্গুলী মহাশয়ের মূল্যবান আসবাবগুলি মাটীর দরে "লুঠ" করিবার জন্য তাহাদের তখন কি আকুলি-ব্যাকুলি!

সর্ব্বস্ব হারাইয়া প্রতাপ গাঙ্গুলী বাঙ্গালীটোলা হইতে বাসা তুলিয়া বেনিয়া পার্কের ধারে একখানি খোলার ঘরে বাসা পাতিলেন। যে-পল্লীতে তিনি আসিয়া আশ্রয় লইলেন, তাহার অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান, দুই চারি ঘর হিন্দুও ছিল; কিন্তু সকলেই প্রায় নিরক্ষর; কৃষী বা বৃত্তি তাহাদেব মজুরী। দুর্দ্দিনের ঘনান্ধকারে গণ-দেবতাদের যে রূপজ্যোতি তাঁহার চক্ষুর উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই, তাই চিরপরিচিত বরেণ্য ভদ্রপল্লীর মোহ কাটাইয়া জঘন্য শ্রমিক-বস্তীর মধ্যেই আশ্রয় লইতে মনে তাঁহার কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ হয় নাই।

ব্যবসায়সূত্রে এই দরিদ্র-পল্লীর গোয়ালাদের চৌধুরী ভগুল এবং মুসলমান মিস্ত্রীদের মুরুব্বী আবদুল গাঙ্গুলী মহাশয়ের বিশেষ অনুগত ছিল। ইহাদের সহায়তায় তিনি বাসস্থান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং নূতন বাসায় অপরিচিত পল্লীতে আসিয়া কোন বিষয়েই যে তাঁহাকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই, তাহার মূলেও ইহাদের আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও সহযোগিতা। ফলতঃ গাঙ্গুলী মহাশয়ের এই ভাগ্যপরিবর্ত্তনে—অসঙ্কোচে সর্ব্বসুখী গাঙ্গুলী-পরিবারকে এভাবে দারিদ্র্যকে বরণ করিতে দেখিয়া,

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদের অন্তরও আর্দ্র হইয়া গেল,—আর গুণমুগ্ধ প্রকৃত সুহৃদ্‌গণ—যাঁহারা অন্তরঙ্গরূপে না মিশিয়াও তফাতে থাকিয়াই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন, তাঁহারা প্রতাপ গাঙ্গুলীর এই শোচনীয় পরিণামে হায় হায় করিয়া উঠিলেন। খোলার ঘরে আসিয়া তাঁহাদের অনেকেই সমবেদনা জানাইয়া গেলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় এতদিনে এই 'আড় আড়-ছাড়-ছাড় ভাবাপন্ন' বন্ধুদের চিনিলেন।—আবার বিশ্বনিন্দুক যাহারা, তাহারা গাঙ্গুলী মহাশয়ের এই নূতন বাসা নির্ব্বাচনের ছিদ্র ধরিয়া তখনও অসঙ্কোচে যত্রতত্র বলিয়া বেড়াইতেছিল,—"যে যা চায়, সে তা পায়, গাঙ্গুলীরও হ'ল শেষে তাই! একেবারে ভাটপাড়ায় গিয়ে বাসা বেঁধেছেন! যাদুধন এর মজা শীঘ্রই দেখতে পাবেন,—তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—ডাক ছাড়তে হবে!" ফলতঃ পাড়ায় বসিয়া এই বিখ্যাত বাঙ্গালী পরিবারটির দুর্দ্দশাপন্ন জীবনযাত্রাটা দেখিবার সুযোগটা দূরে সরিয়া গেল—বাঙ্গালীটোলার অধিকাংশ বাঙ্গালীর মনস্তাপের মূল তথ্যটুকু ইহাই!

—দুই—

প্রথম প্রথম খোলার ঘরে গাঙ্গুলী মহাশয় ও তাঁহার চিরসুখে প্রতিপালিত পরিবারবর্গের কষ্ট যে খুবই হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু অসাধারণ ধৈর্য্যশীল গাঙ্গুলী মহাশয় ও তাঁহার আদর্শ সহধর্ম্মিণী নারায়ণীর ঐশ্বর্য্যে যেমন বিলাস ছিল না, দারিদ্র্যেও তেমনই বিরাগ আসে নাই। তবে ছেলে-মেয়েগুলি ত কখনও দুঃখের মুখ দেখে

নাই, দারিদ্র্য যে কি, তাহার পরিচয়ও কখনও পায় নাই। তাহারা জানে, খোলার ঘরে যাহারা থাকে, তাহারা গরীব, তাহারা ভাল জিনিব খাইতে পায় না। তাহাদের ছেলে-মেয়েরা ভাল কাপড়-জামা পায় না। তাই তাহাদের মা-বাপ পার্ব্বণের সময় পাড়ার গরীবদের ভাল করিয়া খাওয়াইতেন, ছেলে-মেয়েদের কত কি পোষাক দিতেন!—শেষে যখন তাহারাই বাপ-মা'র সঙ্গে খোলার ঘরে আসিয়া উঠিল, তাহাদের দামী জিনিষগুলি অপরে লইয়া গেল,—শুধু কিছু কাপড়-চোপড়, বিছানা আর খানকতক বাসন তাহাদের সঙ্গে আসিল, তখন তাহারা নিজেরাই পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল,—"আমাদের কি হয়েছে ভাই?"—যেটি বয়সে একটু বড়, সে সুন্দর মুখখানি ম্লান করিয়া বলিল,—"জানিস্ না, আমরা যে এখন গরীব হয়ে গেছি, তাই না খোলার ঘরে এসে উঠেছি।" শুনিয়া সবারই মুখ শুকাইয়া গেল। মনে মনে সকলেই ভাবিল—"কেন আমরা গরীব হয়ে গেলুম? আমাদের সে বাড়ী কি হ'ল? অত লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া, তারা সব কোথায় গেল?"—খেলিতে গিয়া খেলার উপযুক্ত জায়গা না পাইয়া ছেলেরা বাবার কাছে আসিয়া নালিশ করিল, "আমরা কোথায় খেলব, বাবা! এ বাড়ীতে না আছে ছাদ, না আছে দালান, উঠান পর্য্যন্ত নেই—কি ক'রে খেলি বলত?"

গাঙ্গুলী মহাশয় শিশুদের বুকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন,—"কেন বাবা, সামনে অত বড় মাঠ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ না?—ঐখানে গিয়ে খেলবে তোমরা।"

উল্লাসভরে ছেলেরা বলিল,—"ও ত কোম্পানীর বাগান বাবা—ওখানে গিয়ে খেলব আমরা?"—পিতার সম্মতি পাইয়া আনন্দে করতালি দিয়া

কোলাহল করিতে করিতে তাহারা ছুটিয়া গেল।—মুগ্ধ নয়নে সেই দিকে গাঙ্গুলী মহাশয় চাহিয়া রহিলেন—অতীতের কত স্মৃতিই তাঁহার মানসপটে তখন ছায়াচিত্রের মত রূপান্বিত হইয়া তাঁহাকে অভিভূত করিল।

গাঙ্গুলীর সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াও টাকার কুমীর প্রাণকৃষ্ণ মজুমদারের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই। জীবনসংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে দলিতদেহ প্রতাপ গাঙ্গুলীর শোচনীয় অবস্থার পরিচয় পাইয়াও মজুমদারের মনে কিছুমাত্র সহানুভূতি আসে নাই—বরং গাঙ্গুলী পরিবারের উপর তাঁহার আক্রোশ ও বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছিল।

গাঙ্গুলীর সর্ব্বস্ব গ্রাস করিবার পর মজুমদার দেখিলেন, গাঙ্গুলীর গুণমুগ্ধের দল তাঁহাকে একরকম 'বয়কট' করিয়া বসিয়াছে। গাঙ্গুলীর যাহারা শত্রু ছিল বা যাহারা কারণে অকারণে গাঙ্গুলীর নিন্দা করিত, তাহারও এখন মজুমদারের নিন্দায় শতমুখ হইয়াছে। গাঙ্গুলীর ঘৃতের কারবারটি আশ্রয় করিয়া অনেকগুলি লোক অন্নসংস্থান করিতেছিল, মজুমদার সেই কারবারের মালিক হইয়াই পুরাতন কর্ম্মীদিগকে বরখাস্ত করিয়া ছেলে ও বাড়ীর একটি চাকরকে লইয়া কারবার চালাইতে লাগিলেন। নিন্দুকরা দোকানের সম্মুখে আসিয়াই বলিতে লাগিল,—"ধর্ম্ম সইবে না মজুমদার, এটা মনে রেখ।—দাতা ভোক্তা ব্রাহ্মণকে পথে বসিয়েছ,—এ শুধু প্রতাপ গাঙ্গুলীর টাট নয়,—তার ব্রহ্মরক্ত এখানে আছে। সহ্য হবে না বাবা।"—মজুমদার ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া পুলিশ ডাকিয়া নিন্দুকদের তাড়াইবার চেষ্টা করিলে এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটি তাহাতে আরও প্রবল হইবার সুযোগ পাইল। ইহার ফলে, মজুমদারের নিষ্ফল আক্রোশ নিরীহ নিরপরাধ নিত্য অভাবগ্রস্ত গাঙ্গুলীর উপর গিয়া পুঞ্জীভূত হইল।

শুধু গাঙ্গুলী কেন, তাঁহার পরিবারবর্গ পর্য্যন্ত মজুমদারের আক্রোশের 'হেতু' হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ইহার মূলতত্ত্বটুকু আবিষ্কার করিতে গেলে, গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী নারায়ণীর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। আমাদের সমাজে অধিকাংশ মেয়েরই মনে একটা বড় রকমের দুর্ব্বলতা দেখা যায়। এই দুর্ব্বলতাটুকু নানাভাবেই তাঁহাদের মনের ভাবধারাকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। এই দুর্ব্বলতা আর কিছুই নহে, চক্ষু-লজ্জা বা উচিত কথা বলিতে কুণ্ঠা। নারায়ণীর এই দুর্ব্বলতা মোটেই ছিল না,—স্পষ্ট কথা শুনিতে সে যেমন ভালবাসিত, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অনুচিত হইলেও তেমনই স্পষ্ট উচিত কথা শুনাইতে লজ্জা পাইত না, এবং তজ্জন্য স্থানকাল বা পাত্র-পাত্রীর দিকে দৃকপাতও করিত না। বিদ্যার অতিবিদ্যা যেমন গুণ হইয়াও দোষে দাঁড়াইয়াছিল, নারায়ণীর এই স্পষ্টবাদীতাও শেষে তাহার পক্ষে একটা রূঢ় অপবাদের মত কাহারও কাহারও কাছে আলোচনার বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল। নানাজনে নানাভাবে তাহার আলোচনা করিত, কেহ বলিত অহঙ্কার, কাহারও মতে তেজ, কেহ কেহ বলিত, ওটা বড়মানুষী চাল। এইরকম নানাজনে নানাকথা বলিত, কথাগুলি অলঙ্কৃত হইয়া নারায়ণীর কাণে আসিয়াও উঠিত, কিন্তু স্পষ্ট কথা শুনাইতে যেমন সে দৃক্পাত করিত না, তাহার অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে আলোচনাও তেমনই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিত না।

—তিন—

একবার কাশিমপুরের রাজনন্দিনী মেয়েদের একটি প্রীতিভোজ দেন। অনেকেই তাহাতে নিমন্ত্রিতা হন ও রাজনন্দিনী স্বয়ং বাড়ী বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। নারায়ণী রাজবাড়ীতে গিয়া দেখিল, লম্বা দরদালানে মেয়েদের খাইবার জায়গা হইয়াছে, দুই সারির সমস্ত আসনে মেয়েরা বসিয়া পড়িয়াছে, স্থানাভাবে দশবারোটি মেয়ে হলঘরের দ্বারটির কাছে দাঁড়াইয়া আছে, আর কাশীর একটি সবচিন্ চেড়ীবিশেষ প্রৌঢ়া নারী সেই দ্বারটি আগুলিয়া তখন বলিতেছিল,—"একটু দাঁড়াও বাছারা, ওদিকের দালানে তোমাদের পাতা হচ্ছে।"

নারায়ণীকে দেখিবামাত্র প্রৌঢ়াটি তাহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া হলের মধ্যে যাইবার পথ দিল। ভিতরে গিয়া নারায়ণী দেখিল, অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের জন্য সেখানে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছে, রাজনন্দিনী স্বয়ং যত্ন করিয়া তাহাদের বসাইতেছেন। নারায়ণীও সেই যত্ন হইতে বঞ্চিত হইল না।

কিন্তু আসনে বসিয়া নারায়ণী যখন দেখিল, সে ঘরে অনেকগুলি আসন খালি থাকা সত্ত্বেও, বাহিরে অতগুলি মেয়েকে বৃথা দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে, এবং দরজায় পাহারার ব্যবস্থা,—তখন নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে যে একটা রীতিমত পার্থক্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। অথচ সে দেখিয়াছিল, বাহিরে যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, গরীব হইলেও, তাহাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েও কয়েকজন রহিয়াছে।—বাহিরের অবস্থা

হৃদয়ঙ্গম করিয়া নারায়ণী তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া পড়িল। রাজনন্দিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,—"কি হ'ল ভাই, আপনি উঠ্ছেন কেন ?"

নারায়ণী হাসিয়া বলিল,—"উঠ্‌ছি এই জন্যে রাজনন্দিনী, এ ঘরের জায়গা যখন শুধু বড়লোকের মেয়েদের জন্যে, আর বাইরের দালান গরীবদের, তখন আমাকেও ওইখানে গিয়ে বস্‌তে হবে, কেন না, আমিও গরীবের মেয়ে।"

ঘরশুদ্ধ সমস্ত মেয়ে একেবারে স্তব্ধ! রাজনন্দিনী অপ্রতিভের মত বলিলেন,—"আমি ত পার্থক্যের কোন ব্যবস্থা করি নি, সকলকেই আমি নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি, সবাই আমার কাছে সমান—"

নারায়ণী তাহার বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষুদুটী রাজকন্যার নিষ্প্রভ চক্ষুর উপর তুলিয়া অসঙ্কোচে বলিল,—"আপনার কথা শুনে যেমন আনন্দ পাচ্ছি, কাজের ব্যবস্থা দেখে তেমনই লজ্জা আসছে। আপনি নিজে বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ করেছেন ব'লে আমরা সকলেই এসেছি, কিন্তু বাড়ীতে ডেকে এনে এ অপমান করা কেন ? সবাই আপনার কাছে যদি সমান, ঘরের বাইরে ওঁরা জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, অথচ এ ঘরে এতগুলো আসন খালি প'ড়ে রয়েছে ?"

দুই চক্ষু নত করিয়া অপরাধিনীর মত রাজনন্দিনী নারায়ণীর দুটী হাত ধরিয়া বলিলেন,—"সত্যই আমার অপরাধ হয়েছে, দিদি, আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি বসুন, আমি নিজে ওঁদের এই ঘরে এনে বসাচ্ছি।"

বাহিরে যে মেয়েগুলি দাঁড়াইয়াছিল, রাজনন্দিনী যত্ন করিয়া তাহাদিগকে ভিতরে আনিয়া বসাইয়া দিলেন। নিজের ভুল বুঝিয়া ভয়ে ভয়ে রাজনন্দিনী খাওয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঘরে-বাহিরে সমানভাবে নিমন্ত্রিতাদের পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া এই যে দশের মাঝে উচিত কথা বলা, ইহা উপযুক্ত হইলেও, কতকগুলি মেয়ে নারায়ণীর এই কাণ্ডটিকে একটা 'কেলেঙ্কারী করা' বলিয়া পরে অপবাদ দিয়াছিল। সৌভাগ্য-জীবনে দশের মাঝে অসঙ্কোচে এইভাবে উচিত কথা শুনাইয়া নারায়ণী অনেকেরই অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

—চার—

নারায়ণীর এই সব ব্যাপারে মেয়েদের মধ্যে যাহারা ঘোঁট পাকাইত, মজুমদার-গৃহিণী নিরুপমাই ছিল তাহাদের মধ্যে প্রধান। নিরুপমা ধনীর একমাত্র কন্যা, এবং তাঁহাকে বিবাহ করিয়াই যে প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার 'টাকার কুমীর' হইয়াছেন, এ কথা সাধারণে বিদিত ছিল, নিরুপমাও তজ্জন্য মনে মনে গর্ব্ব পোষণ করিতেন। নিরুপমার রূপ ছিল, শিক্ষা ছিল, মেয়ে-মহলে মিশিবার ক্ষমতা ছিল, আর পয়সা ত তাহার ছিলই,—তবুও সকল বিষয়েই সে যেন নিজেকে নারায়ণীর তুলনায় অনেক নিম্নে মনে করিয়া ঈর্ষায় জ্বলিত। মেয়েদের সভায় দশজনের মাঝে গিয়া দেখিয়াছে, নারায়ণীর স্থান সবার আগে, শ্রেষ্ঠস্থান তাহার, নানা কারণে সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপরে পড়ে। নারায়ণী কখনও সত্যাগ্রহীদের দলে মিশে নাই, পিকেটিং করিতে বাহির হয় নাই, কোনও সভায় গিয়া বক্তৃতাও দেয় নাই, অথচ ইহাদের মধ্যেও নারায়ণীর প্রভাব বড় সামান্য নহে।

নিরুপমা একটু ঘটা করিয়াই ছেলের অন্নপ্রাশন দিয়াছিল। উৎসবের দিন দেউড়ীতে নহবৎ বসিয়াছিল। দিনে পুরুষদের ও রাত্রিকালে মেয়েদের প্রীতিভোজের ব্যবস্থা ছিল। নারায়ণী ছেলেমেয়েদের লইয়া যখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল, তখন ছাদের উপর মেয়েরা খাওয়া আরম্ভ করিয়াছে। নিরুপমা তাড়াতাড়ি নারায়ণী ও তাহার ছেলেমেয়েদের যত্ন করিয়া ঘরে বসাইল। বলিতে লাগিল,—"দেরী ক'রে এসেছ দিদি, কত কষ্ট হবে হয় ত ?"

নারায়ণী হাসিয়া উত্তর দিল,—"আমি ত পর নই, দিদি, আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না, তবে ছেলেদের ক্ষিধে পেয়েছে, দালানের ঐ চাতালে ওদের বরং বসিয়ে দাও।"

নিরুপমা ছুটিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে নারায়ণী ও তাহার ছেলে-মেয়েদের পাতা পরিপূর্ণরূপে সাজাইয়া নিরুপমা বসিবার জন্য ডাকিতে আসিল। নারায়ণী একটি গিনি দিয়া নিরুপমার ছেলেটিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ছেলেমেয়েদের সহিত বাহিরের চাতালে আসিল। পাতে বসিয়াই নারায়ণী দেখিতে পাইল, একটি মলিনবসনা বিধবা দুটি ছোট ছোট ছেলের হাত ধরিয়া উঠানের একধারে ঠিক তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে। নারায়ণী নিরুপমার দিকে চাহিল। নিরুপমা রূঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল,—"তোমরা এখানে কে গা ?"

মেয়েটি অতি করুণসুরে বলিল,—"আমরা গণেশমহল্লা থেকে আস্‌ছি মা, আপনার ছেলের ভাতে খুব ঘটা হয়েছে শুনে, আমার ছেলে দুটিকে এনেছি মা,—এদের হাতে দুখানা ক'রে যদি লুচি দাও মা—অনাথা হলেও—আমি মা ব্রাহ্মণের মেয়ে—"

আগুনের উপর কে যেন ঘি ঢালিয়া দিল। বাড়ীর উঠানে ইহাদের দেখিয়াই নিরুপমা জ্বলিয়াছিল, কথা শুনিয়া রাগ তাহার সপ্তমে চড়িল ;

তর্জ্জন করিয়া বলিল,—"আস্পর্দ্ধাও তোমার কম নয় বাছা, একেবারে বাড়ার ভেতর চ'ড়ে এসেছ ! লোকজন সব করছে কি বাইরে—একটু লক্ষ্য রাখে না কেউ ! যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও---"

অভাগিনী যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল—লজ্জায় ও অপমানে ; আর তাহার ক্ষুধাতুর ছেলে দুটির লোলুপদৃষ্টি নারায়ণী ও তাহার ছেলে-মেয়েদের লুচি ও নানাবিধ মিষ্টান্নপূর্ণ সাজান পাতাগুলির উপর পড়িয়াছিল !—সে দৃশ্য দেখিয়া নারায়ণীর নারী-হৃদয় আর্ত্ত হইয়া উঠিল। স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া নিজের সাজান পাতখানি আস্তে আস্তে তুলিয়া বিধবাকে বলিল,—"ধর ত মা, আঁচলখানা না হয় পাত।"

বিধবা অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার নড়িবার সামর্থ্যটুকুও বুঝি সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। নারায়ণী তখন নিজে উঠিয়া তাহার আঁচলখানি টানিয়া খাবারগুলি বাঁধিয়া দিতে দিতে গাঢ়স্বরে বলিল,—"যাও মা, বাড়ীতে গিয়ে ছেলে দুটিকে খাওয়াওগে !"—অপমানের সকল জ্বালা ভুলিয়া—দুটি বিস্ফারিত নেত্রে নারায়ণীর উজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিতে চাহিতে ছেলে দুটির হাত ধরিয়া বিধবা চলিয়া গেল।

নিরুপমা তখন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা চলিয়া গেলে সে একটু অস্বাভাবিক স্বরেই বলিল,—"কাজটা কি রকম হ'ল, দিদি ?"

নারায়ণী সহজভাবেই উত্তর দিল,—"তোমার ছেলের কল্যাণ করা হ'ল, দিদি ! ভগবান্ নিজের হাতে ত খান্ না, গরীবের ছেলেদের মুখেই তিনি খান। খোকার অন্নপ্রাশন এইখানেই সার্থক হ'ল, দিদি।"

নিরুপমা একটু উষ্ণ হইয়াই বলিল,—"গরীবের ছেলেদের মুখে দেবার মত সামর্থ্য যদি আমার না থাকে ?"

নারায়ণী হাসিয়া উত্তর দিল,—"তাহ'লে এত ঘটা ক'রে দরজায় ন'বৎ বসিয়েছ কেন, দিদি! আমরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলেও ছেলেবেলা থেকেই শুনে এসেছি, কাজকর্ম্মে ন'বৎ বসালে বা সামাজিক দিলে, আহূত অনাহূত সকলকে পেটপুরে খেতে দিতে হয়। কাউকে ফেরাতে নেই।"

অন্তরের অসহ্য ক্রোধ কোনরকমে দমন করিয়া, কথার উপর আর কথা না বাড়াইয়া, নিরুপমা বলিল,—"আমি যে ওদের খেতে দিতুম না, তা নয়, তবে একেবারে লোকের খাবার মুখের উপর এসে দাঁড়িয়েছিল বলেই—সে যা হোক, তুমি ভালই করেছ বোন্,—তোমার খাবার আবার এনে দিই, তুমি খেতে ব'স,—ছেলেরাও হাত গুটিয়ে ব'সে আছে!"

ছেলেমেয়েরা মায়ের প্রকৃতি চিনিত। অমন ব্যাপারটি দেখিয়া তাহারা খাবারের একটি কণাও মুখে তুলে নাই; মা'র মুখখানির দিকে চাহিয়া চুপটি করিয়া সকলেই বসিয়াছিল।

নারায়ণী বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল,—"ছেলেদের আমি ব'সে ব'সে খাওয়াচ্ছি দিদি, আমার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না; আমার খাওয়া হয়ে গেছে।"

অবাক্ হইয়া নিরুপমা বলিল,—"সে কি, আমার ওপর রাগ ক'রে না খেয়েই চ'লে যাবে তুমি?"

নারায়ণী স্থির দৃষ্টিতে নিরুপমার মুখের দিকে একটিবার চাহিয়াই ছেলেদের পাতের লুচি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল,—"রাগের কথা ত হয় নি দিদি,—রাগ যদি করতুম, ছেলেদের খাওয়াতে বসতুম না তাহ'লে।"

নিরুপমা বলিল,—"তুমি ত অভুক্ত আমার বাড়ী থেকে যাবে, তাতে অকল্যাণ আমার হবে না?"

আবার পূর্ব্ববৎ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া নারায়ণী উত্তর দিল,—"কল্যাণ তোমার পূর্ণভাবেই হয়ে গেছে, দিদি, অকল্যাণের কথা মুখেও এনো না! আর আমার খাবার কথা যদি বল,—সেই মেয়েটির আঁচলে আমার পাতের সমস্ত খাবার বেধে দেবার সময় পেট আমার ভ'রে গেছে, নিমন্ত্রণ খেতে এসে এমন তৃপ্তি আমি আর কখন পাই নি। দোহাই তোমার, রাগ ক'রনা আমার উপর,—খাবার জন্য আর বল না—লক্ষীটি!—আমি বরং আর একদিন এসে তোমার পাতে ব'সে একসঙ্গে খেয়ে যাব।"

নিরুপমা নারায়ণীকে খাইবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করিল না বটে, কিন্তু এ দিনের এই ঘটনাটি হাড়ের মত তাহার বুকের ভিতর ফুটিয়া রহিল। মনে মনে সেই রাত্রিতেই সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ অপমানের প্রতিশোধ সে একদিন লইবেই।

তাই গাঙ্গুলী পরিবারের অবস্থা পরিবর্ত্তনে সকলেই যখন তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিত, নিরুপমার মনে তখন বহুদিন পূর্ব্বের সেই অপমানের কাঁটাটি খোঁচা দিয়া তাহাকে সমস্ত কথা স্মরণ করাইয়া দিত,—আর সে তখন সেই অপমানবিদ্ধ অন্তরে উন্মাদিনীর মত কল্পনা করিত—যেন নারায়ণী সেই মলিন-বসনা বিধবাটির মত শিশু-পুত্রদের হাত ধরিয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য তাহার পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সেই স্থির-সৌদামিনীর মত উজ্জ্বল দৃষ্টি দারিদ্র্যের সংঘাতে ম্লান, মলিন, অশ্রুমুখী: অনাহারে অবসন্ন তাহার ছেলেমেয়েগুলির—দু'টি ভাতের জন্য কি আকুলি-ব্যাকুলি! আর সে তখন—নিরুপমার কল্পনা উত্তেজনার উল্লাসে ভাঙ্গিয়া যাইত! সেই ভিখারিণী প্রতিদ্বন্দ্বিনী আর তাহার শিশুদের লইয়া সে তখন কি করিবে—তাহা আর স্থির করিয়া উঠিতে পারিত না!

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মজুমদার ছিলেন বুদ্ধির জাহাজ-বিশেষ! স্ত্রীর প্রকৃতি তিনি খুব ভালবাবেই চিনিয়াছিলেন। তাঁহার সংসারে নামেমাত্র প্রভু যদিও তিনি ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভুত্বের রাশটি যে নিরুপমা টানিয়া রাখিত, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। নিরুপমাকে চটাইয়া বা তাহার সম্মতি না লইয়া কোন কাজ করিবার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা মজুমদারের মোটেই ছিল না,—বরং স্ত্রীকে খুসী করিবার মত উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলে তাঁহার উল্লাসের সীমা থাকিত না। স্ত্রীর অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, গাঙ্গুলী পরিবারের উপর তাঁহার আক্রোশের উপশম কিছুতেই হয় নাই, বরং তাহা তাহাদের দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। মজুমদার যেদিন স্ত্রীকে অতিমাত্রায় প্রসন্ন করিবার জন্য বলিয়াছিলেন,—"তুমি দেখে নিও নিরু, গাঙ্গুলীর বউকে রাঁধুনী রেখে যদি তোমার ভাত না রাঁধাতে পারি, তাহ'লে অমি প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার নই!" —সে দিন নিরুপমা যে-মধুর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়াছিল, প্রথম বিবাহ-জীবনের পর, পত্নীর চক্ষু দুটিতে এত মাধুর্য্য মজুমদার এপর্য্যন্ত আর দেখিবার সৌভাগ্য পান নাই! শুধু তাই নয়, সেইদিন নিরুপমা লোহার সিন্দুক খুলিয়া পাঁচ হাজার টাকার একখানি কাগজ এনডোর্স করিয়া স্বামীর হাতে দিয়া গদগদস্বরে বলিয়াছিল,—"কারবারের জন্যে ক'দিন ধরেই চাইছিলে না? দিচ্ছি, নাও, বুঝে খরচ ক'র, আর—"

সর্ব্বস্বের মালিক ছিলেন যদিও মজুমদার, কিন্তু তাঁহার চাবিটি ঝুলিত নিরুপমার অঞ্চলে। ঘিয়ের কারবার বাড়াইবার জন্য একটি মাস সাধ্যসাধনা করিয়াও মজুমদার যাহা আদায় করিতে পারেন নাই, স্ত্রীর প্রকৃতি বুঝিয়া একটি চালেই তাহা অনায়াসে সিদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন।

—পাঁচ—

দুর্দ্দশাপন্ন হইলেও গাঙ্গুলী-পরিবারের দিনগুলি কোনও রকমে চলিতেছিল,—অভাবের সহিত অভাবগ্রস্তের সাথী আধিব্যাধি আসিয়াও এই পরিবারকে মুহ্যমান করিতে পারে নাই। ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে, গাঙ্গুলী মহাশয় স্বয়ং বিশ্বনাথের চরণামৃত আনিয়া অখণ্ড বিশ্বাসে রোগীকে পান করাইতেন; বলিতেন,—"সুদিনে অসুখ-বিসুখ এলে ঘটা করে চিকিৎসা চালিয়েছি, দুর্দ্দিনে দীননাথই ভরসা, তাঁর চরণামৃতই মহৌষধ।" রোগীও পরম বিশ্বাসে এই পরমৌষধ সেবন করিত,—ব্যাধির প্রকোপ দূরে পলাইত। সুসময়ে অবসরকালে জ্যোতিষের আলোচনা গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাতিকের মত দাঁড়াইয়াছিল,—অনেকেই তাঁহাকে কোষ্ঠী দেখাইতে আসিত, তাঁহার গণনার ফল নাকি সর্ব্বত্রই অভ্রান্ত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। গণনার ফল যাহাই হউক, এই বেগারের ফলে পরিদর্শনের অভাবে তাঁহার ব্যবসায়টী কিন্তু ক্রমশঃ অবনতির পথে নামিয়াছিল। আবার অদৃষ্টের এমনই বিচিত্র গতি যে, দুর্দ্দিনে সুদিনের সেই বেগারই এই বিপন্ন পরিবারের অন্নসংস্থানের অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল।—সখের এই নির্ম্মল বিদ্যাটির সহায়তায় জীবিকার সংস্থান করিতেতাঁহার বুকে ব্যথা বাজিলেও, অভাবের মসীময় মূর্ত্তি চক্ষুর উপর পড়িবামাত্র তাঁহার এই সঙ্কোচের বেদনা ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া যাইত।

নারায়ণী সেদিন স্বামীর জ্যোতিষ-চর্চ্চার ছোট ঘরখানির ভিতর ঢুকিয়া হঠাৎ বলিল,—"অনেকের অদৃষ্টই ত গণনা করেছ, একবার আমার হাতখানি দেখ দেখি।"

গাঙ্গুলী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"হঠাৎ এ সখ হ'ল যে তোমার?"

নারায়ণী হাসিয়া বলিল,—"কাল বড় এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, শুনবে?"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"স্বপ্নে ত তুমি নিত্যই গঙ্গাস্নান কর শুনতে পাই, এবার বুঝি সমুদ্রস্নানের স্বপ্ন দেখেছ?"

গম্ভীর হইয়া নারায়ণী বলিল,—"না গো, তা কেন?" শোন না বলি, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমাদের সেই বাড়ীতে আবার আমরা ফিরে গেছি; সেই ঘর, সেই খাট, সেই বিছানা, সেই লোকজন, সেই সব! বল না, কেন এমন স্বপ্ন দেখলুম? এর ফল কি রকম—"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পরক্ষণে জোর করিয়া হাসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"মা অন্নপূর্ণার মায়া! স্বপ্নে নিত্য গঙ্গাস্নান ক'রে খুব শুচি হয়ে গেছ কি না, তাই তোমাকে তিনি ঐশ্বর্য্যের ছায়া দেখিয়েছেন; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, এই খোলার ঘরখানি থেকেও আমাদের সংসারটুকু তুলতে না হয়।"

বিস্মিতভাবে নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল,—"তার মানে?"

হঠাৎ নারায়ণীর হাতখানি টানিয়া লইয়া গাঙ্গুলী মহাশয় ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"দেখি তোমার হাতখানা!" নিবিষ্টভাবে তিনি নারায়ণীর হাতের রেখাগুলি দেখিতে লাগিলেন, আর সে সংশয়াকুলচিত্তে স্বামীর ভাবপূর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল।

সকল রেখা পরীক্ষা করিয়া আপন মনেই গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"সে রকম ত কিছুই দেখছি না!"

সবিস্ময়ে নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি রকম, সেটা বলই না শুনি—"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—"দেখছিলুম তোমার অদৃষ্টে সত্যই দাসীত্ব আছে কি না!"

নারায়ণীর মুখের উপর বুঝি শরীরের সমস্ত রক্ত উঠিয়া আসিল, মুখ হইতে কথা বাহির হইল না, স্বামীর মুখখানির উপর চাহিয়া রহিল। গাঙ্গুলী মহাশয় স্ত্রীর সেই ভাব দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"কথা বলবার একটু মানে আছে। মজুমদার-গৃহিণী দিন গুণছেন, কবে তুমি পেটের দায়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাত—রাঁধুনীর বৃত্তি নিয়ে তাঁকে তৃপ্তি দাও।"

কথাটি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনায় কাণ দুটি লাল হইয়া উঠিলেও মুখে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া নারায়ণী বলিল,—"মজুমদার-গিন্নী বুঝি এই কামনাই করছে এখন? আর অত ঠোকাঠুকিতেও আমাকে না বুঝে আমার সম্বন্ধে এই ধারণা মনে এঁটে রেখেছে এখনও, যে আমি—"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"আমাদের অবস্থার গতি যে ভাবে নেমে চলেছে, তাতে এ ধারণা মনে আনা তার পক্ষে ত আশ্চর্য্য কিছু নয়! কে জানে, আমাদের পরিণাম কি!"

দৃপ্তস্বরে নারায়ণী এবার বলিয়া উঠিল,—"পরিণাম আমাদের আর যাই হোক, তবে এটা ঠিক যে, মা অন্নপূর্ণা আমাকে কাশীতে এনেছেন অন্ন বিলুতে, অন্ন ভিক্ষে করতে নয়। যদি মা এ গরব না রাখেন, তাঁর মন্দিরে গিয়ে মাথা খুঁড়ে মরব, তবু মাথা হেঁট করব না, একথা আমি জোর ক'রে ব'লে রাখছি।"

স্ত্রীর দৃপ্ত মুখখানির দিকে মুগ্ধভাবে চাহিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"মজুমদার তা জানে, সেইজন্যে সে এখন আমাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধবার

জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছে। আমার কিছু নেই জেনে যে ক'জন মহাজন নালিশ করেনি, মজুমদার তাদের কাছ থেকে আমার দেওয়া হাতচিঠিগুলো কিনে নিয়েছে—"

নারায়ণী বলিল,—"সেই হাতচিঠিগুলো নিয়ে নালিশ করবার মতলব বোধ হয় এঁটেছে?"

"হ্যাঁ,—শীঘ্রই নালিশ দায়ের করবে। এই সূত্রে আমাকে নাস্তানাবুদ ক'রে বা জেলে পাঠিয়ে সে তখন তোমাদের নিয়েই পড়বে।"

নারায়ণী স্বামীর ম্লান মুখের দিকে নিজের অম্লান মুখখানি তুলিয়া সহানুভূতির সুরে বলিল,—"তাই বুঝি তোমাকে ক'দিন থেকে কেমন অন্যমনস্ক দেখছি? ছিঃ! কখন কি হবে, কে কি করবে, এই ভাবনা তুমি মনে টেনে এনে নিজের মাথাটাকে দুর্ব্বল করতে বসেছ? তুমি না জ্যোতিষী হয়েছ? তোমার জ্যোতিষ কি বলে?"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"ডাক্তারের বাড়ীতে রোগ হ'লে ডাক্তার নিজে তার চিকিৎসা করতে সাহস পায় না। তেমনই নিজের ভাগ্যও নিজে গণনা করতে ভয় হয়।"

নারায়ণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল,—"তুমি কি মনে কর, ঐ সুদখোর মজুমদারই আমাদের ভাগ্য-বিধাতা? বিশ্বনাথ কি নিদ্রিত? আমাদের নিয়ৎ যদি শুদ্ধ থাকে, শত মজুমদার হাজার কারসাজি ক'রেও কিছুই করতে পারবে না, নিজের জালে শেষে নিজেই জড়িয়ে মরবে, এ তুমি স্থির জেনো।"

প্রশংসমান নয়নে পত্নীর সেই উৎসাহ-প্রদীপ্ত মুখখানির দিকে গাঙ্গুলী মহাশয় চাহিয়া রহিলেন।

—ছয়—

তিন মাসের স্থলে নয়টি মাস কাটিয়া গেল, তবুও গাঙ্গুলী-পরিবারের চরম দুরবস্থার কথা নিরুপমার কাণে আসিল না বা নারায়ণী ছেলেপুলেদের হাত ধরিয়া তাহার দ্বারে ভিক্ষা করিতে আশা দূরের কথা, দায় জানাইয়া সাহায্য চাহিতেও কোন দিন দেখা দিল না। তখন সে মনে মনে স্থির করিল, একদিন নারায়ণীকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া দেখিবে, তাহার সে তেজ এখন কতটা শুকাইয়াছে এবং তাহার হালই বা এখন কোন ভাবে চলিয়াছে!

উত্তেজনার বশে নিরুপমা স্বামীর প্ররোচনায় এক একখানি করিয়া অনেকগুলি কাগজ বাহির করিয়া দিয়াছিল। মজুমদার তাহার কতক ভাঙ্গাইয়া গাঙ্গুলী মহাশয়ের মহাজনদের নিকট হইতে হাতচিঠাগুলি আধা দামে খরিদ করিয়াছিলেন এবং বাকী টাকাগুলি হাতে লইয়া বড় রকম লাভের প্রত্যাশায় প্রচুর পরিমাণ ঘৃত আড়তে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘৃতের কারবারের সঙ্গে কাপড়ের এক কারবার খুলিবার সঙ্কল্প হঠাৎ মজুমদারের মাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরুপমা এবার আর কাগজ বাহির করিয়া দিল না, স্বামীকে যুক্তি দিল, কাগজ ভাঙ্গাইয়া লোকসান খাওয়া অপেক্ষা বাড়ী বাঁধা দিয়া অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ করা বরং ভাল। পরে কাগজের দর যদি কিছু উঠে, তখন তাহা বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা যাইবে।—নিরুপমার যুক্তি লঙ্ঘন করিবার সাধ্য মজুমদারের ছিল না, কাজেই বসতবাটি বন্ধক দিয়া ১০ হাজার টাকা লইয়া এক

কাপড়ের দোকান খোলা হইল। বাজার-সম্ভ্রম থাকায় দুই কারবারেই ধারে বহু সহস্র টাকার মাল সংগ্রহ করা মজুমদারের পক্ষে কঠিন হয় নাই। বাঙ্গালীটোলায় বাঙ্গালী-সমাজের সহানুভূতির অভাবে, বুদ্ধিমান মজুমদার বড়গঞ্জের সান্নিধ্যে হনুমানফটকায় তাঁহার ব্যবসায় খুব বড় করিয়া ফাঁদিয়াছিলেন। কাশীর স্টেশন ও গঙ্গা নিকটে পড়ায়, মালপত্রের আমদানী রপ্তানীর পক্ষে বেশ সুবিধাই হইতেছিল। নূতন স্থানে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই কারবার বেশ জাঁকিয়া উঠিতেছিল। সুসময় দেখিয়া মজুমদার এইবার গাঙ্গুলীর সর্ব্বনাশের জন্য অস্ত্র শানাইতে আরম্ভ করিলেন।

গাঙ্গুলী মহাশয় সেদিন বাহিরের ঘরখানিতে বসিয়া একখানি কোষ্ঠী দেখিতেছিলেন, এমন সময় ভগুল গোয়ালা আসিয়া বলিল,—"গাঙ্গুলী বাবু, শুনেছেন ত, মজুমদার আপনার সাবেক দোকান থেকে টাট তুলে নিয়ে হনুমানফটকায় কারবার চালিয়েছে। সে ঘর খালি আছে, আপনি আবার কারবার লাগিয়ে দিন, আপনার জন্য বহুৎ মদৎ দেব আমরা জানবেন।"

ঠিক এই সময় আবদুল আসিয়াও ভগুলের কথার পোষকতা করিল। অধিকন্তু সে বলিল,—"হামি লোক ত আপনার কারবারের খাতে টিন বানাতে সুরু করিয়েছি—আমাদের সবাইকার দিল্ মাঙ্গ্‌তেছে—গাঙ্গুলী বাবুর কারবার ফিন্ কায়েম্ হোক্—আপনি ইমানদার, হামি লোক আপনার খাতিরে জান কবুল করব।"

গাঙ্গুলীকে নিরুত্তর দেখিয়া, শেষে এই দুই মুরুব্বী জোর করিয়া ইহাও জানাইল যে,—গাঙ্গুলী বাবুর হাতে টাকা যদি না থাকে, তাহারা তাহারও যোগাড় করিয়া দিবে, মহাজনদের হাতে পায়ে ধরিয়া মাল দেওয়াইবে,—সাবেক ঘর দখল করা চাই-ই।

গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার এই ভক্ত দুইটিকে চিনিতেন, সুতরাং তাহাদের কথায় বিস্মিত না হইয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, দেখা যাবে ; তাঁর ইচ্ছা যদি হয়ে থাকে, তাই হবে। আমি ভেবে চিন্তে তোমাদের জানাব।"

তাহারা চলিয়া গেলে নারায়ণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁগা, কি বলতে এসেছিল ওরা ?"

গাঙ্গুলী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"মজুমদার সাবেক ঘর থেকে কারবার তুলে নিয়ে আলাইপুরার দিকে খুব বড় ক'রে আড়ৎ করেছে কি না, তাই এরা বল্‌তে এসেছিল—সাবেক ঘর ভাড়া নিয়ে আমি আবার কারবার সুরু করি।"

কথাটা শুনিয়াই যেন এক অপ্রত্যাশিত আনন্দে নারায়ণীর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সহসা বলিয়া ফেলিল,—"আমারও অনেক সময় এই কথা মনে হয়। এই কারবারে আমরা পড়েছি, আবার এর উপরই ভর দিয়ে আমরা উঠ্‌বো।"

স্ত্রীর মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"তুমি যে দেখছি আজকাল জ্যোতিষীর ওপরেও টেক্কা দিয়ে চলেছ! 'না বিইয়েই কানায়ের মা' হওয়ার মত, একবারে যে হঠাৎ গণৎকার হয়ে উঠলে দেখছি!"

নারায়ণী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই উত্তর দিল,—"গণৎকার বলে—গ'ণে,—সে ত সব-সময় খাটে না, ভুলচুক হয়ে যায়। আমি যে কথা বলি হঠাৎ, সেটা আমার মনের,—মায়ের ইচ্ছায় আমার মুখদিয়ে বেরিয়ে পড়ে ; এ মিথ্যে হবার নয়। দেখে নিও তুমি,—কারবার আমাদের হ'ল ব'লে!"

হাসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—'তা হ'লে মজুমদারের অস্ত্রগুলো অন্ততঃ শাণান সার্থক হয় বটে,—শাঁখের করাতের মত দুদিক দিয়েই কাটবার তার শুবিধেটি হয়ে যায়!"

ছোট মেয়ে আসিয়া বলিল,—"খাবার জায়গা করেছি, মা!"

নারায়ণী প্রসঙ্গটি পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"বেলা অনেক হয়েছে, আমি ভাত বাড়তে চললুম, তুমিও হাত-পা ধুয়ে বসবে এস—"

নারায়ণী পাথরের থালায় ভাত বাড়িতেছে,—গাঙ্গুলী মহাশয় হাত-মুখ ধুইতেছেন, এমন সময় নিরুপমার দাসী আসিয়া হাসিমুখে বলিল,—"চিনতে পার দিদিমণি?"

নারায়ণী তার মুখের দিকে চাহিয়া সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করিল,— "মজুমদার বাড়ীতে তুমি ছিলে না?"

হাসিয়া দাসী বলিল,—"হাঁগো দিদিমণি, এখনও সেইখানেই আছি। আহা, তখন কি ইন্দিরের ঐশ্বর্য্যই না ছ্যাল তোমাদের—কি দেখেছিনু আর কি দেখছি—"

গম্ভীর হইয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মনে ক'রে হঠাৎ এই উৎকণ্ঠার সময় আসা হয়েছে শুনি?"

দাসী বলিল,—"দিদিমণি পাঠালেন কি না; আসবার ত আর সময় পাই না—এই সময় একটু ফুরসুৎ পাই, তাই এসেছি। হাঁ—যা বলতে-ছিলুম,—আপনাদের অনেকদিন না দেখে দিদিমণির ভারি মন কেমন করছে কি না, তাই তিনি বলে পাঠিয়েছেন—কাল দুপুর বেলায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে তেনার ওখানে গিয়ে দুটি শাক-ভাত খাবে। আমি এসেই নিয়ে যাব তোমাদের।"

ক্ষমতার অহঙ্কারে মানুষ যে নির্লজ্জের মত এতটা অগ্রসর হইতে পারে, তাহা ভাবিতেও নারায়ণীর দেহ-মন তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু দাসী—পরিচারিকার কাছে উদ্বেল হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত না করিয়া সে তাহার স্বভাব-সিদ্ধ সতেজ স্বরেই বলিল,—“তোমার দিদিমণিকে ব'ল—যে মনে করে তিনি আমাদের তলপ করেছেন, এখন ছেলেমেয়েদের হাত ধরে তাঁর সামনে গিয়ে আমি যদি দাঁড়াই—তাঁর মন কেমন করাটি কমবে না—আরও বাড়বে তাতে। কাযেই সময় হ'লে, আমি নিজেই তাঁর কাছে যাব।—বুঝলে?”

ঠিক এই সময় বড় ছেলে ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—“মা, বাইরে একজন অতিথি এসেছে। সে কেবল মুখ আর পেট দেখিয়ে ইসারা করে বলছে—ভুখ লেগেছে, খাব।”

গাঙ্গুলী মহাশয় তখন সবেমাত্র বসিবার জন্য আসনখানির উপর গিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—তৎক্ষণাৎ তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দাসী বেজার হইয়া বলিল,—“আমরণ, ঠিক দুপুর বেলায় এসে বলেন—খাব, পিণ্ডি যেন তাঁর এখানে—”

নারায়ণী দুই চক্ষুতে অগ্নির ঝলক তুলিয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল,—“তুমি চুপ করত বাছা,—এসেছ, ব'সে থাক চুপ ক'রে, তোমার মুখে এ সব কথা কেন বল ত?”

গাঙ্গুলী মহাশয় আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন,—“কথা কিছু কইলেন না,—আমাদের ভাত-তরকারি সবই খাবেন,—আমি তাঁকে বসিয়েছি, তুমি শীগগীর ভাত তরকারী নিয়ে যাও, তিনি ভারী ব্যস্ত—”

বাহিরের ঘরখানির পাশে, অন্দরের পথটির ধারে, অলিন্দের মত একটু স্থান ছিল। সেইখানেই অতিথি বসিয়াছিলেন। দেখিলে তাঁহাকে পরিচ্ছদের দিক দিয়া সাধু সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হয় না,—পরনে ছিল

একখানি আধময়লা লালপেড়ে ধুতি, গলায় যজ্ঞোপবীত, মাথায় একখানা গামছা পাগড়ীর মত বাঁধা, বাহুমূলে একছড়া রুদ্রাক্ষের তাগা, ললাটে রক্তচন্দনের একটি ফোঁটা, শ্মশ্রুগুম্ফে মুখখানি আচ্ছন্ন হইলেও, মুখে একটি উদাসভাব প্রকাশ পাইতেছিল, সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক তাঁহার দুইটি উজ্জ্বল চক্ষুর দৃষ্টি।

নারায়ণী একখানি শ্বেত পাথরে অন্নব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া, গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া গাঢ়স্বরে বলিল,—"অতিথি-বিশ্বনাথের সেবা ইচ্ছামত করিবার শক্তি আজ আমাদের নেই, বাবা! অভাবগ্রস্তের শাক-অন্ন তৃপ্তি ক'রে গ্রহণ ক'র!"

অতিথির তীব্রদৃষ্টি পূর্ণ নয়ণ দুইটি যেন অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর্ত্তস্বরে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন! সে কি করুণ রোদন!—সকলেই স্তব্ধ, সন্ত্রস্ত;—গাঙ্গুলী মহাশয় ও নারায়ণী যতই জিজ্ঞাসা করেন,—কি অপরাধ আমাদের হ'ল বাবা!—কেন কাঁদছ? বল বল? বলিবে কে? ক্রন্দন আর থামে না!—নারায়ণীর অন্তর পর্য্যন্ত হাহাকার করিয়া উঠিল, দিবাদ্বিপ্রহরে অন্ন-ভোজ্য ক্রোড়ে লইয়া অতিথির এ রোদন কেন? হে বিশ্বনাথ! এ কি লীলা!—হঠাৎ সেই উচ্ছ্বসিত রোদনের ভিতর হইতে হো হো শব্দে বিকট হাসির ধ্বনি উঠিল! তাহার পরেই ভোজনের পালা সুরু হইল। সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন নিঃশেষ করিয়া, ঈঙ্গিতে পরম পরিতৃপ্তি জানাইয়া এই অদ্ভুত অতিথি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আচমনান্তে যাইবার সময় সহসা ফিরিয়া নারায়ণীর দিকে চাহিয়া অতিথি বলিলেন,—"সব দুঃখ তোর দূর হয়ে গেল, সুখ এল ব'লে!"—পরক্ষণেই উন্মত্তের মত অতিথি টলিতে টলিতে চলিয়া গেলেন, ফিরিয়াও তাকাইলেন না।

বাড়ীশুদ্ধ সকলেই স্তব্ধ, আনন্দও যে হয় নাই, তাহাও নহে। তবে বেশী আনন্দ হইয়াছিল সেই দাসীটির, দিদিমণির কাছে গিয়া নূতন সমাচার দিবার মত অনেক কিছুই সে আয়ত্ত করিয়াছিল।

—সাত—

আহারান্তে বাহিরের ঘরে বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে গাঙ্গুলী মহাশয় ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া বলিল,—"একটী ইনসিওর আছে, গাঙ্গুলী বাবু—"

সবিস্ময়ে গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"ইনসিওর? আমার নামে?"

পিয়ন বলিল,—"হ্যাঁ, বাবুজী, এই তার ইনটিমেশন—বড় ডাকখানা থেকে ছাড়িয়ে আনবেন। বেশী টাকার ইনসিওর ত আমাদের বিলি করতে দেয় না।"

রসিদ সহি করিয়া, পিয়নকে বিদায় দিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় ইন্‌টিমেশনখানির উত্তরাংশ পড়িয়া দেখিলেন—পাঁচ শত টাকার ইন্‌সিওর! ভাবিলেন, হয় ত নাম ভুল হইয়াছে। তাঁহার নামে পাঁচ শত টাকা পাঠাইবার ত কেহ নাই! কিন্তু বার বার তিন বার পড়িয়া দেখিলেন, নাম ও ঠিকানার কিছু-মাত্র ভুল-চুক হয় নাই! তবে? কে এই টাকার প্রেরক? কৌতূহলের সঙ্গে পড়িলেন—এস, কে, রায়, এটোয়া।

কিন্তু এটোয়ার এমন কোনও লোককেই তাঁহার মনে পড়িল না, যাহার সঙ্গে তাঁহার বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে!—তখন সহসা তাঁহার মনে হইল,

এইভাবের মিথ্যা ইন্‌সিওর পাঠাইয়া একটা জুয়াচুরি ব্যাপার তিনি কাগজে পড়িয়াছিলেন বটে! ইহাও হয়ত সেইভাবের কিছু হইবে। যাহা হউক, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া বড় ডাক-ঘরের উদ্দেশে তখনই বাহির হইয়া পড়িলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে গাঙ্গুলী মহাশয়কে কিছু উৎকণ্ঠিতভাবেই ফিরিতে দেখিয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল,—"খেয়ে-দেয়ে একটু না জিরিয়েই এই রদ্দুরে বেরিয়েছিলে কোথায়?"

গাঙ্গুলী মহাশয় নিজের স্থানটিতে বসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন,—"ব'স কথা আছে।"

স্বামীর মুখে নারায়ণী একটা অপ্রত্যাশিত ভাবান্তর দেখিয়া স্বামীর কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্রভাবেই তক্তপোষখানির একধারে বসিয়া পড়িল।

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"বছর বারো আগে সত্যকুমার বলে একটি ছেলে ঘিয়ের কাজ শেখবার জন্য আমাদের কারবারে এসেছিল মনে পড়ে?"

নারায়ণী বলিল,—"পড়ে বৈকি। তুমি তাকে ছেলের মত যত্ন করে কারবারে নিয়েছিলে ব'লে মজুমদার মশায়ের কি লাগানি-ভাঙ্গানী—"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"শেষে আমি ত্যক্ত হয়ে ছেলেটিকে আলাদা দোকান খুলতে পরামর্শ দিয়েছিলুম, আর অনেক টাকার মালও তখন তাকে ধারে দিই। ছেলেটি বছর তিন বেশ ভাল রকমই কাজ চালিয়েছিল, তারপর কি ভেবে, দোকান-পাট তুলে দিয়ে আমার হিসেব পত্র মিটিয়ে দিয়ে চ'লে যায়। তখন শুনেছিলুম কানপুরে গিয়ে কাজকর্ম্ম করবে। তারপর আর কোন পাত্তাই তার পাওয়া যায় নি।"

নারায়ণী বলিল,—"আজ যে হঠাৎ তার কথা নিয়ে এত চর্চ্চা? ব্যাপারখানা কি?"

গাঙ্গুলী মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"ব্যাপার একটু আছে বৈকি। এটোয়া থেকে সে হঠাৎ আমার নামে পাঁচশো টাকার এক ইনসিওর পাঠিয়েছে।"

সবিস্ময়ে নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, বল ত?"

গাঙ্গুলী মহাশয় ইনসিওর করা লম্বা লেফাফাখানি বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে একশো টাকার পাঁচ কেতা নোট ও সেই সঙ্গে একখানি কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ পত্র বাহির করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"পত্রখানি পড়ি—শোন, ব্যাপার সব বুঝতে পারবে।—পত্রের সবটা তুমি সময়মত প'ড় —আমি শুধু শেষটুকুই পড়ছি।—"

গাঙ্গুলী মহাশয় পত্রখানির শেষাংশ পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—"কানপুরে তিনটি বৎসর কাটাইয়া ঘিয়ের এনালাইজ করা শিক্ষা করিয়া এটোয়ায় আসিয়া উপস্থিত হই। আপনার আশীর্ব্বাদে, আপনারই শিক্ষায় শিক্ষিত ও আপনার নিকট অপরিশোধ্য ঋণপাশে আবদ্ধ, আপনারই শিষ্যস্থানীয় সত্যকুমার রায় এটোয়ায় ঘিয়ের ব্যাপারে আজ সর্ব্বেসর্ব্বা। অসংখ্য অ-বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালীর এই প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া আপনার ন্যায় মহানুভব নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। আপনার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা সংবাদ পত্রে অবগত হই। আপনার উদ্দেশে কয়েকখানি পত্রও লিখিয়াছিলাম; কিন্তু কোনও উত্তর পাই নাই। শেষে সম্প্রতি আপনার সেই বিখ্যাত ডাক্তার-বন্ধু অমিতাভ বাবু এখানে চেঞ্জে আসেন। তিনি এখনও সপরিবার এখানে আছেন। তাঁহার নিকট সমুদয় শুনিয়া, আপনার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আমি এক ওয়াগণ ঘি আপনার বরাবর ডেসপ্যাচ করিতেছি। ইহাতে আপনার লোকসানের কোনও দায়িত্ব নাই,—আড়তদার হিসাবে আপনি ইহা কাটাইবার ব্যবস্থা করুন। আমি নিজ হইতে মাশুল দিয়াই

মাল পাঠাইলাম। চুঙ্গী করা, ওয়াগন হইতে ঘিয়ের টিনগুলি গুদামে লইয়া যাওয়া, গুদাম ভাড়া, আফিস প্রভৃতির জন্ত আমি পাঁচশত টাকা অগ্রিম পাঠাইতেছি। আমার এই কার্য্যে বিস্মিত হইবার বা আমাকে ধন্তবাদ দিবার কিছুই নাই। পাশ্চাত্যদেশে শুনা যায়, কেহ কোন কারবার করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, সেই কারবারটি সূচনা করিবার সময়, যাহাদের নিকট সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের সম্মান রক্ষা করিতে বিস্মৃত হয় না। আমি যদি কাশীতে আপনার সংস্পর্শে না আসিতাম, আজ তাহা হইলে এত বড় প্রতিষ্ঠালাভের অবকাশ পাইতাম কি না, কে জানে। আমার এই প্রতিষ্ঠার মূলই যে আপনি গাঙ্গুলী মহাশয়! রেলের রসিদ ও চালান রেজেষ্টারী করিয়া সত্বর পাঠাইতেছি।

পড়িতে পড়িতে গাঙ্গুলী মহাশয়ের তুই চক্ষু অশ্রুময় হইয়া উঠিল,—আর নারায়ণীর তুইটী আর্দ্রনেত্রের উপর তখন শুধু প্রতিফলিত হইতেছিল,—করুণাময়ী জগজ্জননীর সেই রক্তিমাময় অভয় হাতখানি।

—আট—

মজুমদারের উদ্ধত ব্যবহার তরশ-সঙ্ঘকে সহসা ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নানাদিকে তাঁর শত্রু বৃদ্ধি হইতেছিল। হঠাৎ একদিন সহরময় রাষ্ট হইয়া পড়িল, সহসা ঘিয়ের বাজার নামিয়া যাওয়ায়, মজুমদার ভয়ানক লোকসান খাইয়াছেন, এবং তজ্জন্ত তিনি দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাইতেছেন।—ফলতঃ লোকসান খাইবার কথাটি সত্য হইলেও দেউলিয়া হইবার প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ

অলীক। কিন্তু এই মিথ্যা অপবাদ যাহারা প্রচার করিয়াছিল, তাহাদের অপূর্ব্ব তৎপরতায় কথাটি এমনভাবে সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল যে, অত বড় বুদ্ধির জাহাজ মজুমদার মহাশয়কে একদিনেই মাৎ হইতে হইল। সকালে দোকান খুলিতেই সমস্ত পাওনাদার একসঙ্গে আসিয়া টাকার তাগাদা আরম্ভ করিল। বাড়ীতে বসিয়া সমস্ত শুনিয়া মজুমদার প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার পরামর্শ-দাতা উকিলের শরণাপন্ন হইলে তিনি অবস্থার কথা শুনিয়া, কলিকাতার এক নজীর টানিয়া বলিলেন যে, এক নামী ব্যবসায়ীরও নাকি এইরূপ বিপদ আসিয়াছিল। তাঁহার দেনার পরিমাণ ছিল কয়েক লক্ষ টাকা, কিন্তু তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে সিকিউরিটি রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। পুলিশ-পাহারায় থলিবন্দী কাঁচা টাকাগুলি তাঁহার দোকানে লইয়া ঝম্‌ঝম্ শব্দে ঢালা হইতে লাগিল, আর মালিকের দারোয়ানরা দেউড়ী হইত তর্জ্জন করিয়া এক এক পাওনাদারের নাম ধরিয়া হাঁকিতে লাগিল এবং মালিক তাহার হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়া বলিতেছিলেন,—'রাম—রাম! আর আমার দোকানে তুমি মাথা গলিও না!'—পাঁচ সাত জন পাওনাদারের হিসাব এইভাবে চুক্তি হইলে, অন্যান্য পাওনাদাররা বুঝিলেন, মালিকের দেউলিয়া হইবার সংবাদ মিথ্যা; তখনই তাহারা সেলাম বাজাইয়া হিসাব না লইয়া চলিয়া গেল এবং যাহারা হিসাব চুকাইয়া লইয়াছিল, ভবিষ্যতে ঘর মারা যাইবার ভয়ে, তাহারাও ত্রুটি স্বীকার করিয়া—টাকা ফেরৎ দিয়া মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করিয়াছিল।

এই নজীরসূত্রে সেই বিখ্যাত ব্যবসায়ীর নামটি শুনিয়া, বুদ্ধিমান মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার পন্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইলেন। নিরুপমাকে রাজী করাইয়া, সমস্ত সম্পত্তি, কোম্পানীর কাগজ, এমন কি, নিরুপমার মূল্যবান্ অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কে সিকিউরিটি রাখিয়া সত্তোর

হাজার টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল। কাঁচা টাকা সেদিন পাওয়া গেল না, স্থির হইল, পরদিন বেলা তিনটার মধ্যে এই টাকা মজুমদার মহাশয় বুঝিয়া লইবেন ও দুইজন কনেষ্টবলের পাহারায় তাঁহার আড়তে লইয়া যাইবেন। এই যুক্তি-অনুসারে পাওনাদারদের বলিয়া দেওয়া হইল যে, তাহারা যেন পরদিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আড়তে আসিয়া তাহাদের হিসাব চুকাইয়া লইয়া যায়।

এইদিন সন্ধ্যার পর এই অঞ্চলে এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইল। পাঁচ সাত খানি বিলাতী কাপড়ের দোকানের মালিক আগা খাঁ নামে এক পাঞ্জাবী ধনী-মুসলমান দোকান বন্ধ করিয়া যখন বাসায় ফিরিতে-ছিল, হঠাৎ কে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করে। তাহার ফলেই হতভাগ্যের ইহলীলার অবসান হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের কথা সন্নিহিত মুসলমান প্রধান পল্লীসমূহে প্রচার হইয়া পড়িল। লুণ্ঠনপ্রিয় নিষ্কর্ম্মা বদমাইস্ গুণ্ডারদল এই ব্যাপারটিকে তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির একটি চমৎকার উপায়রূপেই বরণ করিয়া লইল। রাতারাতিই নানাস্থানে গুণ্ডাদল সমবেত হইয়া এই হত্যাসূত্রে লুঠতরাজের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। অথচ এই সলা-পরামর্শ এমনই গোপনে সম্পন্ন হইল যে, বাহিরের কেহই এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই।

পরদিন অপরাহ্ণে এক বিরাট মিছিল করিয়া নিহত আগা খাঁর মৃতদেহ ষ্টেশনে নীত হয় এবং স্পেশাল ট্রেণে তাহা সরাসরি লাহোরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা থাকে। শবযাত্রা সমাধা করিয়া এই মিছিল সহসা উত্তেজিত হইয়া সমগ্র আলাইপুরা মহল্লায় ছড়াইয়া পড়িল। মুসলমান দোকানগুলি সমস্তই এদিন বন্ধ ছিল, কিন্তু হিন্দু দোকানদাররা দোকান বন্ধ করিবার কোনও যুক্তিযুক্ত হেতু না দেখিয়া এবং এমন একটা আসন্ন বিপদ্ সম্বন্ধে কোনও কিছু

না জানিয়াই তাহারা দোকান খুলিয়া রাখিয়াছিল। মিছিলের সেই উত্তেজিত জনতা সন্নিহিত হিন্দু দোকানগুলির উপর আপতিত হইয়া বলপূর্ব্বক দোকান বন্ধ করিয়া দিবার প্রসঙ্গে গায়ে পড়িয়া বিবাদ বাধাইল। দেখিতে দেখিতে দোকানগুলি লুঠ হইতে লাগিল।

মজুমদার মহাশয় তিনটার পূর্ব্বেই সুশৃঙ্খলে টাকার থলিগুলি পুলিস পাহারায় আনাইয়া আড়তের গদিঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। আড়তের সকলেই টাকার রক্ষণাবেক্ষণে গদিঘরে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। পাছে পুলিশ অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দাবী করে, তজ্জন্য কনেষ্টবল দুই জনকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মজুমদার মহাশয় তাঁহার কর্ম্মচারী-দিগকে শিখাইতেছিলেন,—যেমন পাওনাদারের দল আড়তের হাতায় আসিয়া উঠিবে, অমনই তিন চারিটি থলির মুখ খুলিয়া টাকাগুলি একসঙ্গে মেঝের উপর ঢালিয়া দিবে। আওয়াজ শুনিয়াই যেন তাহাদের দিল ঘাবড়াইয়া যায়।

ঠিক পাঁচটার সময় আড়তের চারিধারেই গোলমাল উঠিল এবং কয়েক-জন মুসলমান আড়তের হাতার মধ্যে প্রবেশ করিল। মজুমদারের শিক্ষামত তাহাদিগকে পাওনাদার মনে করিয়া কর্ম্মচারীরা একসঙ্গে পাঁচটি থলির টাকা ঢালিয়া ফেলিল,—মধুর গম্ভীর ঝম্ ঝম্ শব্দে আড়ৎ মুখর হইয়া উঠিল। আর যায় কোথায়, দেখিতে দেখিতে পঙ্গপালের মত লাঠি, শড়কি, শাবল, ভোজালি, তরবারি, টাঙ্গি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গুণ্ডার-দল আড়তে প্রবেশ করিয়া মজুমদারের সযত্নে সংগৃহীত অর্থরাজি লুঠ করিতে লাগিল।

—নয়—

আগা খাঁর হত্যা কাশীর সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মূলতত্ত্ব হইলেও একদল মুসলমান গুণ্ডাই যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং মুসলমানপ্রধান স্থানে প্রবল হইয়া হিন্দুদের যাবতীয় দোকান, দেবায়তন প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়াছিল, বহু হিন্দুকে লাঞ্ছিত ও হতাহত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। বাঙ্গালীটোলা ও অন্যান্য স্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবল হিন্দু-সঙ্ঘও দলবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব মহল্লার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, বিপন্ন হিন্দু-সমাজের সহায়তার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে, আলাইপুরা ও তৎসন্নিহিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান-সঙ্ঘ এই সব অঞ্চলের অবরুদ্ধ মুসলমানদের সাহায্য-কল্পে আসিবার জন্য পাঁয়তারা কসিতে থাকে। ঠিক এই সময় সৈন্যদল ও প্রচুর পুলিশবাহিনী সংযোগস্থল-সমূহে সমবেত হইয়া উভয় পক্ষকেই নিরস্ত করে। ফলে মুসলমানপ্রধান স্থানসমূহে মুসলমানগণ যেমন অত্যাচার চালাইতেছিল, হিন্দুপ্রধান স্থানসমুহে হিন্দুগণও তেমনই তাহার পাল্টা জবাব দিতেছিল। পক্ষান্তরে, সহৃদয় ও ন্যায়নিষ্ঠ হিন্দু এবং মুসলমান সুধীবৃন্দ উভয় সম্প্রদায়ের বিপন্নগণকে যথাশক্তি সাহায্য ও তাহাদের রক্ষার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

বেনিয়া পার্কের সন্নিহিত পল্লীগুলির অধিকাংশই মুসলমান-প্রধান এবং একদল মুসলমান গুণ্ডা হাঙ্গামার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে চেৎগঞ্জ হইতে বেনিয়া পার্ক পর্য্যন্ত স্থানে সমবেত হইয়া ষ্টেশন হইতে সমাগত যাত্রীদের মালপত্রলুণ্ঠন ও নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতন করিতেছিল। আবদুল ও ভণ্ডুল

আসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়কে জানাইল,—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন গাঙ্গুলীবাবু, আপনার কোনও ডর নেই।"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"যদি আমাকে নিশ্চিন্ত করতে চাও আবদুল, তা হ'লে তুমি তোমার দলবল নিয়ে বাগানের মোড়ে মওড়া নাও,—নিরীহ যাত্রীদের রক্ষা কর।" গাঙ্গুলী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না হইতে বাগানের মোড়ে রাস্তার উপর এক দল গুণ্ডা হল্লা করিয়া উঠিল। লাঠির ঠকাঠক শব্দের সহিত খবর আসিল—একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীকে ঘিরিয়া এক দল গুণ্ডা গাড়ীর উপর লাঠি চালাইতেছে। আবদুল বাহিরে আসিয়া জোরে একটা আওয়াজ দিতেই লাঠি-হাতে বিশ পঁচিশ জন জোয়ান ছুটিয়া আসিল, তাহাদের মধ্যে ভণ্ডুল ও কয়েকজন আহীরও ছিল।—আবদুলের সহিত সকলেই অকুস্থলে ছুটিয়া চলিল, গাঙ্গুলী মহাশয়ও ছুটিলেন। অকুস্থলে গিয়া দেখা গেল, ঘোড়াটা জখম হইয়া গিয়াছে, গাড়ীর নানাস্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হিন্দু গাড়োয়ান ও তাহার সঙ্গী সাংঘাতিকভাবে জখম হইয়াছে। গুণ্ডারদল তখন ঘোড়ার মুখ ধরিয়া গাড়ী থামাইয়াছে, গাড়ীর আরোহীদের মধ্যে বৃদ্ধ মাড়োয়ারীর উপর ছোরা চালাইয়া, দুইজন গুণ্ডা সালঙ্কৃতা মাড়োয়ারী মহিলা ও তাহার শিশু পুত্রটিকে টানিয়া বাহিরে আনিতেছে। ঠিক এই সময় আবদুলের দল আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। আবদুল ও ভণ্ডুলকে দেখিয়াই গুণ্ডারা সেলাম বাজাইল। আবদুল কি একটা ইসারা করিতেই তাহারা সদলবলে ঝড়ের মত চলিয়া গেল। গাঙ্গুলী মহাশয় ভণ্ডুলের সহায়তায় মাড়োয়ারী মহিলা ও তাহার ছেলেটিকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন, —নারায়ণীর হাতে তাহাদের শুশ্রূষার ভার দিয়া, পুনরায় যথাস্থানে আসিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধের অবস্থা সাংঘাতিক, গাড়োয়ান ও তাহার সঙ্গী

দুইজনেরই মাথা ফাটিয়াছে, হাত ভাঙ্গিয়াছে, রক্তে গাড়ীর গদী ও নীচের রাস্তা ভিজিয়া গিয়াছে। সে ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। গাড়ীতে যে মালপত্র ছিল, তাহাও রক্ষা পাইয়াছিল। ভগুলের জিম্বায় সে সব দিয়া, গাঙ্গুলী মহাশয় আহতদিগকে সেই গাড়ীতেই কবিরচৌড়ার সরকারী হাসপাতালে লইয়া চলিলেন। আবদুল ও কয়েকজন আহীর সঙ্গে চলিল, আবদুলের এক অনুচর ঘোড়ার মুখ ধরিয়া কোনরূপে গাড়ীখানিকে টানিয়া লইয়া চলিল। হাসপাতালে গিয়া দেখা গেল, অত বড় বাড়ী এই ব্যাপারে একেবারে পরিপূর্ণ,—যেন যুদ্ধের হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে। অতিকষ্টে আহত বৃদ্ধের জন্য যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, গাঙ্গুলী মহাশয় গাড়ী-ঘোড়া হাসপাতালের জিম্বাতেই রাখিয়া দিলেন। তাহার পর পুনরায় বৃদ্ধ মাড়োয়ারীর শয্যার নিকট গিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"আমি বাঙ্গালী, আপনার সঙ্গে গাড়ীতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। তাঁরা আমার বাড়ীতেই আছেন। আমি নিত্য এসে আপনার সন্ধান নেব।"

সাংঘাতিকভাবে বক্ষে আঘাত পাওয়ায় বৃদ্ধ বাক্‌শক্তি হারাইয়াছিলেন। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রশান্ত মুখখানির উপর গভীর মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র।

মাড়োয়ারী মেয়েটির দেহে যদিও কোন আঘাত পড়ে নাই কিন্তু সেই ভয়াবহ ব্যাপারে সে এতদূর ভয়াতুর হইয়া পড়িয়াছিল যে, ঘন ঘন তাহার মূর্চ্ছা হইতেছিল, ছেলেটি যদিও ছেলেদের দলে মিশিয়া গিয়াছিল, কিন্তু মায়ের অবস্থা দেখিয়া সেও মাঝে মাঝে কাঁদিতেছিল। নারায়ণী একখানি স্বতন্ত্র ঘরে তাহাদের শয্যা পাতিয়া দিয়া স্বহস্তে সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিল।

পাঁচদিনব্যাপী ভয়াবহ দুর্যোগের পর শান্তির হাওয়া বহিল। নেতৃবর্গের উপস্থিতি, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু-মুসলমানের চেষ্টা এবং খোদাই চৌকীর সুযোগ্য কোতয়ালের অক্লান্ত পরিশ্রমে উভয় পক্ষই শান্ত সংযত হইল।

হনুমান ফটকায় হিন্দুদের যে সব দোকান ও আড়ত ছিল, তন্মধ্যে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল মজুমদার মহাশয়ের সুবৃহৎ ব্যবসায়। নগদ ৭০ হাজার টাকা ত প্রথম দিনেই লুন্ঠিত হইয়াছিল, তাহার পর দোকানের সমস্ত মাল পত্র শত শত ঘৃতপূর্ণ টিন, কাপড়ের বড় বড় বস্তা—সমস্তই প্রকাশ্য দিবালোকে লুঠ হইয়া যায়। তৃতীয় দিনে দোকানের আফিস্ ঘর ও গুদামে গুণ্ডারা অগ্নিসংযোগ করিয়া দেয়,—ফলে আফিসের কাগজপত্র, হাতচিঠা, খাতা, খতিয়ান, চেয়ার, টেবিল, আলমারি প্রভৃতি সমস্তই ভস্মীভূত হইয়াছিল। নগদ টাকাগুলি লুণ্ঠনকারীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মজুমদার মহাশয় ও তাঁহার লোকজন মরিয়া হইয়া উঠিলেও, গুণ্ডাদের সংখ্যাধিক্যে লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইয়াছিলেন। মজুমদার মহাশয়ের মাথায় একটি বড় রকমের আঘাতও লাগিয়াছিল। আহত অবস্থায় যখন তিনি বাড়ীতে নীত হন, তখন তাঁহার সংজ্ঞা ছিল না। লোকজনের মুখে সবিশেষ শুনিয়া, নিরুপমা কপালে আঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। স্বামীর সাংঘাতিক অবস্থা অপেক্ষা সর্ব্বস্বনাশের দুশ্চিন্তা তাহাকে অধিকতর মুহ্যমান করিয়া ফেলিয়াছিল!

—দশ—

মাড়োয়ারী মহিলাটি ক্রমে সুস্থ হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, গাড়ীর ভিতরে যে বৃদ্ধটির উপর গুণ্ডারা ছোরা চালাইয়াছিল, তিনি তাঁহার পিতা। বিকানীর হইতে পিতার সহিত একমাত্র পুত্রকে লইয়া কাশীতে তিনি সেই দিনই আসিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি কখনও আর কাশীতে আসেন নাই। তাঁহার স্বামী কাশীতেই কারবার করেন। তাঁহার ঠিকানা পিতার জানা আছে, মহিলাটী তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

সেইদিন সহরে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পাঁচটি দিন পরে কাশীবাসী মুক্তবাতাসে বাহির হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। সে দিন আবার শিবরাত্রির পর্ব্ব! অন্যান্য বৎসর এইদিন বারাণসী আনন্দোৎসবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—অসংখ্য ভক্তসমাগমে শিবপুরী যেন টলমল করিত, এবার সে উল্লাস নাই,—পরিত্যক্ত নগরীর মতই যেন নিঝুম, নিস্তব্ধ!

গাঙ্গুলী মহাশয় আবদুলকে লইয়া হাসপাতালে সেই ভদ্রলোকটির সংবাদ লইতে চলিলেন। হাসপাতালের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আজ আহতদের পরিজনে পরিপূর্ণ। বহু চেষ্টার পর সেই ভদ্রলোকটির শয্যার নিকট গিয়া, তাঁহার অতি পরিচিত এবং কাশীর শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বদরীনারায়ণ মাড়োয়ারীকে সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। এই বিখ্যাত ব্যবসায়ীর সহিত তাঁহার কয়েক লক্ষ টাকার কারবার হইয়া গিয়াছে, শেষে তাঁহার দুর্দ্দিন যখন ঘনাইয়া আসে, হাজার পনের টাকার জন্য এই বদরী-নারায়ণ মাড়োয়ারীই প্রথম নালিশ করিয়া তাঁহার বসতবাটীখানি নীলামে

তুলেন ও শেষে কৌশলপূর্ব্বক নিজেই অপর নামে দেনার টাকাটুকুতেই ডাকিয়া লন। গাঙ্গুলী মহাশয়কে দেখিয়াই বদরীনারায়ণ বলিয়া উঠিলেন, "রাম, রাম, বাবু সাহেব, কি হালচাল আছে ?"

গাঙ্গুলী মহাশয় উত্তর দিলেন, "দেখতেই পাচ্ছেন, হালচালের ঘটা !—" এই লোকটির কাছে দাঁড়াইতেও তাঁহার অমন প্রশান্ত মনটিও যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল,—শয্যাশায়ী সেই মুমূর্ষু বৃদ্ধটির মুখের দিকে একটিবার মাত্র চাহিয়াই তিনি চলিয়া আসিলেন। বাহিরের দালানে সবেমাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় বদরীনারায়ণ ঝড়ের মত বেগে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিলেন—'বাবুজী !'

গাঙ্গুলী মহাশয় স্তব্ধ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মাড়োয়ারী গাঢ়স্বরে বলিলেন,—"মেহেরবাণি কোরিয়ে ঐ বুড্‌ঢা আদমীর সাথে একবার মুলাকাৎ ত কো'রতে হোবেক বাবু সাহেব। হামি বুঝিয়েছি—আপিলোক হামিলোককে দেখেই, গোসা কোরে তুরন্ত পালিয়ে আসিয়েছেন। হামি, শুনিয়েছি,—আপিলোক উনিলোকের জান মান বাঁচিয়েছেন। উনিলোকের আর্জ্জী বাবুজী—আসেন—আসেন"—বলিয়াই বদরীনারায়ণ বিস্মিত গাঙ্গুলী মহাশয়ের হাতখানি ধরিয়া পুনরায় ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় আপত্তি করিবার অবসরও পাইলেন না, প্রয়োজনও বুঝিলেন না।

বৃদ্ধের তখনও বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসে নাই। গাঙ্গুলী মহাশয়কে দেখিবামত্র দুইচক্ষু তাঁহার জলে ভরিয়া গেল। হাতদুটি তাঁহার তখনও ব্যাণ্ডেজ করা ছিল, হাত তুলিতে না পারিলেও দুই চক্ষু ও কম্পিত ওষ্ঠ নীরবে যে-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছিল, তাহা কাহারও দুর্ব্বোধ্য ছিল না।

বদরীনারায়ণ মাড়োয়ারী গাঙ্গুলী মহাশয়ের দুইটি হাত ধরিয়া সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিলেন,—"বাবুজী ইনি আমার শ্বশুর আছেন। হাল ও অবস্থা ত এঁর দেখতে পাচ্ছেন। এতক্ষণে অন্ধকারেই ছিলুম,—আভাসে কোন রকমে ইনি আমাকে দুর্ঘটনাটি জানিয়েছেন। আপনি হঠাৎ সেই সময়ে এসে পড়াতেই ইনি জানালেন যে, দেবদূতের মত আপনি কি কাণ্ডই না আমাদের জন্ম করেছেন।—এখন বলুন বাবু সাহেব, দোহাই আপনার, দয়া ক'রে বলুন—আমার স্ত্রী—আমার—ছেলে—"

গাঙ্গুলীমহাশয় নিজের বিস্ময়ভাব কষ্টে সংযত করিয়া সহজ ভাবেই উত্তর দিলেন,—"তাঁদের জন্ম আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি যদি তাঁদের কাছে সঠিক ঠিকানা পেতুম, তাহ'লে সেই দুর্যোগ মাথায় করেই তাঁদের আপনার বাড়ীতে পৌছে দিতে পারতুম। কিন্তু আমার স্ত্রীর কাছে তিনি আপনার যে নাম বলেছিলেন—"

বদরীনারায়ণ বলিলেন,—"সে নামের সঙ্গে ত আপনার পরিচয় নেই, বাবু সাহেব! আমাদের বাড়ীতে এক নাম, আবার কারবার ক্ষেত্রে আলাদা নাম যে!—এখন আর্জ্জী শুনুন। শিবরাত্রির মধ্যেই এঁদের আসবার কথা ছিল। বিকানীর থেকে রওনা হবার দুদিন আগেই চিঠি দিয়েছিলেন। তারপর আগ্রা ষ্টেশন থেকে তারও করেছিলেন। সেই চিঠি ও তার এতদিন পাইনি। আজ সকালে সিটি পোষ্ট অফিসে গিয়ে খুঁজে পেয়েছি। বুঝতেই পারছেন, আমার হাল তখন কি হয়েছিল! আমার মত এমনই অবস্থায় যাঁরা যাঁরা পড়েছিলেন, হাসপাতালে খবর নেওয়া ভিন্ন আর উপায় ছিল না। প্রথমে যাই—মাড়োয়ারী হাসপাতালে, তারপর এখানে আসি। এঁকে দেখেই যেন আসমান থেকে পড়লুম। একটি ঘণ্টা কাছে বসে, এঁর এই অবস্থাতেও কতকটা জানতে পারি।

তারপর আপনি এসে উপস্থিত হন। বাবুসাহেব! বাবুসাহেব! আপনাকে আর কি বলব,—আপনার কাছে আমি বেইমান,—আপনার সর্ব্বনাশ করেছি আমি—তাই আপনি আমাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন,—ঠিক সেই সময় শ্বশুর সাহেব ব্যগ্র হ'য়ে আপনাকে ডাকতে ইসারা করলেন। তাঁর হালচাল দেখে বুঝলুম—আপনি—আপনি বাবু সাহেব, সেই লোক আপনি—আমার জান মান সর্ব্বস্ব যিনি বাঁচিয়েছেন!"

মাড়োয়ারী মহাজনের আর্ত্তস্বরে অভিভূত হইয়াই গাঙ্গুলী বলিলেন,—"বাঁচাবার মালিক যিনি, তিনিই বাঁচিয়েছেন। আমি তাতে উপলক্ষ হয়েছি মাত্র। যাক্, এখন আপনি আমার বাসায় চলুন,—তাঁরা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন।"

মাড়োয়ারী মহাজন বদরীনারায়ণ বাসার বাহিরের ঘরখানিতে উঠিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"এই আপনার বাসা, বাবু সাহেব?"

গাঙ্গুলী মহাশয় অবিচলিতস্বরে বলিলেন,—"নারায়ণজী এখন এখানেই এনে ফেলেছেন বটে! আমি এই ঘরটিতেই বাসা নিয়েছি।"

বদরীনারায়ণ একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর গাঢ়স্বরে বলিলেন,—"আপনি তাকে যখন রক্ষা করেছেন, তার বাপ হয়েছেন, সে ত আপনার মেয়ে। শুধু তাই নয়, আপনি এখন থেকে আমারও বাবা—"

গাঙ্গুলী মহাশয় মেয়েকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—"ওঁদের বল, মাড়োয়ারী বাবু এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন।"

একটু পরেই গাঙ্গুলী মহাশয়ের মেয়ে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে বদরীনারায়ণ বাহিরের ঘরে আসিয়া হঠাৎ গাঙ্গুলী মহাশয়ের পা দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া ভাব-গদ্‌গদস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"বাবু সাহেব! আমাকে রক্ষা করুন!"

ব্যস্তভাবে গাঙ্গুলী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—"করেন কি আপনি—উঠুন, উঠুন!"

বদরীনারায়ণ বলিতে লাগিল,—"এঁদের কাছে যা শুনলাম, আর চোখেও যা দেখলাম, তাতে জেনেছি বাবু সাহেব! আপনি মানুষ নন, দেবতা; আর আপনার স্ত্রী—স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা! আপনি এঁদের রক্ষা করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, একটি জিনিষও তছরুপ হ'তে দেননি। ঐ তোরঙ্গটির ভিতর নোটে টাকায় পঞ্চাশ হাজার—"

হাসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"তা আমি জানি। মা-লক্ষ্মী নিজেই তা বলে রেখেছিলেন যে! আর সেইজন্যই ভাবনা আমার বেশী হয়েছিল, বদরীনারায়ণজী! নারায়ণ আমার মুখ রক্ষা করেছেন।"

হাত দুখানি জুড়িয়া, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া বদরীনারায়ণ এবার বলিলেন, —"এক আর্জ্জী আপনাকে রক্ষা করতে হবে, বাবুসাহেব! নইলে আমি এখান থেকে উঠব না।"

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন,—"বলুন।"

"আপনার সাবেক বাড়ীখানি পড়ে আছে। কোন ভাড়াটে সে বাড়ীতে থাকতে পারেনি। আপনি আবার আপনার বাড়ীতে চলুন।"

"সে বাড়ীতে যাবার মত অবস্থা আমার এখনও আসে নি, তবে যদি দিন পাই, আর আপনি তখন সদয় থাকেন, বাড়ী তখন ফিরিয়ে নেব।"

বদরীনারায়ণ অধৈর্য্যভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"আপনি সদয় হয়ে এখনই সেটা ফিরিয়ে নিন, বাবু সাহেব! আমাকে বাঁচান। ঐ বাড়ী নিয়ে

অবধি আমি কারবারে মার খাচ্ছি, এদিকেও জানে মরতে বসেছি।—এতে টাকার কথা কিছু নেই, বাবুজী।"

গাঙ্গুলী মহাশয় মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে বদরীনারায়ণের মুখের দিকে তাকাইতেই সেই দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া তিনি বলিলেন,—"সে স্পর্দ্ধা আমি করি না বাবু সাহেব, যে আপনাকে খয়রাত করব! আমি আপনাকে চিনি। আপনি আমাকে ঐ টাকার হাতচিঠা বানিয়ে দিন, মাসে মাসে যা পারেন দেবেন,—আমি কিন্তু কালই বিক্রীর কোবালা রেজেষ্টারী ক'রে দেব। বলুন, এতে আপনার আপত্তি নেই?"

গাঙ্গুলী মহাশয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"বিশ্বনাথের যদি এই ইচ্ছাই হয়,—হবেও তাই।"

শিবরাত্রির ছুটির পর রেজেষ্টারী আফিস খুলিতেই বদরীনারায়ণ মাড়োয়ারী প্রতাপ গাঙ্গুলীর নামে তাঁহার সেই সাবেক বাড়ীখানির বিক্রয়পত্র সম্পাদন করিয়া দিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয়ও এক হাতচিঠিতে বদরীনারায়ণের নিকট পনেরো হাজার টাকা দেনা স্বীকার করিলেন।

বদরীনারায়ণ হাতচিঠিটি লইয়া হাসিয়া বলিলেন,—"এই জিনিষটি সে দিনের স্মরণচিহ্নের মত আমার স্ত্রীর সেই তোরঙ্গের মধ্যেই তোলা থাকবে। বাইরের কেউ এর হদিস্ পাবে না। তারপর আমার স্ত্রীর যা চ্ছা হবে, সে তার মা-বাপের জন্তে তাই করবে। তা ছাড়া আমার তরফ থেকে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি,—আবার আপনি কারবার সুরু করুন। আমার কারবার আপনাকে চোখ বুজিয়ে মাল দিয়ে যাবে।

আমি চাই, আপনি আবার দাঁড়িয়ে ওঠেন, আপনার খ্যাতি আবার ফিরে আসে।"

সাবেক বাড়ীতে গাঙ্গুলী-পরিবার প্রত্যাবর্ত্তন করায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কারবারটিও পুনরায় চালু হওয়ায়, সহরময় পুনরায় আন্দোলন উঠিল। জনপ্রিয় গাঙ্গুলী মহাশয়ের অদৃষ্টের এই বিচিত্র ইতিহাস তাঁহার গুণমুগ্ধ সমাজকে যখন বিস্ময়ানন্দে অভিভূত করিয়া তুলে, সেই সময় তাঁহার 'বিষকুম্ভপয়োমুখম্' মিত্র মজুমদারের কানে এই প্রসঙ্গ উঠিতেই তিনি চীৎকার বলিয়া উঠেন, একেই বলে—আলো ছায়ার খেলা।

আলো ছায়ার খেলা

দ্বিতীয় রূপ

—এক—

হরিহরছত্রের মেলা উপলক্ষে পাটনা জংশন ষ্টেশনে সে দিন বুঝি আর লোক ধরিতেছিল না। প্লাটফরম, মুসাফিরখানা ও সন্নিহিত স্থলগুলি যখন কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়, এবং পরবর্ত্তী ট্রেণগুলির যাত্রিগণ ষ্টেশনে নামিয়া অর্দ্ধেক রাতটুকু কোথায় কাটাইবে—সেই ভাবনায় ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা যখন অস্থির, সেই সময় কিন্তু উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের সুবৃহৎ বিশ্রাম ঘরখানি মাত্র গুটিচারেক প্রাণীর বৈঠকখানায় পরিণত হইয়াছিল।

এ-ঘরে কাহারও প্রবেশ করা ত পরের কথা, কানাচে ঘেঁসিবারও যো ছিল না। যেহেতু রুদ্ধ দরোজাটির গায়ে খুরসীর আড়াল দিয়া পুলিসের ইউনিফরম-পরা যে জবরদস্ত মানুষটি তাহার উপর সোজা হইয়া বসিয়াছিল, তাহার জমকালো তকমা ও দুই চোখের জলন্ত দৃষ্টি যেন সকলকে জানাইতেছিল—হঠ্ যাও, ভাগো হিঁয়াসে।

ঘরের মধ্যে ছিলেন নামজাদা পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার জাহ্নবী মিত্র, তাঁহার পত্নী সুহাসিনী এবং অল্প বয়স্ক দুইটি পুত্র কন্যা। ছেলে মেয়ে দুটি কিছুক্ষণ ছুটাছুটি ও হুড়াহুড়ি করিয়া এইমাত্র এক একখানি আরাম কেদারা আশ্রয় করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখী বসিয়া যে-আলাপ করিতেছিলেন, এই উপন্যাসের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় অবিকল উল্লেখ করিতে হইতেছে।

জাহ্নবী মিত্রের হেড কোয়ার্টার বর্ত্তমানে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দেওঘর, কিন্তু এই অঞ্চল বিহার সরকারের এলাকাধীন বলিয়া এবং এই

আলো ছায়ার খেলা

বিস্তীর্ণ প্রদেশের মধ্যে অপরাধ ও অপরাধীর আবিষ্কার-ব্যাপারে অসামান্য পটুতা থাকায়, পুলিস-বিভাগের কর্তৃপক্ষদের জরুরী বৈঠকে মিষ্টার মিত্রও আহূত হইয়া থাকেন। বিহার-রাজধানী পাটনায় এরূপ এক বৈঠকে যোগ দিবার আহ্বান পাইয়া রাত্রির ট্রেণে জাহ্নবী মিত্রকে পাটনায় আসিতে হইয়াছে। সমগ্র সাঁওতাল পরগণার হেড-কোয়ার্টার হইতেছে দুমকা। ডিষ্ট্রিক্ট পুলিসের বড় কর্ত্তা মিষ্টার হুইলার জাহ্নবী মিত্রের শুভানুধ্যায়ী মুরুব্বী, জাহ্নবীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ও নির্ভরতার অন্ত নাই। পুলিস-মহলে কানাঘুসা চলে—মিষ্টার হুইলার জাহ্নবীর হাতে ক্ষমতা সম্পর্কে 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' দিয়া রাখিয়াছেন। সেই হুইলার সাহেবেরও এই বৈঠকে যোগ দিবার কথা, কিন্তু তিনি জাহ্নবীর উপরেই সকল ভার দিয়া শারীরিক অসুস্থতার অজুহতে বায়ু-পরিবর্ত্তনে দুমকা ছাড়িয়া রাঁচি গিয়াছেন। অন্যান্যবার জাহ্নবী একাই আসেন এবং সদ্য সদ্য দেওঘরে ফিরিয়া যান। কিন্তু এবারকার বৈঠক কয়েক দিন স্থায়ী হইবে এরূপ আভাস পাইয়া, বিশেষতঃ ঠিক এই সময় কার্ত্তিকী-পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নানের দুর্লভ যোগটি উপস্থিত হওয়ায় পত্নী সুহাসিনীও আব্দার ধরেন—'এত কাছে আছি, অথচ পাটনা কখন দেখি নি। সামনেই যখন স্নানের এত বড় যোগ রয়েছে, এবার আর ছাড়ছি নে। পাটনাও দেখবো, যোগের সময় গঙ্গায় একটা ডুবও দেব, গাঙ্গ পেরিয়ে হরিহর ছত্রের মেলাটাও দেখে নেব।' কাজেই জাহ্নবীকে এক সঙ্গে 'রথ দেখা আর কলা বেচা'র ব্যবস্থা করিতে হয়। পাটনা পুলিসকোর্টের চীফ ইন্‌স্পেক্টর রামসদয় বাবু জাহ্নবীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। গৃহিণীর অভিপ্রায় জানাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে যথোচিত ব্যবস্থার জন্য তার করেন। রামসদয় বাবু তারযোগে সেই দিনই জবাব দেন—'সমস্ত প্রস্তুত থাকবে। গাড়ী নিয়ে তিনি ষ্টেশনে হাজীর থাকবেন।' কিন্তু সপরিবার ষ্টেশনে

আসিয়া জাহ্নবী শুধু বিপুল জনস্রোত দেখিলেন, বন্ধুর কোন পাত্তাই পাইলেন না। অগত্যা আরদালী মিহিরজীকে লগেজপত্র সহ দ্বারে মোতায়েন রাখিয়া অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবেই তাঁহাকে উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের এই বিশ্রাম ঘরটি অধিকার করিতে হইয়াছে। ঘরখানি অবশ্য খালি ছিল না; ষ্টেশন কর্ম্মচারীদের পোষ্যবর্গ অধিকাংশ সময় এই কক্ষে এবং লাইনে আবদ্ধ ট্রেণের উচ্চশ্রেণীর কামরাগুলির মধ্যে রাত্রিবাস করিয়া থাকে, এ রাত্রিতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কিন্তু জবরদস্ত পুলিস-সুপারের আবির্ভাবে তাহারা উদ্দাম বায়ু তাড়িত তূলার মতই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

সুহাসিনী স্বামীর মুখের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে কহিলেন,—তোমার বন্ধু কিন্তু দিব্যি মজার লোক! তারের জবাবে তাড়াতাড়ি 'তার' করে জানালেন—সব তৈরী থাকবে—ভালো বাসা, রাতের খাবার পর্য্যন্ত। আর গাড়ী নিয়ে তিনি করবেন ষ্টেশনে আমাদের প্রতীক্ষা। আমরা ত এসে পুরোনো হয়ে গেলুম, তাঁর টিকিরও দেখা নেই। পুলিসের লোক কি না, তাই এমন আক্কেল-বিবেচনা!

নিমকের মর্য্যাদা সম্পর্কে পুলিসের এই পদস্থ ব্যক্তিটি এতই সচেতন যে, পুলিস-লাইনের একটা পাহারাওয়ালার উপরেও কেহ কটাক্ষ করিলে বরদাস্ত করিতে পারেন না। পত্নী সুহাসিনী ত একেবারে গোড়া ধরিয়া নাড়া দিলেন। অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবে 'পুলিস' শব্দটার উপরেই শব্দভেদী বাণ মারিলেন। কাজেই পুলিস-বন্ধুর ত্রুটিটুকু ঢাকিতে তাঁহাকে পুলিসের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার আবরণ দিতে হইল। গম্ভীর ভাবেই উত্তর দিলেন,—এমারজেন্সী ঘটনাগুলোও যে সদাসর্ব্বদা পুলিসের পেছনে পেছনে ঘোরে, একথাও ভুলে যেও না; কর্ত্তব্যের কোন সঙ্গীন 'কল্' তাকে হয় ত এমনি সচেতন করেচে—

সুহাসিনী খপ করিয়া স্বামীর কথাটা ধরিয়া বলিলেন,—যার জন্যে ভদ্রতা বোধকে অচেতন করে তিনি কলের পিছনে ছুটেচেন! আর আমরা যে ষ্টেসনের ওয়েটিং রুমে বসে নাকাল হচ্ছি—

কথাটায় বাধা দিয়া জাহ্নবী কহিলেন,—একে নাকাল হওয়া বলে না; বাইরের অবস্থা ত দেখে এলে!

সুহাসিনী—দেখেচি বলেই কথাটা বলিচি। কষ্ট এই জন্যই বেশী হচ্চে। চার দিকে মানুষ থই থই করচে, কতদূর থেকে গাড়ীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা হয়ত এসেচে, ষ্টেসনে নেমে বসবারই একটু জায়গা পাচ্চে না। আর আমরা চারটি প্রাণী এত বড় ঘরখানা দখল করে দিব্যি বসে আছি। তুমি যেটাকে আরাম ভেবে সন্তুষ্ট, আমি সেটাকে অস্বস্তি মনে করে হাঁপিয়ে মরচি।

জাহ্নবী—শাস্ত্রকাররা এই অবস্থাটাকেই বলেচেন—প্রারব্ধ। আসবার সময় ষ্টেসনে ষ্টেসনে দেখেচ ত, প্যাসেঞ্জারদের কি কষ্ট—ভরতি গাড়ীর ভেতর সেঁধুবার জন্যে কি কাণ্ড! একটু দাঁড়াতে পেলেই যেন বর্ত্তে যায়। গুড়ের নাগরির মতন ঠেসে থার্ড ক্লাসগুলো ভর্ত্তি হয়ে এসেচে। আর আমরা দিব্যি আরামে ফার্ষ্ট ক্লাসের চারখানা কুসন চার জনে দখল করে ছিলুম, গায়ে ভীড়ের একটু আঁচও লাগে নি। ষ্টেসনেও সেই দশা, রাতটুকু কাটাতে—ভিখিরীর মত সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে আছে, আর আমরা যেন বসে আছি বৈঠকখানায়!—এইটিই আমাদের প্রারব্ধ। অন্ততঃ তোমার উচিত এসে সন্তুষ্ট হওয়া। আর সন্তুষ্ট ত তুমি বরাবরই ছিলে, পরের কষ্ট দেখে কোনদিন ত এমন করে হাঁপিয়ে ওঠনি!

সুহাসিনী—কোটরের বাইরে ত কোন দিন আননি, কাজেই অন্ধকারে ছিলুম। কোন মেলায় কখন নিয়ে গেছ? বলে—জন্মের মত কর্ম্ম নিয়ম

চৈত্রি মাসে রাস! আমারও হয়েচে তাই। যোগের সময়টাতেই তোমাদের মিটিং বসচে, কদিন থাকতে হবে, আমারও সাধ, যোগে গঙ্গায় একটা ডুব দেব, কাজেই এবার আর না বলতে পারনি, নিয়ে এসেছ সঙ্গে। কিন্তু এখন ভাবচি না এলেই ভাল হত।

জাহ্নবী—কেন বল ত! হঠাৎ এ বৈরাগ্যের কারণ? যাত্রীদের কষ্ট দেখে?

সুহাসিনী—না, পুলিসের কর্ত্তাদের ব্যবস্থা দেখে। পুলিসের কথা উঠলেই কর্ত্তব্যের কথা ত খুব জাঁক করে বল। আচ্ছা, পুলিসের কর্ত্তব্য কি শুধু দোষের পেছনে ছোটা? মিটিং হবে বলে হোম্‌রা-চোম্‌রা কর্ত্তারাও সব এই সহরে জুটেচেন, তুমিও ত এই দলের, কিন্তু হাজার হাজার লোক যে ষ্টেসনে এসে খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুবে মরচে—তার কোন কিনারা পুলিস করেচে?

জাহ্নবী—সর্ব্বনাশ! তুমি যে দেখচি পুলিসের ক্রিটিসাইজ আরম্ভ করলে! কাগজওয়ালারা যদি টের পায় তাহলে তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু খবর আদায় করে ছাড়বে। যাক, এখন মুখ বন্ধ কর—লক্ষ্মীটি! একটা কথা বলে রাখি শোন—পুলিস-স্বামীর সহধর্ম্মিণী যখন হয়েচ, তখন জুলিয়াস সিজারের মত এই ধারণাটাকে মনে বদ্ধমূল করতে হবে—

সুহাসিনী—যে, পুলিস সর্ব্বদাই সন্দেহের অতীত!—এই ত?

জাহ্নবী—বা! সিজারের প্রসঙ্গটাও তাহলে জানা আছে দেখছি। এখন আমার অনুরোধ, পতিব্রতা সাধ্বীর মত স্বামীর মনোবৃত্তিটুকুরই অনুসরণ কর। আমরা যে সাধারণের দলে নেই—মাঝে একটা রীতিমত ব্যবধান আছে—এইটের ওপর লক্ষ্য রেখেই চলতে হবে।

সুহাসিনী—কিন্তু বিবেক যদি এ ব্যবধান মানতে না চায় ?

জাহ্নবী—ছেলে অবাধ্য হ'লে তাকে যেমন শাসন করে শায়েস্তা করা যায়, বিবেককেও তেমনি করে সজুত করতে হবে।

সুহাসিনী—কিন্তু আইন ত এতে সায় দেয় না, তার ব্যবস্থা ত জবরদস্তি নয়।

জাহ্নবী—আইন চলে শক্তের ইসারায়। আইন পুলিশকেও ভয় করে।

সুহাসিনী—আর পুলিস ভয় করে কাকে ? যারা আইনের পাতাগুলো খুলে সাধারণের সামনে তুলে ধরতে চায়, আর জানিয়ে দেয়—পুলিস দেখে ভয় পাবার কিছু নেই, আইন জানা থাকলে আর আইনকে মেনে চললে পুলিসকে তখন প্রভুর আসনে বসাবার দরকার হয় না—তাকে ভৃত্যের সামিল করে আইন দেখিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, যেমন ওদেশের লোকেরা করে।

সহসা সম্মুখে সাপ দেখিলে মানুষ যে-ভাবে শিহরিয়া ওঠে, সেইরূপ একটা বিস্ময়কর ভঙ্গী মুখে ও চোখে প্রকাশ করিয়া জাহ্নবী কহিলেন,—সর্ব্বনাশ! আমার দাদার এই সৃষ্টিছাড়া মতবাদ কে তোমাকে শোনালে ?

স্বামীর প্রশ্ন সুহাসিনীকে ততোধিক চমৎকৃত করিল। দুই চক্ষুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি জাহ্নবীর বিবর্ণ মুখখানির উপর নিবদ্ধ করিয়া তিনি কহিলেন,—তোমার দাদার মতবাদ! এ কথার মানে ?

জাহ্নবী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—পুলিসের সম্বন্ধে এই মতই তিনি প্রচার করে থাকেন, এই জন্যেই তিনি কর্ত্তৃপক্ষের বিষ নজরে পড়ে আছেন, আর দুই ভায়ের মধ্যে এত বড় ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েচে।

সুহাসিনী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন,—কিন্তু তোমাদের কর্ত্তৃপক্ষের মুখেই আমি ঐ মতবাদ শুনেচি—যেটা এইমাত্র

তোমাকে বললুম, আর শুনে তুমি চমকে উঠলে! এই সেদিন কলকেতায় বাংলার পুলিস-বিভাগের বড় কর্ত্তা নিজেই পুলিস আর নাগরিকদের সম্বন্ধ বোঝাতে গিয়ে ঐ কথাই বলেচেন। খবরের কাগজে সেটা ছাপান হয়েচে; কেন, তুমি পড় নি?

বিস্ময়ের স্বরে জাহ্নবী প্রশ্ন করিলেন,—তুমি কি করে পড়লে? খবরটা যে দিনের কাগজে বেরিয়েছিল—

সুহাসিনী মুচকি হাসিয়া কহিলেন,—সে দিনের কাগজগুলো তুমি সব চেপে রেখেছিলে, খবরটা যাতে আমার চোখে না পড়ে। কিন্তু এমনই মজা, তিন চারখানা কাগজের কাটিংস খামে ভ'রে আমার নামে পোষ্ট আফিসের মারফতে এসেছিল, কাটিংসগুলোতে পুলিস-সাহেবের বক্তৃতার সঙ্গে কাগজের সম্পাদকের মন্তব্যও ছিল।

জাহ্নবী—কে পাঠিয়েছিল?

সুহাসিনী—তা কি করে বলবো? ছাপা কাটিংসগুলোই শুধু খামের ভেতরে ছিল, কোন চিঠি ত ছিল না—নাম জানবো কি করে?

মুখখানা গম্ভীর করিয়া জাহ্নবী কহিলেন,—তাহলে নিশ্চয়ই এ কাজ আমার দাদার।

কথাটা যেন সুহাসিনীকে আঘাত দিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে কহিল,—শুনিচি তিনি একজন ভারিক্কী মানুষ, নামী প্রফেসর, তার ওপর কংগ্রেসের লিডার,—তাঁর ওপর এ রকম সন্দেহ করে তুমি ভুল করেচ।

জাহ্নবী স্বরে জোর দিয়া কহিলেন,—দাদা নিজে না পাঠান, তাঁর ঐ গুণ্ডার দলের কেউ এ কাজ করেচে। আমার উপর ওরা বরাবরই চটা।

সুহাসিনীর মুখে বিস্ময়ের রেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল; কহিলেন,—কি বলচ তুমি? নিজের দাদাকে গুণ্ডার দলে ফেলচো, কি ব্যাপার বল ত?

ভাই ভাই ঠাই ঠাই এমন হয়েই থাকে, কিন্তু তোমাদের দু'ভায়ের ভেতরে যে এ রকম মন-কষাকষি তা ত জানতুম না। তাই বুঝি দাদার বাসায় ওঠবার কথা যখন বলেছিলুম, জায়গার অভাব বলে আপত্তি তুলেছিলে? আসল কথা বললেই ত পারতে!

জাহ্নবী—আসল কথাই বলেছিলুম। সত্যিই সেখানে জায়গার অভাব। সহরের যত বাপ মায়ে খেদানো পাজীর দল নিয়েই আমার দাদার কারবার। তারা তাঁর বাসায় পড়ে থাকে, আর মাথায় হাত বুলিয়ে নিজেদের পেট চালায়। সেই যে প্রফেসারী পাওয়া থেকে ঐ কর্ম্মভোগ তাঁর সুরু হয়েছে, তিরিশ বছর ধরে সমান ভাবেই তা চলে আসছে। এক দল বিদেয় নেয় ত, পরের দল আসে, কেউ কেউ আগাগোড়াই আছে।

সুহাসিনী—তোমার বুঝি এ সব ভাল লাগত না, তাই দাদার সম্পর্ক পর্য্যন্ত মুছে ফেলেছ?

জাহ্নবী—এই বোঝ! অথচ বাল্যকাল থেকে কি সম্প্রীতিই আমাদের ছিল! এক দণ্ড আমরা দুটি ভাই ছাড়াছাড়ি থাকতে পারতুম না।

সুহাসিনী—ছাড়াছাড়িটা হল বুঝি যৌবন কালে?

জাহ্নবী—হ্যাঁ; সেটাকে প্রথম যৌবন বলেই ধরে নিতে পারো। আমার বরাবর ইচ্ছা ছিল—দাদা সিভিল লাইনে ঢুকবেন। তাঁর চেহারা ও স্বাস্থ্য বরাবরই খুব ভালো, সুপারিস যোগাড় করে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পোষ্ট পাওয়া শক্ত হবে না। কিন্তু দাদা সে কথা কানে নিলেন না—এম এ পাশ করে যা হয় কিছু করবেন জানালেন। শেষে করলেন কি শুনবে—ফিজিওলজীতে (Physiology) এম এ পাশ করে একবারে প্রফেসর হয়ে পাটনায় ফিরে এলেন। আমি বললুম—'দাদা, এতে কি হবে? পেট ভরবে না যে!' দাদা জবাব দিলেন—'দুটো পেট বইত নয়, খুব চলে যাবে।

আর এ পেশায় মানুষ তৈরী করবার সুবিধে হবে।' আমার মনে জাগলো অভিমান—বড় লোক হবার কল্পনা দাদা সব ভেঙ্গে দিলে। আমারো জিদ হল—দাদার ওপর শোধ নিতে হবে। আমি জানতুম—পুলিস লাইনটার ওপর দাদার ভারি বিরাগ, তাই বি, এ পাশ করেই সঙ্গে সঙ্গে কমপিটিটিভ একজামিনেশন দিয়ে একবারে সাব ইনেস্পেক্টরের পোষ্টে বসে দাদাকে জানালুম—'আমিও চাকরী পেয়েছি দাদা।' তিনি ত শুনেই রেগে অস্থির, বললেন—'আর কাজ পেলিনে, এতে যে মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয়ে যাবে, ভদ্র সমাজে আদর পাবিনে।' জবাব দিলুম—'জব্দ করতে ত পারবো, তাছাড়া এ পেশায় অমানুষগুলোকে দুরস্ত করবারও সুবিধে হবে।'

সুহাসিনী—সেই থেকেই বুঝি দুই ভায়ে ছাড়াছাড়ি ?

জাহ্নবী—মাঝে বার দুই দেখা হয়েছিল। আমি তখনও সাব-ইনেস্পেক্টর, সোনপুর ডিষ্ট্রিক্টের একটা থানার ভার পেয়েছি। কি একটা কাজে পাটনায় আসতে হয়েছিল। কাজেই দাদার খবরটা নেবার জন্যে তাঁর বাসায় গিয়েছিলুম, কিন্তু ঢুকেই যা দেখলুম—আমার চোখ দুটো কপালে ওঠবার জো আর কি !

সুহাসিনী—কি দেখলে ? হাতুড়ি নিয়ে দাদা বুঝি মানুষ পিঠছেন—মনুষ্যত্ব তৈরী করতে !

জাহ্নবী—কতকটা তাই, তবে সেই মনুষ্যত্বটুকু তৈরীর মূলতত্ত্ব হচ্চে ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশরাজত্বের উচ্ছেদ।

সুহাসিনী—বল কি ! তুমি বুঝি গিয়েই সেটা ধরে ফেললে ?

জাহ্নবী—গিয়ে দেখলুম, সে এক বিরাট ব্যাপার, দাদার বাড়ীতে যেন মেলা বসেচে। মস্ত উঠোনটি জুড়ে চলেচে শরীর-চর্চ্চার মহোৎসব। একদল ঘোরাচ্চে লাঠি, একদল খাচ্ছে ডিগবাজি, কোন দল করচে লক্ষাভেদ।

দাদা হচ্ছেন জীবন-বেদের মন্ত ঋষি, তাই বেছে বেছে এমন এক পাল সাকরেদ সৃষ্টি করে তাদের কানে মোহমুক্তির মন্ত্র দিচ্চেন—যাদের রক্তের ভেতর ক্রিমিন্যালিটির বীজানু গিস্ গিস্ করছিল।

সুহাসিনী—দাদা ত আর ভাবেন নি তাঁর দারোগা ভাইটি চোখে মাইক্রসকোপের (microscope) চশমা লাগিয়ে তাঁর মানুষ তৈরীর আখড়া দেখতে আসবেন! যাক্, তারপর কি হল?

জাহ্নবী—দাদাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—'কি হচ্ছে?' দাদা তেমনি হেসে জবাব দিলেন,—'দেখতেই পাচ্ছ, মানুষ তৈরীর কারখানা চলেছে। ছুটির দিনগুলো এই ভাবেই কাটে। বাড়ীর ভেতর যাও, ধীরে-সুস্থে কথা সব হবে।' আগ্রহ হল ভেতরটা দেখবার। গিয়ে দেখলুম—সেখানকার ব্যাপারও সোজা নয়—বাইরের এই বিরাট কারখানায় হাপোর দিচ্ছেন আমার বৌদি নিজে—ঝোড়া ভর্ত্তি ভিজে ছোলা আর ভেলী গুড়ের পাহাড় সাজিয়ে তিনি বসেছেন বাইরের উৎসাহে যোগান দেবার জন্যে। নিবৃত্তি শুধু সেইখানেই নয়, দেখলুম—বড় বড় দুটো হাণ্ডা চড়েচে পাশাপাশি এক জোড়া উনুনে, খিচুড়ী হচ্ছে, মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব্বটাও গুরুগৃহে চলবে, এ সব তারই আয়োজন। বৌদিকে বললুম—'এসব উপদ্রব তুমিও ত দিব্যি মুখ বুজিয়ে সহ্য করচ বৌদি!' এক মুখ হেসে বৌদি জবাব দিলেন—'একে উপদ্রব বলে ত মনে করিনি কোন দিন, এ যে আমাদের উৎসব, নৈলে একলা মানুষ এমন করে খাটতে পারি। এর ওপর আপনার লোক, জন এলে কি আনন্দ যে হয় সে কথা মুখে আর কি বলব!' বুঝলুম, এরা ক্ষেপে গেছে, নিজেদের ছোট সংসারটির পরিসর পাগলামীর ঝোঁকে এমনই বৃহত্তর করে তুলেছে যে, রীতিমত একটা বাধা না পাওয়া পর্য্যন্ত নিরস্ত হবে না।

সুহাসিনী—তুমি বুঝি সেই বাধাটি তৈরী করে দিলে ?

জাহ্নবী কথাটার উত্তর দিলেন না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা কহিলেন,—কিন্তু দাদার সে পাগলামী বন্ধ হয় নি।

সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেখা এর পর হয়েছিল আর ?

জাহ্নবী—দাদার এক খানা চিঠি পেয়ে আর একবার তাঁর বাসায় ঢুকেছিলুম। দাদা লিখেছিলেন—'তোমার বৌদি নিষ্ঠুরের মত তাঁর সাজানো সংসারটি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে পালিয়ে গেছেন। আমি যদিও সামলেছি, কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে ভারি মুস্কিলে পড়েছি। শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে তোমার বৌদি তোমার আর দুর্গার নাম দু তিন বার করেছিল, কেন কে জানে। পার ত একবার এসে দুর্গাকে দেখে যেও।' এ অবস্থায় যেতেই হল। কিন্তু গিয়ে কোন পরিবর্ত্তনই দেখলুম না, বৌদি নেই, আর সব ঠিক আছে এবং কলের মতই চলছে। ফুলের মত ফুটফুটে মেয়েটি কাকাবাবু ব'লে আমার কোলে যখন ঝাঁপিয়ে পড়লো, বৌদির মুখখানা অমনি ঝাঁ করে মনে পড়ে গেল। কিন্তু তার পরেই সারা মন বিষিয়ে উঠলো—যখন দেখলুম ভূতভোজের বিরাট পর্ব্ব সমান ভাবেই চলেছে, আর একটা মার্কামারা দাগী ছোক্‌রা সেগুলোর বিলি ব্যবস্থা করছে। একটা স্বদেশী মামলার সংস্রবে সে জেলে যায়, সে মামলা আমাকেই চালাতে হয়। মুক্তি পেয়েই সে দাদার টোলে ভর্ত্তি হয়েছে, আমাকে দেখেই মুচকি হেসে যখন সে হাত দুখানা কপালে ঠেকালো, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না। মেয়েটাকে জোর ক'রে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বাইরে ছুটে গেলুম দাদার কাছে, জিজ্ঞাসা করলুম,—'এখনো কি তোমার এই সব পাগলামী চলবে ? মেয়েটার মুখের পানে চেয়েও জীবনের গতি ফেরাবে না ?' দাদা তেমনি হেসে উত্তর দিলেন,—'আমার

জীবনের গতি একটি রাস্তা ধরেই চলেছে, অন্য রাস্তা ত খুঁজি নি, আর তার ইচ্ছাও নেই।' মনের রাগ মনেই চেপে ফের জিজ্ঞাসা করলুম,—'দেশের এই জঞ্জালগুলোকে সাথী করেই কি তোমার জীবন সার্থক করতে চাও?' দাদা উত্তর দিলেন,—'তুমি ঠিক ধরেচ, এতেই আমার জীবনের সার্থকতা, জঞ্জাল দেখলেই তোমরা আঁতকে ওঠ, পাছে সংক্রামক কোন ব্যাধির বীজানু নাকে ঢোকে, আর আমি বুক ঠুকে সাফ করতে লেগে যাই—যদি কোন দুর্লভ রত্ন তার ভেতর থেকে বেরোয় এই আশায়।' এর পর সেই যে চলে আসি, তার পর আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

সুহাসিনী—খোঁজ খবরও কিছু নাও নি?

জাহ্নবী—না। আমরা যে-রাস্তা বন্ধ করতে চাই, দাদা যে সে রাস্তা খুলে রাখতে চান। কাজেই সম্পর্ক কাটাতেই হয়েচে।

সুহাসিনী—তোমার দাদা কি ফের বে করেচেন?

জাহ্নবী—তাহলে ত খুসী হতুম। সে পাত্রই তিনি নন।

সুহাসিনী—মেয়ের বে দিয়েছেন? নিশ্চয় তার বিয়ের বয়েস পার হয়ে গেছে।

জাহ্নবী—তা হয়েছে বই কি। শেষ ছাড়াছাড়ির পর আমাদের বিবাহ হয়। দুর্গা তখন বছর সাতেকের মেয়ে। সেও ত প্রায় এগারো বছর হতে চলল। এখন তার বয়েস আঠারো উনিশ হবে বৈকি। তবে বিয়ে বোধ হয় হয়নি—তাহলে চিঠি অন্তত একখানা নিশ্চয়ই পেতুম।

সুহাসিনী—আমার কিন্তু একবার দেখতে ইচ্ছে করে। পাটনায় যখন আসা হল, তোমার দাদার বাসাটাও—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সুহাসিনী সহসা থামিলেন এবং মনে মনে কি ঠিক করিয়া পুনরায় কহিলেন,—'আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না?'

জাহ্নবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পত্নীর মুখভঙ্গী লক্ষ্য করিতেছিলেন। দৃষ্টিটা সেই ভাবে নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিলেন,—না, সে কাজটা করা হবে না।

—তুমি যে দেখছি গাছে না উঠেই কাঁধি কাটবার যো করলে! কথাটা আগে শোন।

—সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে যে! বলবার আগেই তোমার ইচ্ছাটা ধরা দিয়েছে। আমার বন্ধুর যখন পাত্তা নেই, তখন আর ওয়েটিংরুমে তার প্রতীক্ষা না করে লটবহর নিয়ে দাদার বাসায় গিয়ে উঠি—এই কাজটুকু করবার কথাই ত বলতে চাইছিলে?

সুহাসিনী মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—কাজটা কি এতই খারাপ? গেলে কি সত্য সত্যই তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, না তোমার মুরুব্বীরা বেজার হবে?

জাহ্নবী কহিলেন,—হয়ত কিচ্ছু হবে না, কিন্তু দাদার বাসায় আমাদের ওঠাও হবে না। জানি, তিনি আমাদের পেলে হাতে হয়ত স্বর্গ পাবেন, কিন্তু তবু তাঁর বাড়ীর দরজা আমার কাছে বন্ধ। যে জঞ্জাল তিনি জড় করতে ব্যস্ত, তাই জ্বালিয়ে দেওয়াই আমার ব্রত। এই আমার কর্ত্তব্য—ডিউটি; এর কাছে শুধু দাদা কেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা—সবই তুচ্ছ।

ওয়েটিং রুমের বড় ঘড়িতে এই সময় ঢং করিয়া একটা বাজিল। সঙ্গে সঙ্গে জাহ্নবী বলিয়া উঠিলেন,—'তাই ত, একটা বাজলো যে! আচ্ছা—আমি একবার খোঁজ করে দেখি কি হল! আমারই ভুল হয়ে গেছে, এসেই রামসদয়কে টেলিফোন করলে আর এ ভোগান্তি হত না।' বলিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সুহাসিনী চুপ করিয়া রহিলেন, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বামীর আগেকার কথাগুলি তাঁহার অভিমানক্ষুব্ধ অন্তরে কাঁটার মত ফুটিয়া তখনও খচ্ খচ করিতেছিল।

—দুই—

আর একখানি সুদীর্ঘ ট্রেণ বিপুল যাত্রীসম্ভারে পরিপূর্ণ অবস্থায় পাটনা জংশন ষ্টেসনের প্লাটফরমে যখন ভিড়িল, তখন ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় একটা বাজিয়াছে। সাড়ে বারোটার সময় এই ট্রেণখানির ষ্টেসনে আসিবার কথা, কিন্তু পথে প্রত্যেক ষ্টেসনে যাত্রীদের প্রাচুর্য্যে আধ ঘণ্টা বিলম্বে আসিয়া পঁহুছাইয়াছে। হিন্দু-মহাসভার একদল তরুণ স্বেচ্ছাসেবক এই ট্রেণের কোন বিশিষ্ট যাত্রীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্লাটফরমে প্রতীক্ষা করিতেছিল। ট্রেণখানি থামিবামাত্রই তাহার কামরাগুলির ভিতর দিয়া যে জনপ্রবাহ বাহির হইয়া সমস্ত প্লাটফরম ভরাইয়া ফেলিল তাহার ভিতর হইতে বাঞ্ছিত মানুষটিকে বাহির করিতে শ্রম-সহিষ্ণু এই স্বেচ্ছাসেবক-দলটিকেও হীমসীম খাইতে হইল। অনেক খোঁজাখুজির পর তৃতীয় শ্রেণীর একখানা সুবৃহৎ বগি-কামরার ভিতর হইতে যখন তাঁহাকে আবিষ্কার করা গেল, তখন আর তাঁহার উঠিবার সামর্থ্য ছিল না, ভীড়ের অতিরিক্ত চাপে এবং কোন সহযাত্রীর গুরুভার লগেজের নীচে পড়িয়া তিনি লগেজের অবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ষ্ট্রেচারে তুলিয়া প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য স্বেচ্ছাসেবকরা উচ্চশ্রেণীর বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশে লইয়া চলিল, একজন ডাক্তার আনিতে ছুটিল।

আগেই বলা হইয়াছে, উচ্চশ্রেণীর বিশ্রামকক্ষের দ্বারদেশে একখানা খুরসী লাগাইয়া পুলিস-সুপারের তকমাধারী জবরদস্ত আরদালী মিশিরজী বসিয়াছিল। আগন্তুক দলটিকে এই কামরার উদ্দেশে আসিতে দেখিয়া সে

সবেগে উঠিয়া ও রীতিমত হুমকী দিয়া বাধা দিল, এমন কি ষ্ট্রেচারে শায়িত রোগীটিকে পর্য্যন্ত মিলিটারী মেজাজে রুখিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই দলের অগ্রবর্ত্তী যুবকটি টু শব্দটি না করিয়া মিশিরজীকে এমন কায়দায় একটা ঝাঁকুনি দিল যে, সে দ্বারপথ ছাড়িয়া পাশের লগেজগুলার উপর চীৎপাত হইয়া শুইয়া পড়িল।

ঘরের ভিতরে সুহাসিনী এই সময় তাঁহার নিদ্রিত পুত্রকন্যার গায়ের উপর এক একখানা চাদরের আবরণ দিতেছিলেন। হঠাৎ এতগুলি লোককে এক সঙ্গে এই ভাবে কক্ষ মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। ষ্ট্রেচারে শায়িত মুমূর্ষুপ্রায় ব্যক্তিকে লইয়া তাঁহাদের বিশ্রামকক্ষে এই ছেলের দলটিকে দেখিয়াই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অসহায় জনসাধারণের প্রতি তাঁহার অন্তর্নিহিত সহানুভূতি কোথায় উবিয়া গেল! আরাম কেদারার পীঠে পীঠ দিয়া দাঁড়াইয়া তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—এ-ঘরে ওকে আনলেন কেন?

যে ছেলেটি দলের আগেই ছিল এবং যাহার কব্জির জোরে মিশিরজী দ্বার ছাড়িয়া লগেজশায়ী হইয়াছিল, তাহার নাম প্রতাপ দত্ত। এই স্বেচ্ছাসেবক দলটির সে নেতা, চেহারাটি তাহার এমনই চমৎকার ও প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এমনই সুদৃঢ় ও সুগঠিত যে, হাজার লোকের ভিতর মিশিয়া থাকিলেও তাহাকে চিনিয়া বাহির করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হইবার উপায় নাই।

সুহাসিনী ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রশ্নটা করিয়াছিলেন। উত্তরে প্রতাপ শুধু সংক্ষেপে কহিল,—প্রয়োজন হয়েছে—সেই জন্য।

উত্তরটা দিয়াই সে ক্ষিপ্রপদে সুহাসিনীর প্রায় সম্মুখে আসিয়া কহিল,—'মাপ করবেন, এই চেয়ারখানা আমাকে নিতে হচ্ছে।' বলেই সে পাশের আরাম কেদারাখানির দিকে ঝুঁকিল। এই চেয়ারেই জাহ্নবী মিত্র

বসিয়াছিলেন এবং চেয়ারের উপর তাঁহারই পরিত্যক্ত টাইমটেবল খানা পড়িয়াছিল। প্রতাপ সেখানা তুলিয়া যে চেয়ারখানা অবলম্বন করিয়া সুহাসিনী দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার উপরে রাখিবার উদ্দেশ্যেই নিক্ষেপ করিল, কিন্তু বেগে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সেখানা গড়াইয়া নিচে পড়িয়া গেল। 'দয়া করে ওখানা তুলে নেবেন' এই কয়টি কথা বলিয়াই প্রতাপ অত বড় ইজি-চেয়ারখানা অনায়াসে তুলিয়া—যেখানে তাহার সঙ্গীরা ষ্ট্রেচারটি লইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানে রাখিয়া কহিল,—'তোমরা ষ্ট্রেচারখানা ভাল করে ধরে থাক, আমিই ওঁকে এর ওপর শুইয়ে দিচ্ছি।' বলেই সে ষ্ট্রেচারে হাত লাগাইল।

অন্য সময় হইলে এই অতিশয় তৎপর ও অসাধারণ শক্তিমান ছেলেটিকে সুহাসিনী সপ্রশংস দৃষ্টিতেই দেখিতেন, কিন্তু একটা মরণাপন্ন রোগীকে লইয়া ইহাদের এই কক্ষে প্রবেশ এবং তাঁহার মত অভিজাত মহিলার সমক্ষে এই ছেলেটির অবিনয় আচরণে ঔদ্ধত্যের আভাষ পাইয়া এই দলটিকে তিনি আসামীদের পর্য্যায়েই ফেলিয়াছিলেন। যে নারী অৰ্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে এই কক্ষে বসিয়াই জনসাধারণের স্বার্থ ও সুবিধা সম্পর্কে পুলিসের ঔদাসীন্যে কটাক্ষ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার মনেই এই আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইয়া উঠিতেছিল যে, ঐ ছেলেটির মত তাঁহার দেহে যদি অসাধারণ শক্তি থাকিত, জনসাধারণের অন্তর্গত এই দলটিকে তিনি রীতিমত চাবকাইয়া এই ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতেন। রুদ্ধ রোষে দাঁতে ঠোঁটটি চাপিয়া তিনি শুধু অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে এই অশান্ত ছেলেটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

একটু পরেই যন্ত্রপাতি লইয়া ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোগীর হার্ট দেখিয়া বলিলেন,—'ভয় নেই, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সুস্থ হবেন। ভীড়ের চাপেই এ রকম হয়েছে।'

তাঁহার নির্দ্দেশ মত রোগীর মাথায় আইস-ব্যাগ চাপানো হইল। ঔষধের একটা প্রেসক্রিপসান তিনি লিখিয়া দিলেন, এক জন স্বেচ্ছাসেবক তৎক্ষণাৎ সেটি লইয়া ছুটিল। ডাক্তার জানাইলেন,—একটা ইনজেক্‌সন্ দিতে হবে। ইহার সাজ-সরঞ্জাম তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহার আয়োজন চলিল।

প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিল,—এ অবস্থায় এঁকে হাসপাতালে বা বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া কি আপনি সঙ্গত মনে করেন ডাক্তারবাবু?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ডাক্তার উত্তর দিলেন,—নিশ্চয়ই না। সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত এইভাবেই এঁকে রাখতে হবে।

অতঃপর ডাক্তার যখন সংজ্ঞাহীন শায়িত মানুষটির অঙ্গে ইনজেক্‌সনের সিরিঞ্জটি সবেমাত্র বিদ্ধ করিয়াছেন, সেই সময় জাহ্নবী মিত্র সবেগে ও সশব্দে ওয়েটিংরুমের স্প্রীংয়ে আবদ্ধ দরজাটি ঠেলিয়া আরদালীর সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং সপদদাপে তর্জ্জনের সুরে কহিলেন,—Who are the devils gathered here?

কাছেই ছিল প্রতাপ, সে জাহ্নবীর মুখের উপর তর্জ্জনীটি তুলিয়া কহিল,—থামুন। দেখতে পাচ্ছেন না—চিকিৎসা চলেছে? উনি হচ্ছেন ডাক্তার, যিনি শুয়ে আছেন রোগী, আর আমরা হচ্ছি ভলনটিয়ার। এর মধ্যে 'ডেভিল' আপনি কাকে বলতে চান?

মিশিরজী এই সময় তাহার নিগ্রহকারী বলিয়া প্রতাপকে সনক্ত করিল। জাহ্নবী রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—তুমি আমার আর্দ্দালীকে মেরেছ?

প্রতাপ উত্তর দিল,—মারি নি। পুলিসের তকমা পরেও এই লোকটা অজ্ঞের মত ব্যবহার করেছিল—

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জাহ্নবী কহিলেন,—অজ্ঞের মত ব্যবহার করেছিল মানে ?

দিব্য সহজকণ্ঠে প্রতাপ কহিল,—মানে এই—ও ভুলে গিয়েছিল যে, সাধারণের ওপর প্রভুত্ব করবার জন্য সরকার ওকে বাহাল করেন নি, পারিপার্শ্বিক শান্তি রক্ষা ও সাধারণের অসুবিধা দূর করবার জন্যই ঐ তকমা ও পেয়েছে। কিন্তু ওর ব্যবহারে আমাদের অসুবিধা আরও বেড়ে ওঠে বলেই নিজেরাই সুবিধাটুকু করে নিয়েছি। এটাকে অন্যায় বলতে চান ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই নির্ভীক ছেলেটির পানে চাহিয়া জাহ্নবী কহিলেন,—পুলিস-কোর্টের কাঠগড়ায় ঢুকে সেটা অনুভব করবে। কার হুকুমে তোমরা রোগীকে নিয়ে হায়ার-ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের ওয়েটিং রুমে ঢুকেছ ? এ-ক্লাসের টিকিট আছে তোমাদের কাছে ?

প্রতাপ বিদ্রূপের সুরে কহিল,—সে কৈফিয়ৎ আপনাকে নাই বা দিলুম, আপনিও ত আমাদের মত প্যাসেঞ্জার, আপনার টিকিট আছে ?

সবেগে কক্ষতলে পায়ের বুট-জুতাটি ঠুকিয়া জাহ্নবী কহিলেন,—আমি তোমাকে হাজতে পুরবো, কি নাম তোমার ছোকরা ?

প্রতাপ মৃদু হাসিয়া কহিল,—লিখে নিন নাম ঠিকানা—প্রতাপ দত্ত, কেয়ার অফ্ প্রফেসর যদুপতি মিত্র, গুলজারবাগ, মিত্র-নিবাস।

জাহ্নবীর মুখের ক্রোধ-রেখা বিস্ময়ে পরিণত হইল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তাহার পর শ্লেষের সুরে কহিলেন,—হুঁ—Coming events cast their shadows before—কথার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—বোকা মিত্রের এরাই হচ্ছে ভেতুড়ে দল !

কিন্তু ইহাতেও ছেলেটি চটিল না, দিব্য হাসিয়া কহিল,—আপনি তাহলে তাঁর খবরও রাখেন দেখছি। সত্যিই তিনি ভাত ছড়াতে জানেন, তাই

কাকের অভাব হয় না। তবে তিনি বোকা কি সেয়না—সে বিচার এ পর্যন্ত করবার ফুরসদই আমরা পাই নি।

জাহ্নবী এবার মুখখানা শক্ত করিয়া কহিলেন,—তুমি জান আমি কে ?

তেমনই হাসিমুখে প্রতাপ উত্তর দিল,—মাপ করবেন, যেটুকু জেনেছি, তাই যথেষ্ট।

গম্ভীরমুখে জাহ্নবী জানিতে চাহিলেন,—কি জেনেছ ?

প্রতাপ এবার কণ্ঠস্বর একটু দৃঢ় করিয়া কহিল,—জেনেছি যে, গায়ের চামড়াটা আপনার মানুষের হলেও, ওর ভেতরটায় মনুষ্যত্ব কিছু নেই, সেখানে—

কথাটা শেষ করিবার অবসর না দিয়াই জাহ্নবী ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—তোমার গায়ের ঐ ছালখানাও আমি একদিন ছাড়িয়ে নিয়ে এর জবাব দেব—রাস্কেল ব্রুট।

প্রতাপ সংযতকণ্ঠে কহিল,—আমাদের গুরুর শিক্ষা—সমবয়স্কের সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান দেওয়া। কাজেই আমরা চেপেই যাচ্ছি। তবে চোখগুলো আমার চক চক করছে—গায়ের ছাল ছাড়াবার ছুরিখানা দেখতে। আপাততঃ আমাদের মিনতি, চুপটি করে বসে থাকুন—শান্তি ভঙ্গ করবেন না।

এই সময় ডাক্তার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—অলরাইট ! রোগী চাঙ্গা হয়েচে, আর ভয় নেই।

যে লোকটি প্রেসক্রিপসন লইয়া গিয়াছিল, কাগজে মোড়া একটা শিশি লইয়া এই সময় সে উপস্থিত হইল। ডাক্তার তাড়াতাড়ি শিশিটি তাহার হাত হইতে লইয়া কহিলেন,—গ্লাস একটা পাওয়া যাবে না ?

ঘরের দেওয়ালটির ধারে কালো রঙের একটি সোরাই পালিস করা সুদৃশ্য একখানি কাঠের আধারে রাখা ছিল। তাহার উপরে ঢাকনীর মত রূপার গ্লাসটির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই প্রতাপ ক্ষিপ্রপদে গিয়া গ্লাসটি তুলিয়া আনিল।

সুহাসিনী স্বামীর দিকে চাহিয়া অপ্রসন্ন ভঙ্গীতে কহিলেন,—গ্লাসটা আমাদের।

প্রতাপ তখন গ্লাসটি ডাক্তারের হাতে দিয়াছে এবং ডাক্তার শিশিটা নাড়িয়া তাহাতে ঔষধ ঢালিতেছিলেন। গ্লাসের অধিকারিণীর প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই সে উত্তর দিল,—আমাদেরই বা আপনি পর ভাবছেন কেন? আপনার ঘরের ছেলে না হলেও আমরা ত আপনার দেশের ছেলে। ওঁর ওষুধটুকু খাওয়া হয়ে গেলে আমরা ধুয়ে মেজেই ওটি ফিরিয়ে দেব, নিয়ে যাব না।

রোগীকে ঔষধ পান করাইয়া ডাক্তার কহিলেন,—আইস ব্যাগ চালাবার আর দরকার নেই, দুঘণ্টা পরে ওষুধটা আর একবার খাওয়াবে। সকাল পর্য্যন্ত এইভাবেই ইনি এইখানে থাকবেন। ভোর পাঁচটার সময় আমি আবার আসবো।

কথাগুলি বলিয়াই ডাক্তার দ্বারের দিকে যাহিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ ফিরিয়া জাহ্নবীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"দেখুন, আমার একটা বদ অভ্যেস, কোন কাজে যখন লিপ্ত থাকি, মনটাও সেই সঙ্গে এমনি জড়িয়ে যায় যে, খুব কাছের কোন গুরুতর ব্যাপারও জানতে পারি না। এখানকার ব্যাপারে আর আপনার ব্যবহারে এইটুকু বুঝতে পেরেছি—আপনি পুলিস-বিভাগের কোন হোমরাচোমরা অফিসার, ষ্টেশনের এই ওয়েটিং রুমটা হাসপাতাল হওয়ায় অবশ্যই অত্যন্ত বেজার হয়েছেন। কিন্তু ঠিক এই

রকমের আর একটা ঘটনার কথা আপনাকে না শুনিয়ে পারচি না। লাটসাহেবের স্পেস্যাল ট্রেণ ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে, তিনি সফরে বেরুবেন। এই ঘরখানাতেই তাঁর বৈঠক বসেছে, তিনি নিজেই তখন অসুস্থ, কিন্তু সেই অবস্থাতেই তাঁকে বেরুতে হয়েছিল। বিহার সার্কেলের জনকতক বড়লোকের সঙ্গে এইখানেই দেখা সাক্ষাৎ করবার ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। সঙ্গে তিনজন বড় ডাক্তার, একজন ইংরেজ, দুজন বাঙ্গালী। মিটিং ভাঙ্গবার একটু আগে ষ্টেশনে হ'ল একটা য়্যাকসিডেণ্ট। খবরটা লাটের কানে উঠতেই তিনি তখনি মিটিং শেষ করে সেই আহত লোকটাকে আনিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তাঁর ডাক্তারদের হুকুম দিলেন। সেই তিন ডাক্তারের মধ্যে এই অধমও ছিল। আমার বেশ মনে আছে, লাট সাহেব নিজে সেই রোগীর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তার তদ্বির করেছিলেন, পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন—'ভয় ক'র না, নিশ্চয়ই তুমি সেরে উঠবে।' আমাদের এই রোগীর সম্বন্ধে এই নজীরটুকুই কি যথেষ্ট নয়?" বলিয়াই তিনি দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন, জনৈক স্বেচ্ছাসেবক তাঁহার ব্যাগটী লইয়া পিছু পিছু ছুটিল।

পরক্ষণেই কোর্ট-ইনেসপেক্টর রামসদয় বাবু ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং এক নজরে ঘরের মানুষগুলিকে দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিলেন,—ব্যাপার কি!

জাহ্নবী মিত্রও রুদ্ধরোষে পরবর্ত্তী কর্ত্তব্যের কথা ভাবিতেছিলেন, বন্ধুকে দেখিয়া মুখখানা মচকাইয়া কহিলেন,—বেশ, যা হোক!

রামসদয় বাবু কহিলেন,—'ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ভাই, বেয়ারা বেটা ঠিক সময়ে ডেকে দেয় নি, সোফরটাও ভুলে গিয়েছিল গাড়ী বের করবার কথা। আচ্ছা করে দুটোকে চাবকে দিয়েছি। কি রকম উদ্বেগ নিয়ে যে পথটা

এসেছি তা আর মুখে বলবার নয়,—কত কষ্টই পেয়েছ! কিন্তু এখানে এ সব কি ব্যাপার?' বলিয়াই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তরুণ দলটির উপর দিয়া ঘুরাইয়া জাহ্নবী মিত্রের মুখের উপর নিবদ্ধ করিলেন।

প্রতাপকে দেখাইয়া জাহ্নবী প্রশ্ন করিলেন,—এই ছোকরাকে তুমি চেন?

রামসদয়বাবু ঘাড়টা দুলাইয়া উত্তর দিলেন,—শুধু এ ছোকরা কেন, আমাদের ব্ল্যাক-বুকের পাতায় পুরো ব্যাচটির নামই যে টোকা আছে। কিন্তু ব্যাপারখানা কি হে? ইজি-চেয়ারে শুয়ে ও লোকটা কে? ওকে ত চিনি না—

প্রতাপ কহিল,—আপনার সেরেস্তার ব্ল্যাক-বুকের পুরোনো পাতগুলো ভাল করে খুঁজে দেখবেন, এঁর নামও তাতে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন। ইনি হচ্ছেন বলাই পণ্ডিত। সোনপুরের মেলায় বক্তৃতা দেবার জন্যে কলকেতা থেকে আসছিলেন, ট্রেণে ফেন্ট হয়ে পড়েন।

বলাই পণ্ডিতের নামটি পুলিসের দুই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অফিসারকে যেন সচকিত করিয়া দিল। যে কয়জন বাঙ্গালী হিন্দীভাষায় অতি সুন্দর ভাবে অনর্গল বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত এবং হিন্দীভাষাভাষী জনসাধারণের মধ্যে যাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অসামান্য, বলাই পণ্ডিত তাঁহাদেরই অন্যতম। বাঙ্গালী-প্রবর্ত্তিত স্বদেশী আন্দোলনের প্রবাহে যে সময় বিহার প্রদেশে প্রথম অভিষিক্ত হয়, সে সময় বলাই পণ্ডিতের বক্তৃতা বিহারবাসীকে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল। বলাই পণ্ডিত প্রথম হইতেই সেই-যে দেশগুরু সুরেন্দ্রনাথের আদর্শে জন-জাগরণ-কল্পে আত্মনিয়োগ করেন এ পর্য্যন্ত এক ভাবে তাহাতেই অবহিত আছেন। গান্ধীজীর সকল আদর্শ তিনি অন্ধভাবে গ্রহণও করেন নাই এবং নীরবে মাথা পাতিয়া তাঁহার সৃষ্টি ছাড়া বিবৃতি ও ব্যাখ্যা হজম করিতেও পারেন নাই। বরং গান্ধীজীর পরিকল্পিত ভারত-

উদ্ধারের থিওরীগুলি যে ভূয়া, বলাই পণ্ডিত তাহাই প্রতিপন্ন করিতে কোমর বাঁধিয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহাকে গান্ধীর চেলাদের নিকট অল্প নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় নাই। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করেন নাই। এমন কি, বিহারের প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের খবর পাইয়া গান্ধীজী যখন ঐ ভয়াবহ ঘটনাটিকে অস্পৃশ্যদের প্রতি অবিচারের প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ পাপের ফল বলিয়া নির্লিপ্ত থাকেন, বলাই পণ্ডিত তখন শত শত স্বেচ্ছাসেবক লইয়া বিহারের দুর্গত অঞ্চলগুলিতে প্রাণশক্তি যোগাইতেছিলেন। তাঁহার আহ্বানে সমগ্র বাঙ্গলাদেশ চঞ্চল হইয়া অকাতরে বিহারের উদ্দেশ্যে ভারে ভারে অর্থ, বস্ত্র, ঔষধ, পথ্য ও পণ্যাদি পাঠাইয়াছিল। এই ঘটনার পর বলাই পণ্ডিত পুনরায় বিহারবাসী জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসেন। ইতিমধ্যে গান্ধী পরিচালিত আন্দোলনে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার জন্য ভুলের পর ভুলে যখন ভাঙ্গন ধরিল এবং হিন্দুসভার অভ্যুদয় হইল, তখন গান্ধীজীর অন্ধ অনুসরণকারীরা সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, একটা মানুষের ব্যক্তিগত খেয়াল দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তখন হইল তাঁহাদের চৈতন্য, বুঝিলেন, গুরুবাদের মোহে আধ্যাত্মিক মন্ত্র-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া দেশের কি সর্ব্বনাশ তাঁহারা করিয়াছেন! হিন্দু সভাও এই সময় বজ্রকণ্ঠে জানাইয়া দিলেন—'ফলে, হিন্দুস্থানের হিন্দুদেরই হইয়াছে সর্ব্বনাশ। হিন্দু-পরিচালিত স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত হইয়া যায়, মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার হয়, হিন্দু নেতা সত্যেন্দ্র প্রসাদ সিংহ লর্ড হন, সহকারী ভারত-সচিবের পদ পান, পরে বিহারের গবর্ণর হইয়া আসেন; বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, প্রভাবে, প্রতিপত্তিতে হিন্দুরাই তখন অগ্রণী—সকল ব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা; অথচ, সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধও তাঁহাদের মধ্যে ছিল না, হিন্দুদের তখন গৌরব কত! আর এখন? ভস্মে ঘৃতাহুতির

মত সে সমস্তই পণ্ড হইয়া গিয়াছে। সে যুগের দূরদর্শী রাজনীতিক নেতারা যে বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অদূরদর্শী নেতার খেয়ালে তাহা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। একটা লোকের হঠকারিতা হিন্দুর অবস্থা এমনই সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে যে, Communal Award সংবলিত White paperএর ভিত্তিতে গঠিত নূতন শাসনবিধির জাঁতায় জাতীয়তাবাদী হিন্দু একেবারে নিষ্পেষিত হইবার যো হইয়াছে। এখন হিন্দুকে ঐ ভাববিলাসী খেয়ালীর মোহ কাটাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে,—হিন্দু হিন্দুকে না রাখিলে কে রাখিবে?'—সত্যকথা বলিতে কি, কথাগুলি বলাই পণ্ডিতের যেন মর্ম্মবাণী। এই বাণীর প্রচারে ইনি এখন তরুণের উৎসাহে ব্রতী হইয়াছেন। হরিহরছত্রের মেলায় বহুলক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে বলিয়া প্রকাশ। সেই মেলায় জনসাধারণকে সত্যের সন্ধান দিবার জন্য ইনি আহূত হন। বিরাশী বৎসর বয়সে এই আহ্বানে সাড়া দিয়া ইনি পুনরায় বিহারে আসিয়াছেন। বলাই পণ্ডিত মহাশয়ের ইহাই মোটামুটি পরিচয়।

বলাই পণ্ডিতের পরিচয় পুলিসের দুই পদস্থ কর্ম্মচারীর বিস্ময়ভঙ্গ করিতে না করিতে ওয়েটিংরুমের দরোজা দিয়া নূতন যে দুইটি প্রাণীর আবির্ভাব হইল, তাহাদিগকে দেখিয়া জাহ্নবী মিত্রের মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

আগন্তুককে দেখিয়া ছেলেরা সসম্ভ্রমে মাথা নত করিয়া সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইল। রামসদয় বাবুকেও এই সৌম্যমূর্ত্তি শ্রদ্ধাভাজন মানুষটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে হইল,—এই যে প্রফেসর মিত্র, আপনিও এত রাত্রে এখানে! ব্যাপার কি?

ইনিই অধ্যাপক যদুপতি মিত্র, জাহ্নবী মিত্রের জ্যেষ্ঠ; আর ইঁহার সঙ্গে যে মেয়েটি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার উজ্জ্বল রূপের প্রভায়

অসামান্য রূপসী সুহাসিনীকে পর্য্যন্ত চমকিত করিয়া দেয়, তাহার নাম দুর্গা, অধ্যাপক মিত্রের কন্যা। জাহ্নবী মিত্র কথাপ্রসঙ্গে ইঁহাদের কথাই পত্নীকে শুনাইয়াছিলেন।

অধ্যাপক মিত্র বলিলেন,—আমার আসায় আশ্চর্য্য হবার ত কিছু নেই, ছেলেরা পণ্ডিত মশাইকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিল, দেরী দেখে আমরাও ছটফট করছিলুম, তারপর দুর্ঘটনার কথা শুনেই ছুটে এসেছি। কিন্তু আপনি এখানে কেন বলুন ত? বাইরে দেখলুম এক জোড়া লাল পাগড়ী, এখানেও এক আরদালী—ব্যাপার কি? কিন্তু খবর যেটুকু পেয়েছি, তাতে পুলিস-চালানী-গোছের কেস ত নয়!

উত্তরের কোন প্রতীক্ষা না করিয়াই তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের চেয়ার খানার পার্শ্বে গিয়া তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন,—এই যে চেয়েছেন দেখছি! বা! চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে—গ্লানি কেটে গেছে।

প্রতাপ মৃদুস্বরে বলিল,—জ্ঞান অনেক আগেই হয়েছে, তবে আমরা ওঁকে কথা কইতে দিই নি।

যদুপতি কহিলেন,—আরে, করেছ কি! বক্তাকে বোবা করে রাখা যে মহা শাস্তি। না-না, আপনি মুখ খুলুন পণ্ডিত মশাই, আমাকে চিনতে পেরেছেন ত?

দুই চক্ষু ভাল করিয়া খুলিয়া পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—যদু?

স্বর মৃদু হইলেও, মনে হইল যেন শাঁকের মুখ দিয়া ধ্বনি ফুটিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ আমি,—দুর্গাও এসেছে; ঐ যে চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

দুর্গা কক্ষে ঢুকিয়াই স্থানটি বাছিয়া লইয়া রোগীর শুশ্রূষায় হাত

লাগাইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—দেখতে না পেলেও অমৃতের পরশ পেয়েছি।

দুর্গা এই সময় ঘুরিয়া চেয়ারের হাতলটির কাছে আসিয়া কহিল,—অত ভীড়ের ভেতরে এসেই ত এই বিপদ ঘটালেন! সেকেণ্ড ক্লাসে এলে ত এ ভোগান্তি হত না দাদু!

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—অভ্যেস যে ছাড়তে পারিনি দিদি, এমনত আর কখনো হয় নি। তোমাদেরই ভোগান্তি।

দুর্গা কহিল,—ভোগান্তির চেয়ে ভাবনাই হয়েছিল বেশী! খবরটা প্রথম যেই শুনলুম, আমারই মূর্চ্ছা হবার যো হয়েছিল!

রামসদয় বাবু বন্ধুর অস্বস্তিকর অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া এই সময় কহিলেন,—আর এমনই আশ্চর্য্য, এই ওয়েটিংরুমে আজ অষ্টবজ্রের সংযোগ হয়ে গেল।

অধ্যাপক মিত্র বলিলেন,—কেন বলুন ত? কথাটার সত্যই কোন সার্থকতা আছে নাকি?

রামসদয় বাবু কহিলেন,—না থাকলে বলতে পারি? আপনার বহু প্রিয়জন—কথাটা এই পর্য্যন্ত বলিয়া তিনি জাহ্নবীর দিকে চাহিলেন। তাঁহার কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুহাসিনী সামনের দিকে আসিয়া আচম্বিতে অধ্যাপক মিত্রের পদতলে হেঁট হইয়া প্রণাম করিলেন ও পরক্ষণে উঠিয়াই দুর্গার পাশে গিয়া তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন। অধ্যাপক মিত্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রামসদয় বাবুর দিকে চাহিতেই তিনি কহিলেন—'চিনতে পারলেন না ত, আপনার ভাদ্রবউ যে! ওদিকে চেয়ে দেখুন—কে দাঁড়িয়ে, আপনার ডি, এস, পি—ভাই।'

জাহ্নবীকেও এবার অগ্রসর হইয়া দাদার উদ্দেশে মাথাটা নীচু করিতে

হইল। বিস্ময়ের সুরে অধ্যাপক মিত্র কহিলেন,—"জাহ্নবী! আশ্চর্য্য, তোমাকে যে এখানে দেখতে পাব, সে ত ভাবিনি। বৌমাকেও এনেছ দেখছি, কিন্তু আমাকে ত কিছু লেখনি। চুপি চুপি আসাতে তোমাদের আনন্দ বেশী হতে পারে, কিন্তু আমাদের আনন্দটা তাতে ব্যাপক হতে পায় না।

জাহ্নবী কহিলেন,--আমাকে আসতে হয়েছে একটা কনফারেন্সের সংস্রবে—

রামসদয় বাবু কহিলেন,—আপনি এ ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন না—ব্যাপার কি? আমাদের আসাটা হঁয়েছে কাকতালিয়বৎ। এঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য আমার আসা, যেহেতু এঁরা আমার গেষ্ট। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমার আসতে ঘণ্টা খানেক লেট হয়ে যায়, তাতেই অষ্টবজ্রের সমাবেশ সম্ভব হয়েছে।

দুর্গা এই সময় বিদ্যুৎরেখাটির মত ছুটিয়া জাহ্নবীর কাছে আসিল, তাড়াতাড়ি প্রণাম পর্ব্ব সারিয়া অভিমানের সুরে কহিল,—কাকাবাবু, কি করে আপনি আমাদের ভুলে ছিলেন বলুন ত! এখানে যদি বা এলেন—খবর দিলেন না, গেষ্ট হয়েছেন আর একজনের; কেন, আমরা কি পর? ওসব হবে না, আপনি না যান—কাকীমা আর খোকাখুকীদের আমি ছাড়ছি না—

অধ্যাপক মিত্র কহিলেন,—খোকাখুকী আবার কোথায়? দেখছি না ত—

দুর্গা কলহাস্যের লহর তুলিয়া কহিল,—'ঐ যে ওধারের দুখানা চেয়ারে দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছে তারা।' বলিয়াই সে ক্ষিপ্রপদে শিশু দুইটিকে জাগাইতে ছুটিল।

রামসদয় বাবু কহিলেন,—এসেছেন যখন পাটনায়, তোমাদের বাড়ীতে যাবেন বইকি মা-লক্ষ্মী, কিন্তু আজ আমি এঁদের ছাড়ছি না, খাবার দাবার সব তৈরী, তার ওপর দেরী করে মস্ত একটা ত্রুটিও আমি করে বসেছি, তার সংশোধন না করলে কিছুতেই স্বস্তি পাব না। আজ আমি এঁদের নিয়ে যাই, রাতও অনেক হয়েছে।

রামসদয় বাবুর অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া অধ্যাপক মিত্র আর এ সম্বন্ধে কোন পীড়াপীড়ি করিলেন না, কন্যাকেও নিরস্ত হইতে বলিলেন।

অতঃপর যাত্রার আয়োজন চলিল। বলাই পণ্ডিত জানাইলেন, তাঁহার সম্বন্ধে আশঙ্কা করিবার কিছু নাই, ইজিচেয়ারে এভাবে বরাবর শুইয়া থাকিলে বরং তাঁহার কষ্ট হইবে, বাসায় গিয়া শয্যার আশ্রয় লওয়াই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন। অগত্যা, ছেলেরা তাঁহাকে তুলিয়া সন্তর্পণে লইয়া চলিল। দুর্গাও তাহার নবপরিচিতা কাকীমার নিকট বিদায় লইয়া ও সদ্য জাগরিত ভাই বোনকে আদর করিয়া পিতার সহিত গাড়ীতে উঠিল।

—তিন—

নানা কারণে দুর্গা এই পুলিস-মার্কা পরিবারটির আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারে নাই, বরং অপ্রিয়ভাজনই হইয়া উঠে। অধ্যাপক যদুপতির প্রকৃতি এবং বৃত্তি দুটিই ছিল স্বতন্ত্র, কনিষ্ঠ জাহ্নবীর সহিত কিছুতেই খাপ খাইত না। যদুপতি ছিলেন পাটনা কলেজের ফিজিওলজীর প্রফেসর, কলেজে তাঁহার যে কয়টি ভক্ত ছাত্রকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণীতত্ত্বের লেকচার দিতেন, কলেজের পর তাহাদিগকে লইয়া প্রাণশক্তিটুকু পরিপূর্ণ করিতে হাতে কলমে বিবিধ উপাদান যোগাইতেন। প্রফেসর হইলেও যদুপতি ছিলেন রীতিমত শক্তিসাধক, আর তাঁহার ছাত্রদলটির প্রত্যেকেই এক একটি যেন শক্তিধর। এই দলটিকে লইয়া যদুপতি পাটনা কংগ্রেসের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন। আর যদুপতির কনিষ্ঠ জাহ্নবী সে সময় পাটনা পুলিসের সাব-ইন্সপেক্টারী লইয়া সভয় বিস্ময়ে দাদার কাণ্ড কারখানা দেখিতেন।

ছুটির দিন যদুপতির বাসায় ঢুকিলেই মনে হইত—বাড়ীখানা যেন কিসের উৎসবে মাতিয়াছে। প্রাঙ্গনে চলিয়াছে বয়ঃস্থ ছেলেদের রীতিমত শক্তিচর্চ্চা, বৈঠকখানায় কংগ্রেসের মাতব্বরদিগকে লইয়া যদুপতির শক্তি ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে প্রাণস্পর্শী পরামর্শ, ভিতরে ভোজের বিপুল আয়োজন, পরমানন্দে ও পরিপূর্ণ উৎসাহে বাড়ীর গৃহিণীর তাহাতে যোগদান।

আর জাহ্নবী দেখিতেন, দাদার এই সহযোগী তরুণ দলটির প্রত্যেকের রক্তে ক্রিমিনালিটির বীজাণু যেন কিলবিল করিতেছে। জাহ্নবীর রিপোর্টের

উপর নির্ভর করিয়া কর্তৃপক্ষ যদিও এই দলটিকে আইনের নাগপাশে বাঁধিবার আশু কোন আয়োজন করেন নাই, কিন্তু জাহ্নবীর মত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ পুলিস কর্ম্মচারীকে এজন্য পুরস্কৃত করিতে বিস্মৃতও হন নাই। সরকারী নিমকের মর্য্যাদা রাখিতে যে কর্ম্মচারী অগ্রজের নামও সন্দেহভাজনদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করিতে পারে—কর্ম্মজীবনে তাহার অগ্রগতি কখন রুদ্ধ থাকিতে পারে না। শীঘ্রই জাহ্নবী ইন্সপেক্টারের পদে উন্নীত হইয়া ভ্রমকায় বদলী হইলেন।

তাঁহার অদৃষ্টাকাশে তখন অরুণোদয় হইয়াছে, কর্ম্মজীবনে জুয়ার চলিয়াছে; কর্ত্তৃপক্ষ তুষ্ট, কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্ত; হঠাৎ দেওঘর অঞ্চলে দস্যু-দলের প্রাদুর্ভাব ঘটিল, সারা সাঁওতাল পরগণা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দস্যুদলের ভার পাইলেন জাহ্নবী। পৃষ্ঠপোষক রহিলেন কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় মিষ্টার হুইলার। কয়েক মাসের বিপুল চেষ্টায় জাহ্নবী কৃতকার্য্য হইলেন এবং পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের পদে পাকা হইয়া দেওঘর সাব ডিভিসনের ভার পাইলেন।

জাহ্নবীর কর্ম্মজীবনের এই গৌরবোজ্জ্বল সময়েই পাটনা ষ্টেসনের ওয়েটিংরুমে অপ্রত্যাশিতভাবে দীর্ঘকাল পরে পুনরায় জ্যেষ্ঠ যদুপতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। যদুপতির জীবনের কর্ম্মধারাও এই দীর্ঘকাল একই ধারায় বহিয়া আসিয়াছে। পত্নী বিয়োগের পর তিনি আর বিবাহ করেন নাই। আদর্শ সহধর্ম্মিণীর সমস্ত গুণগুলিই পরিপূর্ণভাবেই অধিকার করিয়া উপযুক্ত কন্যা দুর্গা তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছে। দুর্গাকে তিনি মনোমত করিয়াই তৈয়ারী করিয়াছেন। শৈশব হইতেই কন্যাকে স্বাস্থ্যরক্ষা, সংযম, শক্তিচর্চ্চা, দুঃসাহস, আত্মরক্ষা, শ্রমসহিষ্ণুতা প্রভৃতি দুর্ল্লভ গুণগুলি গ্রহণ করিতে হাতে কলমে এমন শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা এ যুগের মেয়েদের দুঃসাধ্য,

কিন্তু অপরিহার্য্য। যদুপতি বলেন—'বঙ্কিমচন্দ্র পরাধীন দেশের মেয়েদের অবস্থা ভেবেই দেবীচৌধুরাণীর প্রফুল্লর অপূর্ব্ব শিক্ষা লোকচক্ষুর উপর তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু দেশের লোক নভেল ভেবেই দেবীচৌধুরাণী প'ড়ে এসেছে, ক'জন প্রফুল্ল তৈরী হয়েছে আমাদের দেশে? বাংলার মেয়েরা যেদিন প্রফুল্লর মত শিক্ষিতা হবে, সেদিন হবে সত্যকার নারী-প্রগতি।'

যদুপতির বাড়ীর প্রাঙ্গনে তাঁহার যে সকল ছাত্র সমবেত হইত শক্তি-চর্চ্চার জন্য, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি তাহাদের সমস্ত অন্তর-প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া তবে প্রবেশাধিকার দিতেন। মানুষের চক্ষু দেখিয়াই তিনি তাহার প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারিতেন। এ বিষয়ে কন্যা দুর্গা ছিল তাঁহার কষ্টি পাথর। দশ বৎসর বয়সেই তাহার সৌন্দর্য্য এরূপ উচ্চ প্রশংসিত হইয়া উঠে যে, বিহার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচশত ছাত্রীর মধ্যে এই মেয়েটি স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্য্যে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করে। সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে যে, সমস্ত 'প্রভিন্সের' ভিতর এ রকম মেয়ে আর দুটি নেই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষা ও শক্তি চর্চ্চার ফলে ক্রমশঃই দুর্গার সৌন্দর্য্যের যেমন উৎকর্ষ হইতে থাকে, এই রূপসী মেয়েটীর সঙ্গ কামনায় অধ্যাপক মিত্রের ব্যায়ামশালায় নানাশ্রেণীর শিক্ষার্থীরও তেমনই প্রাদুর্ভাব ঘটে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশকেই সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে 'ব্যাধিগ্রস্ত' এই অপবাদ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। যদুপতি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া বিদায় দেন—'তোমরা ব্যাধিগ্রস্ত, ব্যাধি তোমাদের দেহে নয়—মনে। এখানে নির্ব্যাধি ছেলে মেয়েরা একত্র শক্তিচর্চ্চা করে, ব্যাধিগ্রস্তদের স্থান এখানে নেই। এজন্য আমাকে যাচাই করে শিক্ষার্থী নিতে হয়।'—মনকে ব্যাধিশূন্য ও চরিত্রকে গঠন করিবার জন্য তিনি প্রত্যাখ্যাত শিক্ষার্থীদিগকে কতিপয় সদ্‌গ্রন্থের তালিকা দিয়া বলেন—'নিষ্ঠার

সঙ্গে এই বইগুলি একটি বৎসর ধরে পড়বে। তারপর আমার কাছে এসে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে, পাস হলে নিশ্চয়ই প্রবেশাধিকার পাবে, কিন্তু তার আগে নয়।'

তেরো বছর বয়সে দুর্গা বালিকা বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া যেদিন পাটনা ইউনিভার্সিটির রেকর্ড ভাঙ্গিয়া দিল, সমগ্র ছাত্রছাত্রীর শীর্ষে এই প্রবাসী বাঙ্গালী বালিকাটির নাম বিরাট নৈবেদ্যের মাথার উপর ক্ষুদ্রকায় মণ্ডাটির মত শোভা পাইল, একদল বিহারীর তাহাতে রীতিমত গাত্রদাহ উপস্থিত হইল এবং বহুদিন হইতে বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ তাহাদের মানসকুণ্ডে ধূমায়িত হইতেছিল, তাহা এইবার উগ্র হইয়া উঠিল। ঠিক এই সময় নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে কংগ্রেসের উপর মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ভার পড়িলে, এই আন্দোলনের অধিকাংশ দলপতিই মন্ত্রীর মসনদে পাকা হইয়া বসিলেন, বিড়ালের অদৃষ্টে সিকা ছিঁড়িয়া পড়িল। ইংরেজ মন্ত্রীদের আমোলে যাহা সম্ভবপর হয় নাই এবং যে প্রস্তাব অন্যায় ও অযৌক্তিক বলিয়া তাঁহারা বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন, স্বদেশী মন্ত্রীরা কর্ত্তৃত্বের ভার পাইয়াই কলমের এক আঁচড়ে তাহা কায়েম করিতে কলম উদ্যত করিলেন।

বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ সঙ্গে সঙ্গে চোখ পাকাইয়া বলিলেন— সাবধান! অমন কাজটি করিও না, বাঙ্গালীর কাছে বহুকাল শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া গুরুমারা বিদ্যা প্রকাশ করিও না, তাহার ফল ভাল হইবে না। মনে করিয়া দেখ—বাঙ্গলাই দীর্ঘকাল ধরিয়া বিহারকে আদরে আশ্রয় দিয়াছে, আজ যাহারা বিহারের সুসন্তান ও মাথাওয়ালা বলিয়া গর্ব্ব করে—ভাবিয়া দেখ, বাঙ্গলায় থাকিয়া বাঙ্গালীর সহায়তায় বাঙ্গলার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পাইয়া তাহারা আজ মানুষ হইয়াছে, বাঙ্গালী

মনীষীরা তাহাদিগকে হাতে ধরিয়া রাজনীতিশাস্ত্রে দিয়াছে দীক্ষা, কূটবুদ্ধি বিকাশ করিবার কৌশলে করিয়াছে পোক্ত, রুজি-রোজগারের পথটি দিয়াছে দেখাইয়া, আজ নায়েক হইয়া অকৃতজ্ঞের মত সেই বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে হাত তুলিও না, ধর্ম্মে সহিবে না ; তাহা ছাড়া, তোমাদের 'পলিসির' সঙ্গেও খাপ খাইবে না। অস্থিরমতীর আশ্রমে বসিয়া যে খর্ব্বাকৃতি মানুষটি তোমাদিগকে বাতলাইয়া দিয়াছেন—অহিংসাই তোমাদের মূলমন্ত্র, এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া তোমাদের 'পলিসি' পাকা পোক্ত হইয়াছে —তাহাও যে অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। আর একটি কথা, বাঙ্গলার সহায়তা ও উপকারের কথা বিহারে আসিয়া যদি বা ভুলিয়া গিয়া থাক, তাহাকে না হয় উপেক্ষা করা চলে। কেননা, গাঙ্গ পার হইয়া অনেকেই কুমীরকে কলা দেখাইয়া থাকে। কিন্তু এক শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙ্গলার যে সকল কৃতবিদ্য পুরুষ বিহারে আসিয়া জ্ঞানের আলো বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান বিহারের প্রতিষ্ঠার মূলে অচ্ছেদ্যভাবে নিহিত রহিয়াছে যে সকল প্রতিভাশালী বাঙ্গালীর অবদান,—তাঁহাদের দানের কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদের বংশধরদিগকে যদি আজ আইনের যূপকাষ্ঠে এভাবে বলি দিতে চাও, তাহাতে মহাপাপ হইবে এবং তাহার ফল ভোগ করিবে বাঙ্গলা-প্রবাসী বহুলক্ষ বিহারী—যাহারা সমগ্র বাঙ্গলা ব্যাপিয়া বহুপ্রকারে অর্থো-পার্জ্জন করিয়া বিহারকে পরিপুষ্ট করিতেছে।

বিহার কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পৃষ্ট থাকা সত্ত্বেও দুঃসাহসী যদুপতি মিত্র বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীর স্বার্থরক্ষার অনুরোধে এইভাবে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফৎ ব্যাপারটা সংবাদপত্রে ছাপা হইয়া গেল, চারিদিকে হুলস্থূল উপস্থিত হইল। অস্থিরমতীর আশ্রমে জরুরী বৈঠক বসিল। সংশোধিত অহিংস মন্ত্রের ঋষিকে

পরিবেষ্টন করিয়া ভক্তবৃন্দ করযোড়ে প্রশ্ন করিলেন,—"এখন উপায় কি বাপুজী ?

ইদানীং বহু বিশিষ্ট পরিবারের ছেলেমেয়েরা বাবাকে 'বাপী' বলিয়া ডাকে। একটু অন্বেষণ করিলেই ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইবে। অস্থিরমতীর অহিংস-ঋষিকেও তাঁহার ভক্তবৃন্দ আদর করিয়া 'বাপুজী' বলেন। ঋষিও প্রসন্নচিত্তেই তাহা মানিয়া লইয়াছেন। যে হেতু নামটি সম্পূর্ণ অহিংস, শুনিলে হিংসার উদ্রেক হয় না, বরং প্রীতিভাবই প্রকাশ পায়। ভক্তবৃন্দ করযোড়ে কহিলেন—এখন কি করা যায় বাপুজী ? বাঙ্গালীরা যে ব্যাপারটা নিয়ে ভারি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করচে, পলিসির ওপর খোঁচা দিয়েছে, অথচ এদের না দাবালেই নয় !

বাপুজী মুখখানা মচকাইয়া কহিলেন,—জান ত, কাল আমার মৌন-দিবস ছিল, কাজেই বিষয়টা ভাববার সময় পেয়েচি, আর ভেবে চিন্তে উপায়ও একটা ঠিক করে ফেলেচি।

ভক্তবৃন্দ কাণগুলি খাড়া করিয়া বাপুজীর দিকে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন, কাহারও মুখে টুঁ শব্দটি নাই।

বাপুজী কহিলেন,—একটা গল্প বলি শোনো। গুর্জ্জর দেশে খুব দয়ালু এক বৃদ্ধ ছিলেন। মস্ত বড় তাঁর সংসার, বাড়ীতে ছেলেপুলে পোষ্য অসংখ্য। একটা বিড়াল তাঁর সংসারে ভারি উপদ্রব করত। বৃদ্ধের ভয়ে কেউ তাঁকে জব্দ করতে সাহস পেত না, কেন না, বৃদ্ধ অহিংসার মালা জপেন আর মুখে বলেন—'খবরদার ! হিংসাকে মনে স্থান দিও না, —লাঠি যদি কেউ তোলে মারবার জন্যে—মাথাটি তখনি পেতে দেবে সেই তোলা লাঠির নীচে, কিন্তু নিজে লাঠি কদাচ তুলবে না।' এ অবস্থায় বাড়ীর লোকের সাধ্য কি বিড়ালকে লাঠি দিয়ে ঠেঙ্গায় ! কাজেই উপদ্রব বেড়েই

চলল। শেষে বেড়াল একদিন কর্ত্তার দুধের বাটীতে চুমুক দিলে। কর্ত্তা নিত্য আড়াই সের আন্দাজ ছাগল দুধ খান, অতি কষ্টে তা সংগ্রহ করা হ'ত! দুধের ওপর বিড়ালের নজর পড়তে তাঁরও মেজাজ শেষে বিগড়ে গেল। একদিন রাগের মাথায় বলে বসলেন—বিড়ালটাকে শিক্ষা না দিলে ত আর চলে না। ছেলেরা বুঝলে, এই ঠিক সময়। সেইদিনই তারা বিড়ালটাকে ধরে বেঁধে ফেললে। তারপর যখন তার ওপর লাঠি চালাবার ব্যবস্থা তারা করছিল, সেই সময় দয়ালু বৃদ্ধের প্রাণ কেঁদে উঠল, অহিংসার মন্ত্রগুলো চোখের সামনে অগ্নির অক্ষরে ফুটে উঠলো; তিনি তখনি ছেলেদের থামিয়ে পরামর্শ দিলেন—"ওরে, মারিস নি লাগবে, হিংসা করা হবে; তার চেয়ে এক কাজ কর্—ওটাকে বস্তায় পুরে নদীর জলে ফেলে দে, পাপটাও যাক্ আর অহিংসাও রক্ষা পাক্।"—এখন এই বৃদ্ধকে আদর্শ করে আমাদের কাজ করতে হবে।

ভক্তবৃন্দ সবিনয়ে প্রশ্ন করিলেন—সে কাজটি কি বাপুজী?

বাপুজী উত্তর দিলেন—ঐ বৃদ্ধের মত ঘুরিয়ে নাক দেখাতে হবে। বিহার থেকে তোমরা বাঙ্গালী তাড়াতে চাও—এমন কথা কিছুতেই বলা হবে না। বেশ মিষ্টি কথায় হাসি মুখে কেবল জানিয়ে দাও—বাঙ্গালীদের কাছ থেকে 'ডোমিসাইল সার্টিফিকেট' চাওয়া হচ্ছে; তাদের ভালোর জন্যই আমরা এটা চাইছি, এর জন্যে কোন জোর জবরদস্তি নেই, যার ইচ্ছা হয় দেবে—ইচ্ছা না হয় দেবে না।

ভক্তবৃন্দ সবিস্ময়ে জানিতে চাহিলেন—তাতে কি হবে?

বাপুজী মুখখানা অস্বাভাবিকরূপ গম্ভীর করিয়া উত্তর দিলেন—তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। হাতে না মেরে ঐ জবরদস্ত জাতটাকে ভাতে মারা হবে। সি, আর, দাস যেদিন আমাকে হারিয়ে দিয়ে জগতের সমক্ষে

হেয় করে দেয়—সেই দিন আমি কি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম জান ?—সমস্ত বাঙ্গালী জাতটাকে আমি এমন করে দাবিয়ে রাখবো যে তারা কোন দিন আর মাথা তুলতে পারবে না। এই আমার প্রথম আঘাত। অহিংসার নামাবলীতে আবৃত হয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার এই অভিনব উপায়টি মৌন-দিবসে আমার উপাস্য অদৃশ্য শক্তির কাছ থেকে আদায় করেছি জেনো।

অতিরিক্ত উত্তেজনায় অহিংস-মন্ত্রের মহর্ষির চোখ দুটি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভক্তবৃন্দ সমস্বরে গাহিল—ওয়া বাপুজীকি কতে! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! বাপুজীর গোড়ে শির লাগে!—অবশ্য শেষের প্রশস্তি বাক্যটি বাপুজীর দুইজন বাঙ্গালী ভক্তের মুখ দিয়াই প্রথম নিঃসৃত হইয়াছিল।

কংগ্রেসী হাই-কম্যাণ্ডের এই যুক্তি শিরোধার্য্য করিয়া বিহার সরকারের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যে নীতি অবলম্বন করিলেন, বাঙ্গলার কংগ্রেসী নেতারা পর্য্যন্ত তাহাতে বাহোবা না দিয়া পারিলেন না। বাপুজীর মোহে ইঁহারাও তখন উদ্‌ভ্রান্ত, বাপুজীকে চটাইবার মত দুঃসাহস দেখাইবেন কে? এক বাক্যে সায় দিয়া বলিলেন—'ক্ষতি কি এতে! বিহার সরকার না-হয় ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের কথা তুলিয়াছেন, কিন্তু তাহার জন্য পীড়াপীড়ি ত করিবেন না বলিয়াছেন; সার্টিফিকেট দেওয়া বা না-দেওয়া যখন বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদের মর্জ্জীর উপরেই নির্ভর করিতেছে!'

বাঙ্গলার নাম-সর্ব্বস্ব নেতাদের বুদ্ধির এ দৌড় দেখিয়া প্রফেসর যদুপতিই প্রথম ফোঁস করিয়া উঠিলেন। তিনি প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন—'বাপুজীর চালবাজী বুঝিবার মত বুদ্ধি তোমাদের ঘটে নেই, থাকলে অন্ধের মত তাকে সমর্থন করতে না। তোমরা মূঢ়, তাই বুঝতে পারনি—

ঐ ধুয়া ধরে কিছু কাল পরে এরা আমাদের উঠান চসতে সুরু করবে। তারপর তোমাদেরও ভালুক নাচাবে নাকে দড়ি দিয়ে।'

বলাই পণ্ডিত তার-স্বরে আক্ষেপ করিলেন—"হায় সুরেন্দ্রনাথ! আজ তুমি কোথায়? তোমার জায়গায় কারা বসেছে?"

যদুপতির অনুমান যে অমূলক নয়—হুবহু সত্যি, তাঁহার কন্যা দুর্গার সম্পর্কেই তাহা প্রতিপন্ন হইয়া গেল। পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর বালিকা যখন কলেজে পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হইবার আবেদন করিল, তখন তাহার নিকট 'ডোমিসাইল' সার্টিফিকেট দাবী করা হইল। তদনুসারে বালিকা ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের আবেদন করিলে কর্ত্তৃপক্ষ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া প্রফেসর যদুপতিকে জানাইলেন—"তোমার কন্যা যে বিহার প্রদেশের স্থায়ী অধিবাসী অর্থাৎ 'ডোমিসাইল্ড', তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে; অন্যথায় সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করা সত্ত্বেও কলেজে ঢুকিতে পারিবে না, বৃত্তিও পাইবে না।"

যদুপতি জানাইলেন যে, পুরুষানুক্রমে তিনি বিহার প্রদেশে বসবাস করিতেছেন। বহু পুরুষ ধরিয়া বিহারী ছাত্রেরা তাঁহাদের নিকট যে শিক্ষালাভ করিয়াছে, ইহা তাহার উপযুক্ত 'গুরুদক্ষিণা' বটে!

ইহার উত্তরে যদুপতিকে জানানো হইল—কর্ত্তৃপক্ষ খবর পাইয়াছেন, বাঙ্গলাদেশের সঙ্গে তাঁহার মাটীর সম্বন্ধ আছে। বাংলায়-যে তাঁহার ভিটা ও ভূসম্পত্তি রহিয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অথচ বিহারেও তিনি বসবাস করেন। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে কোন বিহারবাসী বাঙ্গালীর এক কাঠা জমি থাকিলেও তাহাকে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না। বেদের মত টোল ফেলিয়া দেশময় ঘুরাঘুরি করা বাঙ্গালীদের স্বভাব। নানা সূত্রে তাঁহারা যদুপতির সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ

পাইয়াছেন, তাহাতে তিনি বা তাঁহার কন্যা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পাইবার অধিকারী নহেন।

এই জবাব হইতে সকলেই বুঝিলেন যে, যদুপতি বাবুর বিহারে এতকাল বাস করাই মস্ত বিড়ম্বনা হইয়াছে। খুলনা জিলার এক অখ্যাত অঞ্চলে পূর্ব্বপুরুষের বাস্তুভিটাটির সহিত যদুপতি বাবুর তিন পুরুষ যাবৎ কোন যোগসূত্র না থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে সেই অপরিচিত ভূসম্পত্তির অধিকারী সাব্যস্ত করিয়া বিহার প্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি এরূপ নির্ম্মম দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন! যদুপতি বাবু কেবল শিক্ষকরূপে বিহারের সেবা করেন নাই, রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা আন্দোলনে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, বিহার কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্ম্মীরূপে যে সকল অনুষ্ঠানের সহিত তিনি সংসৃষ্ট—অতুলনীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী তাহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, যৌবনের সমগ্র শক্তি এবং উপার্জ্জিত প্রচুর বিত্তের অধিকাংশই উৎসর্গ করিয়া যে আদর্শ যুবসঙ্ঘ তিনি গঠন করিয়া কংগ্রেসের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাহার কোন গুরুত্বই উপলব্ধি করিলেন না; তাঁহার জীবনব্যাপী এই বিরাট সাধনা এবং প্রাণপাত সেবা সকলই ব্যর্থ,—প্রাদেশিকতা ও বাঙ্গালী-বিদ্বেষে অন্ধ বিহারীদের নিকট উহার কোন মূল্যই নাই!

বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীরা স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখিলেন, অহিংসার এই মারাত্মক অস্ত্রটি বাছিয়া বাছিয়া কেবল বাঙ্গালীদের উপরেই এইভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অন্য যে কোন প্রদেশের লোক বিহারে 'ডোমিসাইল সার্টিফিকেট' না লইয়াই বিদ্যালয়ে পাঠ করিতে পারে, সরকারী চাকরী পাইতে পারে, অসুখ-বিসুখে হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতে পারে, কেবল বাঙ্গালীই তাহা পারে না, তাহাদের প্রবেশ-পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইল এই

'ডোমিসাইল সার্টিফিকেট'। বাঙ্গালীর সকল প্রতিবাদ ভাসিয়া গেল, হাই-কম্যাণ্ডের ইঙ্গিতে চালিত কংগ্রেসও নীরব রহিল। বাঙ্গালী কিন্তু নিরস্ত হইলেন না, তুমুল আন্দোলন-প্রবাহে দেশ প্লাবিত করিয়া দিলেন, তাহার ধাক্কা লাগিল শাসন-চক্রের হাতলে, চক্রীদল ত্রস্ত হইয়া ছুটিলেন বাপুজীর আশ্রমে।

বাপুজী সেদিন অনশনব্রত পালন করিতেছিলেন। এতগুলি ভক্তের সমাগম হইয়াছে জানিয়া অপরাহ্নে সামান্য জলযোগে অনশন ভঙ্গ করিলেন। অহিংস মন্ত্রের ঋষির জলযোগে গোলযোগ কিছু থাকিবার কথা নয়—আয়োজন সমস্তই অহিংসভাবেই হইয়া থাকে। এদিন ঋষিবরের অনশনভঙ্গে যে আয়োজন হইয়াছিল, তাহার ফিরিস্তি এইরূপ—

তিন সের পরিমিত নির্জ্জলা ছাগদুগ্ধ গাঢ় করিয়া পাঁচ পুয়া
সাতাশটি শ্রীহট্ট দেশীয় কমলা লেবুর কাঁচা রস
আরব দেশীয় সুপক্ক খর্জ্জুর শুষ্ক করিয়া বাইশটি
কাশ্মীর জাত পাটকিলে রঙের স্পেশ্যাল আঙ্গুর এক পুয়া
সর্ব্বশেষে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হিসাবে গম-রস

ফিরিস্তির প্রত্যেক বস্তুটিই অহিংস উপায়ে বহু ব্যয়ে মহর্ষির সেবার জন্য আহৃত হইয়া থাকে। দৈনন্দিন এই যৎসামান্য আহার্য্যের পরিবেষণ ভার যে ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতীর উপর ন্যস্ত থাকে, তাহাকে রীতিমত 'এফিডেফিট' করিতে হয় যে, অন্ততঃ এক ডজন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবতী ছাগীর বাঁট হইতে মাত্র এক পুয়া হিসাবে দুগ্ধ আহৃত হইয়াছে, কাহাকেও বিব্রত, বিরক্ত বা সন্তানগণকে বঞ্চিত করিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করা হয় নাই। ফলগুলি সংগ্রহের মূলেও কোনরূপ হিংসার সম্পর্ক নাই। গম-রস নামক পানীয়টি ঋষিরই আবিষ্কৃত, গো-ধূম পিষিয়া ছাতু করিয়া গরম জলে চায়ের মত দিয়া ছাগদুগ্ধ ও মিছরি সংযোগে সেব্য।

যাহা হৌক, অনশন ভঙ্গের পর মহর্ষি ভক্তবৃন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণ হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া গুরুবন্দনাপর্ব্ব শেষ করিলেন। অতঃপর আলোচনা আরম্ভ হইল।

বাপুজী মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—আবার কি হ'ল ?

উত্তর আসিল—ভারি ঠেলা দিয়েচে, তাল সামলাতে পারছি না।

বাপুজী একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন—আন্দোলন চালিয়েছে বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভারি বদনাম রটাচ্ছে, যাকে বলে—বুকে বসে দাড়ী ওপড়াতে সুরু করেছে। 'বেহার হেরল্ড' এক রকম মরেই গিয়েছিল, আবার তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে, সে যা ঝাল ঝাড়ছে—

বাপুজী—জানি। গায়ে জ্বালা ধরলেই তার যাতনায় লোকে মুখে ঝাল ঝাড়ে। সহ্য করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ।

ভক্ত—কিন্তু লোকের মন যে বিষিয়ে দিচ্ছে বাপুজী! বলে কিনা—মধ্যযুগের অনাচারকে আমরা ফের ফিরিয়ে এনেছি, এ কি সহ্য হয় ?

বাপুজী—সইতে হবে। পরে দেখবে—এক তরফা চেঁচিয়ে ওদের গলা ভেঙ্গে গেছে, যার জন্য চেঁচাচ্ছে—গা-সওয়া হয়ে গেছে।

ভক্ত—ভারি জিদি জাত বাপুজী, ওদের আন্দোলনকে ভারি ভয় হয়; ওরা 'না'কে 'হ্যাঁ' করে ছাড়ে। পার্টিসন অফ বেঙ্গলের কথা ত জানেন, সেটেলড্ ফ্যাক্টকে আনসেটলড করে তবে ছাড়লে। এ জাতকে আপনি জানেন না।

বাপুজী—আমি জানি না ? বিলেতে যখন আইন পড়ি, তখন থেকে জানি। আমার উপাস্য অদৃশ্য শক্তি তখনই আমাকে বলে দিয়েছিল—এই জাতের সঙ্গে একদিন আমাকে বোঝা পড়া করতে হবে,—আমি তখন থেকে তৈরী হয়েছি। ওদের হাড়হদ্দ সব জেনে নিয়েছি, কি করে

অস্তরটিপুনী দিতে হয়—সে হদীস আমার অদৃশ্যশক্তিই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। সেবার অহিংসা মাখানো যে অস্তরটি তোমাদের হাতে দিয়েছি, ওতেই ওদের বাড় বৃদ্ধির দফা রফা হবে। এবার গোড়ায় ঘা দেবার আর এক অস্তর পেয়েছি।

ভক্ত—পেয়েছেন? আর একটা অস্তর? য়্যাঁ!

বাপুজী—হ্যাঁ। কাল মৌন-দিন ছিল। তোমাদের মনের চিন্তা আগেই মনের কবাটে ঘা দিয়েছিল যে! অদৃশ্য শক্তি কাল দেখিয়ে দিয়েছেন— দ্বিতীয় অস্ত্র, আর কেমন করে সেটা প্রয়োগ করতে হবে। মন দিয়ে শোন সকলে।

ভক্ত—বলুন।

বাপুজী—দেখ, এক বাঙ্গালীর বেয়াদপীর জন্যে সমস্ত বাঙ্গালী জাতটার ওপর আমি যেমন চটে গেছি, আর এক বাঙ্গালীর দুষ্ট বুদ্ধির দোষে বাঙ্গলা ভাষাটাই আমার বিষ দৃষ্টিতে পড়েছে।

ভক্ত—বাপুজী সর্ব্বজ্ঞ। ঐ ভাষার আজ এমনি বাড়বৃদ্ধি হয়েছে যে, হিন্দী কিছুতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না, তার আওতায় পড়ে মুসড়ে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় ভক্ত—নাগরী প্রচারিণী সভা ত কত চেষ্টাই করছে, কিন্তু সবই হচ্ছে ভস্মে ঘৃতাহুতি।

তৃতীয় ভক্ত—হবে না? হিন্দী সাহিত্যে স্রষ্টা কোথায়? মৌলিক রচনা কটা আছে? যেই একখানা বাংলা বই ছাপা হয়ে বেরুচ্ছে, অমনি তার নাম আর ভোল বদলে হিন্দী সাহিত্যের দরবারে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। বাঁচোয়া এই যে, বাংলাদেশের লিখিয়েরা হিন্দী জানে না, কিম্বা এসব ফেরেববাজীর কোন খবর রাখে না।

চতুর্থ ভক্ত—আগে রাখতো না, এখন রাখে। এ রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন—বাপুজী যাকে গুরুজী বলতে অজ্ঞান—বাংলার সেই ভুষুণ্ডী কবি। মনে নেই, তাঁর কি একখানা বই থেকে না-বলে কিছু নিয়ে হিন্দীতে ছাপা হবামাত্রই নালিশ করে মবলক টাকা আদায় করে নিয়ে ছেড়েছিল। এখন সব ভুষুণ্ডীই সেয়না হয়েছে—

৫ম ভক্ত—সে ভালই হয়েছে। পরের সাহিত্য নিয়ে নিজের সাহিত্যকে পুষ্ট করতে যাওয়া মস্ত ভুল, ভারি অন্যায়।

বাপুজী—তারপর ? এ-ঢেউ কোথায় গিয়ে থামবে ?

ভক্তগণ লজ্জিত হইয়া বিতর্ক বন্ধ করিলেন। বাপুজী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি কথা থেকে এতগুলো বাজে কথা উঠলো ?

১ম ভক্ত—বাপুজী বলছিলেন—বাঙ্গালা ভাষাটা বিষ দৃষ্টিতে পড়েছে।

বাপুজী—অতএব অহিংসভাবে ঐ ভাষাটাকেও এখন ভারতের আর সব প্রদেশ থেকে তাড়াতে হবে। এর আগে বাঙ্গালীকে তাড়াবার জন্যে যেমন তাদের বাড়ীর উঠোন চসবার ব্যবস্থা হয়েচে। উঠোন চসবার কথাটা অবশ্য আমার নয়, এক বাঙ্গালীই কথাটা বলেছে। কিন্তু কথাটা ভারি খাঁটি, বেশ বলেছে। তাই আমিও বলছি। হঁ্যা, এখন আমার কথা শোন—এর পরের ব্যবস্থা হচ্ছে, বাংলা ভাষাকে আর বিদ্যালয়ের শিক্ষার সংস্পর্শে রাখা হবে না। বাংলা ভাষার নাম গন্ধও কোন ইস্কুলে থাকবে না। বাঙ্গালীই হোক, আর যে প্রদেশীই হোক, বিহারে থেকে পড়াশুনা করতে হলে হিন্দীকেই মেনে নিতে হবে।

২য় ভক্ত—কিন্তু বাংলাদেশের স্কুল কলেজে ত এ ব্যবস্থা নেই, সব ভাষাকেই ওরা স্থান দিয়েচে।

বাপুজী—তার কারণ, বাংলাদেশের ওপর সব দেশের লোকের দাবী আছে তাই। বাংলাদেশের ব্যবস্থার কথা তুলে ত লাভ নেই—আমাদের ব্যবস্থাই পাকা হয়ে থাক। মনে নেই—হিন্দীকে রাষ্ট্র-ভাষা করবার জন্যে আমি যখন হুকুম দিই, সব দেশ ঘাড় নিচু করে তা মেনে নিলে কেবল বাংলা থেকে যে লোকটা প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল,—সেই মাথা তুলে আপত্তি জানালে। আমি কি তা ভুলে গেছি মনে কর ? বাংলা ভাষাকে তার শাস্তি নিতে হবে না ? তারই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সমস্ত বিহারে এমন কি বছর কতক আগে—আমারই উদ্যোগে আর ভারত সরকারের ব্যবস্থায়—যে অঞ্চলগুলোকে বাংলার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে বিহারের কোলে কৌশল করে বসিয়ে দেওয়া হয়েচে, সে সব অঞ্চলেও হিন্দী ভাষাকে কায়েম করতে হবে।

৩য় ভক্ত—বা ! চমৎকার ! আমাদের মাথাতেও এটা এ পর্য্যন্ত সেঁধোয় নি।

৪র্থ ভক্ত—কিন্তু ঐ অঞ্চলের যারা বাসীন্দা, তারা বাংলার কোলে ফিরে যাবার জন্যে ছটফট করছে, আর বাংলার কাগজগুলো এই নিয়ে তারি হৈ চৈ সুরু করে দিয়েছে যে।

বাপুজী—জানি। তাই না ঐ সব ছটফটানি আর হৈ চৈ-এর গোড়ায় হিন্দীর ইন্‌জেকসন দেবার ব্যবস্থা দিচ্ছি। আমি জানি, দুটো বড় বড় অঞ্চল—যেমন ছোটনাগপুর আর সাঁওতাল পরগণা—বরাবর বাংলারই ছিল, এখন বিহারের হয়েছে। ঐ অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোকেরই ভাষা হচ্ছে বাংলা, হিন্দী ওখানে মোটেই আমোল পায়নি। এখন বাঙ্গালীদের ইচ্ছা, ঐ দুটো অঞ্চল আবার বাংলার সঙ্গে মিশে যায়। আর একদল সুবিধাবাদী চাইছে—ঐ অঞ্চল দুটো নিয়ে একটা আলাদা প্রদেশের পত্তন

হয়। কিন্তু আমি চাইছি—ওরা বিহারের কোলে যখন একবার উঠেছে, আর নামতে না পায়। এখন এরই মধ্যে যদি ঐ দুটো দেশের ভেতর হিন্দী ভাষাটাকে চালু করে দেওয়া যায়, আমাদের ইচ্ছাটার আর মার নেই। ভারত-সরকার যখন দেখবেন—দুটো অঞ্চলের ভাষাই হচ্ছে হিন্দী, স্কুলে আদালতে হিন্দী ভাষাই চালু, তখন বিহারের দাবী স্বীকার না করে পারবেন না। বুঝলে ?

ভক্তবৃন্দ একসঙ্গে এবং উল্লাসের সুরে বলিলেন—বুঝিছি, খাসা আইডিয়া! এই ব্যবস্থাই পাকা হবে।

উপসংহারে বাপুজী বলিলেন,—মনে রেখো, এই ভাষা প্রতিষ্ঠার ওপরেই তোমাদের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে। এর জন্য চালাতে হবে রীতিমত আন্দোলন। মিঞারা যেমন 'ইসলাম বিপন্ন' বলে একটা ধূয়া ধরেছে, তোমরাও ঠিক ঐ ধরণের একটা হল্লা তুলে দাও—'হিন্দী বিপন্ন, তাকে রক্ষা করতে হবে।'

ভক্তবৃন্দ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—ওয়া বাপুজীকি ফতে !

এই গুপ্ত বৈঠকের বিবরণ জনসাধারণ জ্ঞাত হইল না বটে, কিন্তু ইহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা বাঙ্গালী-সমাজকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। সংবাদপত্রে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল। সভাসমিতি করিয়া রীতিমত প্রতিবাদ চলিল, কিন্তু কোন ফলই তাহার ফলিল না ; যাঁহারা ব্যবস্থাপক, সকল কর্তৃত্ব তাঁহাদের হাতে, তাঁহারা নীরবে কাজ করিয়া চলিলেন।

এদিকে যদুপতির বাটীতেও এক গোপন বৈঠক বসিল। এই বৈঠকে সকল বিদ্যা ও সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, দূরদর্শী, আদর্শ-চরিত্র, সত্যাশ্রয়ী বাইশ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এবং দুই জন ধনাঢ্য ভূস্বামীকে লইয়া একটি সঙ্ঘ

গঠিত হইল। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন নেতৃস্থানীয় কতিপয় বিহারী ব্যবস্থাপকের অনুষ্ঠিত অনাচারের প্রভাব হইতে বাঙ্গালী সমাজকে মুক্ত করিয়া বাঙ্গালী জাতি এবং বাঙ্গলা ভাষার গঠন-শক্তি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও উদার ভাবধারার দুর্ব্বার গতি বিশ্বব্যাপী করিতে উক্ত সঙ্ঘ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, তাহা এইরূপ—

বাঙ্গালী সকল বিষয়েই গোটা-ভারতের গুরু; রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম্মনীতি শিক্ষাপদ্ধতি,—সংস্কার ব্যবহার প্রচার প্রতিষ্ঠা—সকল ব্যাপারেই বাঙ্গালীর মনীষা ভারতবাসীকে দিয়াছে দীক্ষা; বাঙ্গালীই সর্ব্বপ্রথম জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা দেখাইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শতাব্দীব্যাপী অন্ধকার দূর করিয়া দেন। মধ্যযুগের দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীই প্রচার করিয়াছিলেন অহিংসার মন্ত্র, বাঙ্গালীই শিক্ষা দিয়াছিলেন—কেমন করিয়া দুষ্কৃতি-পরায়ণ দুর্জ্জনকে প্রেমের টানে কোলে আনিয়া আপন করিতে হয়, অনাচারী পতিত অন্ত্যজদের চিত্তশুদ্ধি করিয়া পার্শ্বে বসাইতে পারা যায়। ভারতের ভাবধারা ও ঐতিহ্য বহন করিয়া দুস্তর অতলান্তিকের পথে বাঙ্গালীই প্রথম প্রতীচ্যের দ্বারে হানা দিয়াছিলেন—ভারতের সহিত বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সহিত যোগসূত্রের প্রথম গ্রন্থী রচয়িতা এই বাঙ্গালী। সুতরাং নিখিল ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবর্ত্তকস্থানীয়—অধুনা আত্মবিস্মৃত ও অবজ্ঞাত এই বাঙ্গালী জাতিকে পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অতীতের আদর্শে অবহিত এবং জগতের কল্যাণকল্পে মানবসমাজের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের সুদুর্লভ ক্ষমতাটুকু আয়ত্ত করিতে হইবে। এ জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা,—এই সাধনার পথ প্রদর্শন করিবেন এমন শিক্ষিতপটু বিচক্ষণ প্রবর্ত্তকমণ্ডল—যাঁহারা সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতার মোহ অতিক্রম করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ভারতের ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির জ্ঞানভাণ্ডারের রত্নরাজি আহরণ করিতে

সমর্থ হইয়াছেন, ভারতীয় দর্শন উপনিষদ্ শাস্ত্র-পুরাণ, বৈদিক ঋষিদের আশ্রম ও আত্মবত্তার সকল তথ্য নখদর্পণে রাখিয়াছেন, সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ ও প্রবর্ত্তকদের সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন ;- প্রত্যেকেই যাঁহারা সহৃদয়, মিষ্টভাষী, সদাশয়, অপাপবিদ্ধ, চরিত্রবান, তেজস্বী, নির্ভীক, বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান ও সুবক্তা। বিশ্ববিধানের বিধিগুলির সহিত প্রত্যেকেই যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠভাবে এমনই সুপরিচিত যে, নিখিল বিশ্বের যে কোন রাষ্ট্র বা যে কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব-ভার অনায়াসেই বহন করিতে সমর্থ।

সর্ব্বাধিক স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে এক আদর্শ নগরী গঠিত হইবে এবং মধ্যমণি-রূপে তাহাকে মহিমান্বিত করিবে এক আদর্শ বিশ্ব-বিদ্যালয়, আর তথায় ভারতগুরু বাঙ্গালীর সুষুপ্ত মণীষার বোধন বসাইবে ঐ সকল ঋষিকল্প সুধী। যাহাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থবোধ ঈর্ষার আকারে উগ্র হইয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাধিক উন্নত বাঙ্গালা ভাষাকে সাম্প্রদায়িকতার কোণে ঠেলিয়া দিতে ব্যগ্র হইয়াছে, তাহাকেই বাহন করিয়া এই আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূর্ব্ব ও সম্পূর্ণ শিক্ষা সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইবে। রাজনৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনের প্রতি কেন্দ্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ-শিক্ষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পাইবে। বাঙ্গলা ভাষা এখানে শিক্ষার বাহন হইলেও, ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সহিত পারস্পরিক সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইহার বিভিন্ন শাখায় বিশিষ্ট ভাষাগুলিরও অনুশীলন চলিবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মী ও সেবকদলের পক্ষে বৈদেশিক ভাষাগুলিকেও মাতৃভাষার মত আয়ত্ত না করিয়া উপায় নাই।

এই বিরাট পরিকল্পনা কাহারও বিরুদ্ধে অসন্তোষ জাগ্রত করিবার জন্যও নহে, অথবা কাহারও বিরোধ-বিদ্বেষ প্রবুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যও ইহার মূলে

নাই। অন্যায় ও অধিকারের প্রতিকারে ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে বাঙ্গালীর প্রণষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার এবং আত্মবিলোপ হইতে তাহাদের আত্মরক্ষার ইহা কালোপযোগী ব্যবস্থা। এই সংস্থা বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবে, জাতিগঠন করিবে, মানব-সমাজের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করিবে।

কোনরূপ হৈ চৈ না করিয়া সঙ্ঘ নীরবে কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। যে দুইজন ধনাঢ্য ভূস্বামী এই সঙ্ঘের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত এক বিশাল জঙ্গল লইয়া দীর্ঘকাল হইতে তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। স্থানটি আয়তনে অন্যূন পাঁচ মাইল, জনবসতি নাই বলিলেই চলে, স্থানে স্থানে দুই চারি ঘর সাওতাল অস্থায়ী ভাবে পর্ণশালা তুলিয়া বসবাস করে, জঙ্গল হতে মধু ও কষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া সন্নিহিত সহরে লইয়া যায়,—এ কাজে মন্দা পড়িলে আবার অন্যত্র গিয়া বাসা পাতে। এই সুদীর্ঘ অঞ্চলটির আওলাতের মধ্যে শাল মহুয়া প্রভৃতি গাছ, ইহা কাটিয়া ব্যবসায়ী-দিগকে বিক্রয় করা হয়। এই সময়েই দুই ভুস্বামীর মধ্যে গাছ-কাটা লইয়া তুমুল সংঘর্ষ বাধে ও তাহার স্রোত আদালত পর্য্যন্ত গড়ায়।

দুই ভূ-স্বামীই বাঙ্গালী, ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের শব্দভেদী বান ইঁহাদেরও আভিজাত্যে রীতিমত আঘাত দেয়। বিহার প্রদেশে বাঙ্গালীর লাঞ্ছনায় ইঁহারা উভয়েই অতিশয় ক্ষুব্ধ হন এবং এই সঙ্ঘের প্রধান পৃষ্ঠ-পোষকরূপে যোগ দেন। সঙ্ঘের সংস্রবে আসিয়া ইঁহাদের মধ্যে যে অহি-নকুল সম্বন্ধ ছিল, দীর্ঘকাল পরে সঙ্ঘের একনিষ্ঠ কর্ম্মী যদুপতির ব্যবস্থায় তাহার অবসান ঘটিল। উভয়েই পরমানন্দে বিবাদী বনভূমি সঙ্ঘের অনুকূলে ত্যাগ করিয়া বহুদিনের বিরোধ-বহ্নিতে শান্তিজল ঢালিয়া দিলেন। দুই জমিদারই পুরুষানুক্রমে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া আসিতে-ছিলেন এবং সঞ্চয় করাটাই ইঁহাদের বিলাসের মত হইয়াছিল। শুভক্ষণে

বিরাট পরিকল্পনা-সম্পর্কে সঙ্ঘের এই আবেদন ইঁহাদের চিত্তের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিল যে, উভয়েই পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই সঙ্ঘের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এরূপ বিপুল সাহায্য পাইয়া সঙ্ঘ তাহার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলেন।

বিশাল জঙ্গলকে নিশ্চিহ্ন করিয়া নগর পত্তনের আয়োজন চলিল, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জ্ঞান-ভাণ্ডার মন্থন করিতে নির্ব্বাচিত শিক্ষা-বিদগণ সমুদ্রপথে পাড়ি দিলেন, দুই বদান্য ভূস্বামীর আদর্শে অন্যান্য ধনাঢ্য সমাজকেও প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে আনিবার প্রয়াস চলিতেছিল। যদুপতিই ছিলেন এ বিষয়ে উদ্যোগী। শোনপুর মেলায় ভারতবর্ষের রাজন্য ও ভূস্বামীসমাজের শুভাগমন হইয়া থাকে। ইঁহাদের নিকট বলাই পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠা অসাধারণ। তজ্জন্য যদুপতি তাঁহাকে পাটনায় আমন্ত্রণ করেন এবং আসিবার সময় তিনি জনতার চাপে বিপন্ন হইয়া যে অবস্থায় ওয়েটিং রুমে নীত হন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

—চার—

বাঁকীপুর মহল্লায় সদর রাস্তার উপর ছবির মত একখানি সুন্দর বাড়ী রামসদয় বাবু বন্ধুর বাসের জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। চেয়ার, টেবিল, খাট, বিছানা, চাকর বেয়ারা পাচক—কিছুরই অপ্রতুল ছিল না। বন্ধু-পরিবারটির জন্য নৈশ-ভোজনের বিপুল আয়োজন ছিল; ফলে, ক্ষুধার্ত্ত অতিথিদের বিলম্বজনিত সকল ক্ষোভ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

জাহ্নবী হাসিয়া বলিলেন—করেছ কি হে, কলকেতার মার্কেটটাকে আমাদের জন্যে তুলে এনেছ নাকি?

রামসদয় উত্তর দিলেন—এটা পাটনা, বিহারের ক্যাপিট্যাল, সবদিক দিয়ে কলকেতার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া হচ্ছে—সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন? আজকাল সবই এখানে মেলে, মায় গলদা চিংড়ি আর ভেটকী মাছ পর্য্যন্ত।

জাহ্নবী বলিলেন,—তা ত দেখতে পাচ্ছি, ত্রুটি কিছুই রাখনি।

ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে কথায় কথায় যদুপতির প্রসঙ্গ উঠিলে জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—দাদা কি তাহলে এখন কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়েছেন?

যদুপতি বলিলেন,—তিনি কাটাননি, তবে কংগ্রেস ওঁর নাম কেটে দিয়েছে।

জাহ্নবী—বটে! স্কুল-লাইফ থেকে ত দাদা কংগ্রেস বলতে অজ্ঞান, স্বদেশী মুভমেণ্টের সময় জেলখানা পর্য্যন্ত ঘুরে এসেছেন। তার পর,

লোকে কথায় বলে—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো, দাদা আর এক ধাপ উঁচুতে গেছেন—ইনি বনের মোষগুলোকে তাড়িয়ে নিজের ঘরে এনে পুরেছেন। এই নিয়ে কত তর্ক হয়েই গেছে আমার সঙ্গে। এখন বোধ হয় বুঝেচেন। যে-কংগ্রেসের জন্য সর্ব্বস্ব তিনি খোয়ালেন, সেই দিলে তাড়িয়ে।

সুহাসিনীর পক্ষে নারীসুলভ লজ্জাটা স্বামীর এই অন্তরঙ্গ বন্ধুটীর সমক্ষে বেশীক্ষণ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। মাথার ঘোমটা ক্রমশঃই হ্রাস হইতে থাকে এবং দুই একটি কথাও তাঁহাকে বলিতে হইয়াছে। স্বামীর কথাটায় পূর্ণচ্ছেদ পড়িতেই তিনি তাহার জেরটুকু টানিয়া কহিলেন—উনি ত কংগ্রেসের একজন নামজাদা লীডার ছিলেন শুনিচি। কংগ্রেসের কি একটা উৎসবে ওঁরই হাতে তৈরী দেড়হাজার ভলনটিয়ার যে-মিলিটারী কুচকাওয়াজ করেছিল, তাতে ওঁর সুখ্যেতে কংগ্রেসের কর্ত্তাদের মুখে নাকি লাল পড়েছিল। হঠাৎ কি এমন অপরাধ উনি করলেন যে নাম কাটা গেল ?

রামসদয়—সে অনেক কথা। একটা মিটিংএ উনি নাকি বলেছিলেন—স্বদেশী আন্দোলনের সময় যাঁরা ছিলেন কংগ্রেসের নেতা, তাঁদের তুলনায় এখনকার নেতারা বামনের চেয়েও ক্ষুদ্র, এ অবস্থায় এঁদের দৃষ্টি কি করে বড় হতে পারে ? আগেকার নেতারা সমস্ত ভারতবর্ষের স্বার্থ তন্ন তন্ন করে দেখতেন, আর এঁদের নজর শুধু নিজের নিজের স্বার্থে। বাস্—এইটি হল সূত্র, এ ছাড়া আরো অনেক ব্যাপার আছে।

সুহাসিনী —উনি কিন্তু খুব পষ্ট কথাই বলেছিলেন।

জাহ্নবী—হ্যাঁ, জলে নেমে কুমীরের পানে তাকিয়ে দাঁতটি শুধু খিঁচিয়েছিলেন,—তাই এই শাস্তি। এই কুমীরের তাঁবেয় যাবার জন্যে

দেশের লোকগুলোর কি ছটফটানি! একটু বেঁফাস কথা কয়েছ কি, মরেছ।

সুহাসিনী—যাক্, কংগ্রেসের সঙ্গে এঁর যখন আর সম্বন্ধ নেই, তখন আর ওঁর ওপর পুলিসেরও নজর নেই নিশ্চয় ?

রামসদয়—আপনি ত ষ্টেসনের ওয়েটিং রুমে বসেই সে পরিচয় পেয়েছেন। কংগ্রেস এঁকে ছাড়লে কি হবে, ঐ ছোঁড়াগুলো কি ওঁকে নিষ্কৃতি দেবে ভেবেছেন ? যত সব পাজী ডানপিটে নিয়ে ওঁর কারবার। হতভাগারা আর এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে—

জাহ্নবী ও সুহাসিনী উভয়েই যুগপৎ বক্তার দিকে চাহিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে প্রশ্ন সূচিত হইতেছিল।

রামসদয় কহিলেন,—ডোমিসাইল সার্টিফিকেট নিয়ে বাঙ্গালীরা যে অ্যাজিটেশন্ তুলেছে, মিষ্টার মিত্রই যে এখন সেটাকে চালাচ্ছেন। ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়েছে। একটা আলাদা ইউনিভারসিটী ফাঁদবার চেষ্টাও চলেছে। কংগ্রেস থেকে ছাড় পেয়ে এখন এতেই মেতেছেন।

জাহ্নবী—বুঝিছি, প্রফেসারীটাও এবার হারাবেন, আর মেয়েটাকে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবেন। চুলোয় যাক, যা ইচ্ছা করুন গে, এ সব কথায় আমাদের না থাকাই ভালো।

সুহাসিনী—মেয়েটার মুখখানা দেখলে কিন্তু মায়া হয়। আহা—মা নেই, বয়েসও ত কম হয়নি। অথচ উনি ত দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, এদিকে নজর ত নেই !

কথাটায় কেহ কোন রূপ মন্তব্য করিলেন না, কাজেই আর এ সম্পর্কে কথা উঠিল না।

পরদিন অনেক বেলাতে দুর্গার হাঁক-ডাকে এই পরিবারটির নিদ্রা.ভঙ্গ হইল। ইতিমধ্যে রামসদয় বাবু দুইবার খোঁজ লইয়া গিয়াছেন, তৃতীয়বার আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, বসিবার ঘরখানিতে বসিয়া আছে গত রাত্রে ষ্টেশনে দেখা অপূর্ব্ব সুন্দরী সেই মেয়েটি—অধ্যাপক যদুপতির কন্যা, জাহ্নবীর ভ্রাতুষ্পুত্রী।

রামসদয় বাবুকে দেখিয়াই দুর্গা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, হাত দুখানি যোড় করিয়া নমস্কার করিল; তাহার পর মুখখানি হাসিতে ভরাইয়া কহিল,—আমি শুনেছি, আপনি দু-দুবার এসে এঁদের কুম্ভকর্ণের ঘুম দেখে ফিরে গেছেন, জাগাতে আর ভরসা করেন নি।

রামসদয় বাবু সস্নেহে মেয়েটিকে বসাইয়া ও নিজে আর একখানি চেয়ারে বসিয়া হাসিমুখে কহিলেন—অথচ আমাদের সকলকেই রাত জাগতে হয়েছিল। তাছাড়া তুমি আসছ সেই বাঁকীপুর থেকে। এখনও বোধ হয় ওঠে নি ?

দুর্গা তাহার চোখের সুশ্রী ভুরু দুটি নাচাইয়া কহিল,—আপনি ত জানেন কাকাবাবু, কেমন বাপের আমি মেয়ে,—না জাগিয়ে ঠায় বসে থাকব আমি ? খেপেছেন। হুড়মুড় করে ওপরে উঠে তাড়াহুড়ো দিয়ে সবাইকে জাগিয়ে তুলিছি, হাতমুখ ধুয়ে সব আসছেন।

একটু পরেই জাহ্নবীর পিছু পিছু সকলেই ঘরখানির ভিতরে প্রবেশ করিলেন। রামসদয় বাবুর ব্যবস্থায় ঘরে বসিবার অনেকগুলি আসন ছিল। ওদিকে চায়ের সাজসরঞ্জাম লইয়া বিহারী বেয়ারাও অপেক্ষা করিতে-ছিল। রামসদয় বাবুর ইঙ্গিতে চা ও খাবার আসিয়া পড়িল। তিনি একটু হাসিয়া কহিলেন—খেতে খেতেই গল্প চলুক।

দুর্গা এই সময় রামসদয় বাবুকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—আপনি যখন

আমার কাকাবাবুর বন্ধু, আমারও তাহলে কাকাবাবু। তাই ভরসা করে একটা আবদার নিয়ে এসেছি।

রামসদয় বাবু কহিলেন—তোমার বাবাকেও আমি তাই দাদার মতনই শ্রদ্ধা করি মা-লক্ষ্মী, যদিও ঘনিষ্ঠতা হয়নি তোমাদের সঙ্গে ; কিন্তু আমাকে পর ভেবো না—

দুর্গা কহিল—পর ভাবলে কি আবদারের কথা তুলতে পারি কাকাবাবু ? আপনার লোকের কাছেই ছেলেমেয়েরা আবদার করে। আমার কথা এই যে কাকাবাবু, যাঁদের চোখেও কোনদিন দেখিনি, অথচ যাঁরা আমার অতি আপনার—তাঁদের হঠাৎ পেয়ে আমি যেন বত্তে গেছি। কিন্তু এঁরা এখন আপনার অতিথি। আমার যত আপনারই এঁরা হোন, আপনার অনুমতি না নিয়ে আমি এঁদের কোন অনুরোধ করতে পারি না, আর তা উচিতও নয়। তাই আপনার কাছেই প্রার্থনা করছি—যে কটা দিন কাকাবাবুরা পাটনায় থাকবেন, আমাদের বাসাতেই—

জাহ্নবী কহিলেন—এই জন্যই বুঝি সকাল হতে না হইতেই ছুটে এসেছ এখানে ?

দুর্গা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া তাহার আগের কথাটাই এই বলিয়া শেষ করিল—আপনার অনুমতি না নিয়ে আপনার অতিথিদের আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবার স্পর্দ্ধা আমি করতে পারি না। তাই আমার প্রার্থনাটুকু আপনাকে জানালুম।

রামসদয় বাবু কহিলেন—এতে তাড়াতাড়ি করবার ত কিছু নেই মা-লক্ষ্মী, জাহ্নবীত দিন কতক থাকবেই। তাছাড়া আমারও অনেকদিনের ইচ্ছা—একবার সপরিবার ও আসে, আর আমি যথাসাধ্য ওদের পরিচর্য্যা করি। আর সে ব্যবস্থা সবই যে .আগে থাকতে করা হয়েছে, সে ত দেখতেই

পাচ্ছ। বেশ ত, তুমি ওঁদের একদিন নিয়ে যেও; তা-ছাড়া আমার মনে হয়—তুমি না এলেও এঁরা তোমাদের বাড়ীতে নিশ্চয়ই একদিন যেতেন।

দুর্গা বলিল—তাহলে আজই আমি এঁদের নিয়ে যেতে চাই কাকাবাবু, এখনই।

ঈষৎ হাসিয়া রামসদয় বাবু কহিলেন—এত তাড়াতাড়ি কেন মা-লক্ষ্মী, আজই ত আর ওঁরা চলে যাচ্ছেন না?

দুর্গা কহিল—কিন্তু আমরা যে কালই বাইরে চলে যাচ্ছি কাকাবাবু, সেই জন্যই আজ নিয়ে যেতে চাইছি।

জাহ্নবী এই সময় প্রশ্ন করিলেন—বাইরে কোথায় যাবে?

দুর্গা উত্তর দিল—শোনপুরের মেলায়। সেখানে বাঙ্গলা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্প পড়েছে। প্রায় একটি মাস সেখানে আমাদের কাজ চলবে।

জাহ্নবী—কাজটা কি?

দুর্গা—আপনি কি শোনেনি কাকাবাবু, বিহারের বুকের ওপর বাঙ্গলা ইউনিভার্সিটির গোড়া পত্তন হয়েছে। ভারতবর্ষের আশী নব্বই লক্ষ লোকের সমাগম হয় ঐ মেলায়। বিদেশ থেকেও যে সব বিখ্যাত লোক এসে থাকেন, তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। তাঁদের ভেতর ইউনিভারর্সিটির উদ্দেশ্য প্রচার করা হবে।

জাহ্নবী—প্রয়োজন? পাটনা ইউনিভারর্সিটির দরজা কি বন্ধ হয়ে গেছে, যে আর একটা ইউনিভার্সিটি খোলবার জন্যে তোড়জোড় চলেছে?

দুর্গা—পাটনা ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়নি, তবে বাঙ্গালী জাত আর বাঙ্গলা ভাষা যাতে সেখানে সেঁধুতে না পারে—তার জন্যে বেড়া বাঁধা হচ্ছে!

রামসদয় বাবু এবার মুচকি হাসিয়া কহিলেন,—পাটনায় যে তোমাদের ক্যাম্প পড়েচে, পবলিসিটির রীতিমত তোড়জোড় চলেচে, সে খবর আমি রাখি মা-লক্ষ্মী! কিন্তু তোমাদের মন যখন ঐ দিকেই এখন পড়ে আছে—সবাই চলেছ হরিহরছত্রের মেলায়, তখন তোমার কাকাবাবুদের বাঁকীপুরের বাসায় নিয়ে যাবার আকিঞ্চনটা কি একটু অশোভন হচ্ছে না মা-লক্ষ্মী?

দুর্গা কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—আপনার জেরাটার কিন্তু মানে হয় না কাকাবাবু! বাঁকীপুরের বাসায় যদি কাকীমার পায়ের ধুলো পড়ে, তিনি সেখানে নিশ্চয়ই অতিথির মত আরাধ্য হয়ে থাকবেন না—আমার মায়ের মতই কর্ত্তৃত্ব করবেন। আমি আর আমার বাবার অভাবে বাঙ্গলা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পে ক্ষতি কিছু হত না, আমাদের মত অনেক কর্ম্মীই সেখানে আছেন।

রামসদয় বাবু কথাটা গায়ে না মাখিয়া কহিলেন—আমি ঠাট্টা করেই কথাটা বলেছিলুম। সত্যই ত, এঁরা ওখানে থাকলে তোমরা যে, সব কাজ ফেলে এঁদের আদর যত্ন করবে, তাতে আর কথা কি? যাই হোক, আমার মনে হয়—এবার যখন এঁরা আমার অতিথি হয়েছেন, এঁদের পরিচর্য্যার সুযোগটুকু আমি ছাড়ছি না মা-লক্ষ্মী! হ্যাঁ, তবে তুমি আজ এঁদের নিয়ে যেতে পারো। এবেলা তোমাদের ওখানেই না হয় খাওয়া দাওয়া করবেন, সন্ধ্যার আগেই এখানে ফিরবেন।

প্রস্তাবটা কিন্তু জাহ্নবীর মনঃপুত হইল না, তিনি একটু উদ্বিগ্নভাবেই কহিলেন—আজ কি করে হবে? বেলা দেড়টায় আমাদের কনফারেন্স।

দুর্গা হাসিয়া কহিল,—কিন্তু আমরা কি আপনাকে বাবার ব্যায়াম-শালায় কয়েদ করে রাখব কাকাবাবু, যে ঠিক সময়ে কনফারেন্সে হাজীর হতে বাধবে? খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে অন্ততঃ বিশ মিনিট জিরিয়ে একটার

আগেই যাতে আপনি কনফারেন্সে পৌঁছতে পারেন, সে ব্যবস্থা করবার ভার আমি নিলুম,—কাকাবাবু সাক্ষী রইলেন।

ইহার উপর আর কথা চলিল না। পনের মিনিটের মধ্যেই জাহ্নবীকে সপরিবার দুর্গার সহিত তাহাদের বাঁকীপুরের বাসার উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইল।

কিন্তু দুর্গাদের বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিতেই যে তরুণ দলটি তাঁহাদের অভ্যর্থনায় ছুটিয়া আসিল, তাহাদের পরিচিত মুখগুলি জাহ্নবী ও তাঁহার পত্নী সুহাসিনীর চোখের উপর কালো রঙের একটা কদর্য্য পরদা যেন প্রসারিত করিয়া দিল। ইহাদিগকেই গত রাত্রিতে ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে দেখা গিয়েছিল এবং ইহাদের দলপতি স্থানীয় সেই অশিষ্ট ছেলেটি—যাহার উদ্ধত ও নির্ভীক আচরণ জাহ্নবী ও তাঁহার পত্নীর দেহে কাঁটার মত তখন পর্য্যন্ত বিঁধিয়া ছিল, সেই ছেলেটিই যুক্ত হাত দুইখানি কপালের দিকে তুলিয়া সহাস্যে কহিল—কাল তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছে মাপ চাইবার সুযোগটুকু আর পাইনি, তাই আমরা দল-বেধে দাঁড়িয়ে আছি—

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জাহ্নবী এই ছেলেটির পানে একবার চাহিলেন, তাহার পর মুখখানা ফিরাইয়া উপেক্ষার সুরে কহিলেন,—কোন দরকার নেই তার।

প্রতাপ দমিল না, পুনরায় কহিল--কিন্তু আমরা যে একটা অস্বস্তি বোধ করছি স্যার।

জাহ্নবী গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করিলেন—কেন?

প্রতাপ কহিল—আমাদের জন্য আপনাদের অনেক অসুবিধা হয়েছিল, আপনিও যে খুসী হতে পারেন নি, বিরক্ত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই; তাই—

জাহ্নবী—এখন স্তব স্তুতিতে প্রসন্ন করতে চাও ?

প্রতাপ—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই। শ্রদ্ধাভাজন লোকের প্রতি যদি কথায় বা কাজে অশিষ্ট আচরণ কিছু করা হয়, তাহলে স্তব স্তুতি ছাড়া তাঁকে প্রসন্ন করবার আর কি রাস্তা আছে বলুন ? দেবতারাও স্তবস্তুতি শুনে প্রসন্ন হন।

জাহ্নবী—আমি দেবতা নই, পুলিশ। স্তব স্তুতিকেও আমরা ঘুষের সামীল বলে মনে করি।

প্রতাপ—শ্রদ্ধাকে যদি আপনি ঘুষের পর্য্যায়ে ফেলেন, তাহলে অগত্যা আমরা নিরস্তই হচ্ছি। আপনি আমাদের গুরুর কনিষ্ঠ, তাই—

জাহ্নবী—হ্যাঁ, তাই আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গের মত মিশতে এসেছ। কিন্তু এইখানেই তোমাদের মস্ত ভুল! আমার দাদা নামী প্রফেসর হয়েও তোমাদের নিয়ে যে ধাষ্টামো করেন, তা জানতে আমার বাকি নেই। আর আমি যে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে এই ভাবে কথা বলছি—এতেই আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

প্রতাপ—যেহেতু, আপনি পুলিশ অফিসার! কিন্তু রাগ করবেন না স্যার—একটা কথা বলি—আমরা যে আপনার স্তুতিবাদ করতে চাইছিলুম শুধু আপনি আমাদের গুরুর কনিষ্ঠ বলে, আপনার চাপরাশ দেখে নয়। গুরুকে আমরা দেবতার স্থানে বসিয়ে পূজা করি, গুরুর ভাই ব'লে—সেই ফুল আপনার পায়েও শ্রদ্ধার সঙ্গে দিতে পারি ; কিন্তু এই সম্বন্ধ অস্বীকার করে আপনি যদি শুধু পদমর্য্যাদার চাপরাস পরে আমাদের সামনে আসেন—আপনার স্থান হবে তার অনেক নীচে। দেবতার কাছে বসা ত দূরের কথা, তাঁর মন্দিরে তখন আপনার প্রবেশ নিষেধ।

ইহার পর এই অপ্রীতিকর আলোচনার এইখানেই যবনিকা ফেলিয়া

প্রতাপ তাহার দল লইয়া চলিয়া গেল, আর—জাহ্নবী সপরিবারে যদিও সারাদিনটি ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর সংস্রবে এইখানে কাটাইতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু এ বাড়ীর সংস্কার ও ভাবধারার সহিত তাঁহাদের মনোবৃত্তির সাযুজ্য না থাকায় দীর্ঘকাল পরের এই সংযোগটি গ্রন্থীবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইল না।

—পাঁচ—

দেওঘর সহরের সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ও মনোহর অঞ্চলে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাংলোখানি পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। বাড়ীখানি ছবির মত সুন্দর। খুব বড় হাতার মধ্যে বাগান, ফোয়ারা, খেলিবার জায়গা। ঘরের সম্মুখে টানা বারান্দা। দুই পাশে দুইখানি কামরা। বারান্দার পরেই সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম।

প্রত্যহ প্রাতে ড্রয়িং রুমে এই পরিবারটির চায়ের মজলিস বসে। প্রাতরাশকে উপলক্ষ করিয়া এই সময়টুকু কর্ম্মব্যস্ত পুলিশ-সুপারের পারিবারিক আলাপ-আলোচনায় অতিবাহিত হয়।

পাটনা হইতে ফিরিবার পর প্রায় পাঁচটি মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। পাটনার ঘটনাগুলি যে ইঁহাদের প্রীতিকর হয় নাই, বাঁকীপুরের বাসার কার্য্যধারা একেবারেই যে এই পরিবারটির প্রকৃতিবিরুদ্ধ—প্রাতরাশের আসরে বসিয়া প্রায়ই সে সম্বন্ধে আলোচনা হইত।

সুহাসিনী প্রায়ই দুর্গার সম্বন্ধে নানারূপ রূঢ় আলোচনা করিতেন, তিনি স্বামীকে বুঝাইতে চাহিতেন—মেয়েটার রূপের যে রকম চটক আছে, আর পড়াশুনা যতখানি, সে অনুপাতে আক্কেল বিবেচনা একবারে নাই বললেই হয়। শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে ওকে মানুষ করা যেত, কিন্তু বাপের আস্কারা পেয়ে আর পাঁচজন বদ ছোকরার পাল্লায় পড়ে—বয়ে যাবার যো হয়েছে।

জাহ্নবীর যত কিছু রাগ সেই গুণ্ডার মত ষণ্ডা অশিষ্ট যুবা প্রতাপের উপর। তিনি বলিতেন—যত নষ্টের গোড়া হচ্ছে ঐ পাজীটা। দাদার

ওর ওপর অখণ্ড বিশ্বাস। কিন্তু আমার মনে হয়—ওটা বদমাসের ধাড়ী। ওকে সরাতে পারলেই দুর্গা বেঁচে যাবে। মেয়েটাকে কিন্তু আমার মন্দ মনে হয় না।

ছেলে মেয়ের মুখে কিন্তু দুর্গার সুখ্যাতি আর ধরে না। তাহারা বলে—দুর্গাদিদি যদি আমাদের কাছে থাকত, কি মজাই হত তাহলে।

বাঁকীপুরে দুর্গার সহিত সন্তোষ ও সুষমার ভারি ভাব হইয়া গিয়াছে। কাজেই দিদির কথা উঠিলেই ইহারা আহ্লাদে আটখানা হইয়া উঠে।

সেদিন প্রাতে ড্রয়িং রুমে বসিতেই জাহ্নবী একখানি জরুরী তার পাইলেন। তার পাঠাইয়াছে দুর্গা। তারের সংবাদ জাহ্নবীকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিল।

দুর্গা তারে জানাইয়াছে—

কাকাবাবু! বাবা মৃত্যুশয্যায়। আপনার প্রতীক্ষায় বুঝি প্রাণটুকু কোনরকমে জোর করে ধরে রেখেছেন, তার পেয়েই আসবেন।

এ আহ্বান কর্ত্তব্যনিষ্ঠ জাহ্নবী উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ট্রেণের বিলম্ব থাকায় টানা মোটরেই পাটনায় যদুপতির বাসায় উপস্থিত হইলেন। দেউড়ির ভিতর ঢুকিতেই তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, দাদার যে সহযোগীর দল এই বাড়ীটাকে অতিথিশালা করিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহারাই তাহাকে হাসপাতালে পরিণত করিয়াছে। কেহ করিতেছে বরফের তদ্বির, কেহ আইস-ব্যাগে ভরিয়া বরফ ভিতরে যোগান দিতেছে, বাহিরের টানা বারান্দাটির সর্ব্বত্রই ঔষধ ও পথ্যের বিবিধ নিদর্শন সুস্পষ্ট।

জাহ্নবীকে দেখিয়াই ছেলেরা দাঁড়াইয়া উঠিয়া সসম্ভ্রমে নতমস্তকে অভিবাদন জানাইল। জাহ্নবী তীক্ষ্নদৃষ্টিতে একটিবার তাহাদের দিকে চাহিয়াই

ভিতরে ঢুকিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল—একদল স্বভাবদুর্ব্বৃত্ত কয়েদীর ভিতর দিয়া তিনি যেন জেলখানার অফিসে জেলারসাহেবের সহিত দেখা করিতে চলিয়াছেন!

প্রশস্ত একখানি ঘরে খাটের উপর পরিচ্ছন্ন শয্যায় যদুপতি নিমিলীত নেত্রে শুইয়া আছেন। দুর্গা শিয়রে বসিয়া মাথায় আইস-ব্যাগ দিতেছে; পায়ের দিকে দাঁড়াইয়া পাঞ্জাবী প্যাটার্ণের একটি ছেলে তাহার বলিষ্ঠ দুটি হাতে রোগীর পদসেবা করিতেছে। এই লম্বাচওড়া গুণ্ডাকৃতি ছেলেটিকে দেখিয়াই জাহ্নবীর চোখ দুটি ক্রোধে ও বিরাগে ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু এক সেকেণ্ডের মধ্যেই মনের এই বিক্ষোভটুকু সামলাইয়া লইয়া মুখে উদ্বেগ ও চিন্তার চিহ্ন ফুটাইয়া জাহ্নবী দুর্গার দিকে চাহিলেন।

কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের পূর্ব্বেই দুর্গা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল—এসেছেন কাকাবাবু, বাঁচলুম! আমি খালি আপনার কথাই ভাবছিলুম—

জাহ্নবী আর্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি কাণ্ড? অসুখটা কি?

প্রশ্নের উত্তর দিলেন রোগী নিজে। চোখদুটি মেলিয়া অনুজের দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—হার্ট আর ব্রেণের ট্রাবল, বাইরে থেকে ধরবার যোটি নেইরে ভাই, আর ডাক্তারদের সাধ্যও নেই যে সারায়।

—কে দেখছেন?

—সবাই। আমাদের হরি ডাক্তার থেকে আরম্ভ করে সিভিল সার্জ্জন পর্য্যন্ত বাদ কেউ পড়েনি। কিন্তু মজা এই, রোগটা যে আসলে কি, সেইটিই কেউ দেখতে পাননি। যাক্—তোমাকে পেয়ে আমি এখন নিশ্চিন্ত হলুম। কথা কিছু আছে। তুমি কাপড়চোপড় ছেড়ে, হাত মুখ ধুয়ে কিছু মুখে দিয়ে এসো। দুর্গা, কাকাবাবুকে নিয়ে যাও মা—

জাহ্নবী বলিলেন,—আমি টানা মটরে এসেছি, কষ্ট কিছু হয়নি, খেয়েই বেরিয়েছি। আমার জন্য ব্যস্ত হবার দরকার নেই। দুর্গা, তুমি বরং খেয়ে দেয়ে নাও মা, আমি এখানে বসছি ততক্ষণ—

যদুপতি কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—কাকা বাবু যা বলছেন তাই কর মা! স্নান করে কিছু মুখে দিয়ে এসো।

দুর্গা আস্তে আস্তে নামিয়া প্রথমে হেঁট হইয়া জাহ্নবীকে প্রণাম করিল, পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। তাহার পর ছেলেটির দিকে চাহিয়া দিব্য সহজ ও সপ্রতিভ কণ্ঠে বলিল,—প্রতাপ বাবু, আপনিও স্নান টান সেরে নিন,—বেলাও অনেক হয়েছে, একটা বাজে।

যদুপতি বলিলেন—যাও বাবা প্রতাপ, দেরী ক'র না।

জাহ্নবী আইস ব্যাগটি লইয়া দাদার মাথার কাছে বসিলেন। যদুপতি বলিলেন,—স্বাস্থ্যরক্ষার এত বড় পাণ্ডাটাকেও জটিল ব্যাধির নাগপাশে ভগবান এমন করে বেঁধেছেন যে নিষ্কৃতির কোন রাস্তাই তার নেই। তাই তোমাকে না ডেকে আর পারিনি। ছাড়াছাড়ি হয়ে দুভাই যত তফাতেই থাকিনা কেন, এখন কেবলই মনে হচ্ছে—আমার অবর্ত্তমানে দুর্গার আপনার বলতে, মাথার ওপর অভিভাবকের মত দাঁড়াতে তুমি ছাড়া কেউ নেই। জীবনে সঞ্চয় কিছু করতে পারিনি ভাই, তবে সান্ত্বনা এইটুকু—দুর্গাকে মনের মত করে তৈরী করতে পেরেছি, চলার পথে এগোবার মত সত্যিকার শিক্ষা ও পেয়েছে। বাকি ছিল—একটি সৎ পাত্রের হাতে তুলে দেওয়া, তা সে পাত্রও ঠিক আছে; টাকার দিকে তার টাঁক নেই মোটেই, সে দুর্গাকেই চায় এবং উপযুক্ত ছেলে, তোমাকে এদিক দিয়ে কিছু ভাবতে হবে না ভাই।

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ছেলেটি কে?

এতগুলি কথা এক সঙ্গে বলিয়া যদুপতি ক্লান্ত হইয়াছিলেন, একটু থামিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন,—তুমি তাকে আগেও দেখেছ, আর এখানে এসেও দেখেছ—যে ছেলেটি এইমাত্র উঠে গেল, নাম ওর প্রতাপ—প্রতাপ দত্ত। খাসা ছেলে। ফিজিওলজিতে এম, এ পাস করেছে, সাঁওতাল পরগণায় কিছু সম্পত্তি ওদের আছে, সব দিক দিয়েই ছেলেটি অসাধারণ ; দুর্গার যোগ্য পাত্র ভেবেই—

জাহ্নবী এইখানে জ্যেষ্ঠের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—কিন্তু ওর পদবী শুনলুম ত দত্ত। আমাদের বংশে বরাবর চলে আসছে বড় মেয়েকে কুলীনের ঘরে—

একটু হাসিয়া যদুপতি বলিলেন,—কৌলীন্যের কথা বলছ? সেদিক দিয়েও তুমি ধরে নিতে পার—প্রতাপ বল্লালী যুগের কল্পিত কুলীন নয়, এ যুগের সত্যিকার কুলীন, মস্ত কুলীন, আর এ কৌলীন্য ও উপার্জ্জন করেছে নিজের চরিত্র, বিদ্যা, বিনয়, প্রতিষ্ঠা, সাহস এবং মহত্ত্ব দিয়ে। কি বলব, সময় নেই, নতুবা আমি তোমাকে ওজন করে দেখিয়ে দিতুম প্রতাপের স্বকৃত কৌলীন্যের ভারটা কত বেশী।

জাহ্নবী মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন—বেশ, আর কি বলতে চান—বলুন।

যদুপতি বলিলেন,—বলা আমার সবই হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্ত্তেই আমার কথা বন্ধ হতে পারে, তাই এক নিশ্বেসে এতগুলো কথা তোমাকে বলে ফেলেছি। দুর্গা কাছে থাকলে মুখ চেপে ধরতো। আমার শেষ কথা—দেনাপত্র কিছু নেই, কলেজে হাজার তিনেক টাকা জমা আছে, বাড়ীতে আছে তোমার বৌদির হাজার দুই টাকার গয়না, দুর্গা তোমার একবারেই বোঝা হবে না। জানই ত বাড়ীখানা ভাড়া করা। দুর্গাকে

তোমার কাছেই নিয়ে যাবে—আর আসছে ফাগুনেই হোক বা বছর খানেক পরেই হোক তুমিই প্রতাপের হাতে দুর্গাকে সম্প্রদান করবে। আজ থেকেই তুমি হলে ভাই দুর্গার অভিভাবক।

ইহাই যদুপতির মুখের শেষ কথা,—ইহার পর আর তাঁহাকে কথা বলিতে হয় নাই। বুকের ভিতর হইতে একটা দারুন বেদনা উঠিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁহার বাকশক্তির সহিত শ্বাসযন্ত্রের গতি রুদ্ধ করিয়া দিল।

জাহ্নবী স্থির দৃষ্টিতে অগ্রজের মহাপ্রস্থান দেখিলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটি আর্ত্তস্বরও বাহির হইল না,—শুধু একবার ওষ্ঠ দুটি ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল ও সেই কম্পনের আবেগে তাঁহার মর্ম্ম দ্বারে এইরূপ একটা ধ্বনি যেন আঘাত দিল—দুর্গার জন্যই আমাকে কঠোর হতে হবে দাদা—তাকে বাঁচাবার জন্যেই। তাহার পরে নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝি আর্ত্তস্বর সবেগে নির্গত হইল—ওরে দুর্গা—ছুটে আয়, দাদা পালাচ্ছে!

জাহ্নবীর আহ্বানে দুর্গা ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া শুধু দেখিতে পাইল—মরণপথ-যাত্রীর অন্তর্নিহিত ইচ্ছাটুকু তখন দুইটি চক্ষুকে আশ্রয় করিয়া বুঝি তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে, সে দৃষ্টি কি করুণ, কি মর্ম্মন্তুদ! আর্ত্তকণ্ঠের চীৎকার তুলিয়া দুর্গা পিতার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

—ছয়—

অভিভাবকের পক্ষে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পিতৃব্যের পক্ষ হইতে তাহার কোন ত্রুটি হইল না। পাটনার পাট চুকাইয়া পিতৃহীনা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দেওঘরে আনিয়া অতি সন্তর্পণেই তিনি সংসারভুক্ত করিয়া লইলেন।

কিন্তু স্বাধীনচেতা দেশপ্রিয় যদুপতি যে আদর্শে তাঁহার এই একমাত্র সন্তানটিকে কর্ম্মক্ষেত্রে অসঙ্কোচে দাঁড়াইবার মত প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, এই পরিবারটির সহিত তাহা কিছুতেই খাপ খাইল না। তবে, অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার মত বুদ্ধির প্রভাবে দক্ষ অভিনেত্রীর মত দুর্গা নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইল। সে বুঝিয়াছিল, একটা অবলম্বন তাহার চাই-ই, ইহাদের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিতর্ক না করিয়া নীরবে সায় দিয়া চলাই বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য। তথাপি এক এক সময় পিতৃব্যের ঔদ্ধত্য এবং তাহার পিতার গুণমুগ্ধ ভক্তদের প্রতি তাঁহার অবিচার তাহাকে যেন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্যের হৃদয়হীন আচরণের কথা সে ভুলিতে পারে নাই, কাঁটার মত তাহার কোমল মনটিতে যেন বিঁধিয়া থাকিত ও এক এক সময় বেদনায় খচ-খচ করিয়া উঠিত।

যদুপতির মৃত্যুর পর যে কয়দিন জাহ্নবী পাটনায় ছিলেন, জ্যেষ্ঠের ভক্তবৃন্দের সহায়তা সর্ব্বতোভাবেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গগতের গুণমুগ্ধ উক্ত স্বদেশী দলটি এই দাম্ভিক মানুষটির নিকট প্রীতিসূচক কোন ব্যবহারই পায় নাই। এমন কি, প্রতাপ নামক যে ছেলেটির সম্বন্ধে তাঁহার অগ্রজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্বেও তাঁহার আন্তরিকতার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, জাহ্নবীর পরবর্ত্তী আচরণে প্রকাশ

পায় যে, এই ছেলেটি যেন তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং একান্ত পরিত্যজ্য। পাটনা হইতে বিদায় লইবার সময় সাশ্রুলোচনে দুর্গা যখন হাত দুইখানি কপালে ঠেকাইয়া আদ্রকণ্ঠে প্রতাপকে অনুরোধ করে—দেওঘরে যাবেন. কিন্তু প্রতাপ বাবু, বাবা নেই ব'লে যেন ভুলে-যাবেন না!—তখন জাহ্নবীর মুখখানা-যে বিরক্তিতে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দুর্গার দৃষ্টি এড়ায় নাই।

মাস তিনেক পরে সেই প্রতাপ একদিন হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল জাহ্নবী মিত্রের বাংলোয়। জাহ্নবী সে সময় গৃহিণী সুহাসিনীকে লইয়া মীনাবাজারে গিয়াছিলেন। কতকগুলি জিনিষপত্র কিনিবার প্রয়োজন ছিল, সুহাসিনীর ইচ্ছা নিজেই পছন্দ করিয়া কিনিবেন। সাত বছরের ছেলে সন্তোষ ও পাঁচ বছরের মেয়ে সুষমা দুর্গার তত্ত্বাবধানে বাড়ীতেই ছিল। ছেলে ও মেয়ে বাহিরের প্রাঙ্গণে খেলিতেছিল। সেই সময় প্রতাপের আবির্ভাব।

দুর্গা তখন ড্রয়িংরুমে বসিয়া একখণ্ড কার্পেটের উপর বৈদ্যনাথের মন্দির তুলিতেছিল, এমন সময় সুষমা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল,—দিদি, তোমার একটি বন্ধু এসেছে।

কৌতূহলী-দৃষ্টিতে চাহিয়া দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল,—আমার আবার বন্ধু কে?

সুষমা বলিল,—বা-রে, সেই যে পোতাপ বাবুর গপ্প বলতে না—এসেছে, আমাদের বাড়ীতে, তুমি শীগ্‌গীর এসো—

দুর্গার বুকের ভিতরটা যেন গুমরিয়া উঠিল, আনন্দে কি আতঙ্কে—কে বলিবে! ক্ষণকাল সে চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর হাতের কার্পেটটি লইয়াই সে উঠিপড়ি অবস্থায় পরদা ঠেলিয়া বাহিরে ছুটিল।

প্রতাপ ইতিমধ্যেই সন্তোষের সহিত ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছিল এবং

বাংলোর উপস্থিত বৃত্তান্তটি মোটামুটি জানিয়া লইয়া বলিতেছিল,—তাহলে বাড়ীতে তোমার দিদিই এখন একলা আছে ?

• হ্যাঁ, বলিয়া সন্তোষ বোধ হয় দিদির বন্ধুটিকে সন্তুষ্ট করিতে আরও কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিল, -কিন্তু এই সময় ড্রয়িংরুমের দরোজার দিকে নজর পড়িতেই সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল,—ঐ যে দিদি এসেছে। তারপর প্রতাপের হাতখানা ধরিয়া দুর্গার দিকে চাহিয়া বলিল,—দিদি, দেখ কে এসেছে--তোমার গল্পের প্রতাপ বাবু। কি মজা !

দুর্গা আরক্ত মুখখানা নত করিয়া প্রতাপকে প্রণাম করিল, তাহার পর চোখ দুটি তুলিয়া অভিমানের সুরে বলিল,—তবু ভালো, মনে পড়েছে।

সন্তোষকে দুইহাতে জড়াইয়া প্রতাপ উত্তর দিল,—আমাকে যে গল্পের বিষয়বস্তু করে রেখেছ—সে পরিচয় কিন্তু এসেই পেয়েছি দুর্গা। তবে মনে রাঁখার কথা যা বলছ, তার উত্তর এই—অযাচিতভাবে আসবার সাহস-টুকুই কি সাক্ষ্য দিচ্ছে না—ভুলতে আমি পারিনি বলেই এসেছি ?

দুর্গার সুন্দর মুখখানা মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সম্বরণ করিয়া বলিল,—বাবা যেমন কাকাবাবুর হাতে আমার ভার দিয়ে ওপারে চলে গেছেন, কাকাবাবুও তেমনি ঘণ্টাদুয়েকের মত আমার ওপর তাঁর কর্ত্তব্যের ভারটুকু ছেড়ে দিয়ে কাকিমাকে নিয়ে বেরিয়েছেন। কাজেই, অতিথিকে আমি সাদর অভ্যর্থনাই জানাচ্ছি—আপনি আসুন।

কথায় বলে—যে মেয়ে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে। প্রতাপকে ড্রয়িংরুমে বসাইয়া যথাবিহিত পরিচর্য্যা ও আলাপ আলোচনার ভিতরেই দুর্গা কাকিমা প্রদত্ত রন্ধনশালার কাজগুলিও এমন তৎপরতায় সারিয়া ফেলিল যে, প্রতাপের মনে ঐ প্রবচনটাই বার বার ধাক্কা দিতে লাগিল। দুর্গা গল্প করিতে করিতেই হাতের কাজগুলি একটি একটি করিয়া শেষ করিল এবং

অতিথির প্রতি তাহার কর্ত্তব্য পালনেও কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না, যে প্রাতরাশ পথশ্রান্ত অতিথির জন্য সে স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিল, প্রতাপ পুলকবিস্ময়ে ভাবিয়া দেখিল—প্রত্যেক খাদ্যটি তাহার অতিবাঞ্ছিত! দুর্গা তাহার প্রত্যেকটি মনে করিয়া রাখিয়াছে।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে সস্ত্রীক জাহ্নবী যখন ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিলেন, ছোট একখানা টেবিলকে মধ্যে ব্যবধান রাখিয়া দুটি তরুণ-তরুণী মুখোমুখী বসিয়া আছে, উভয়েরই মুখ আরক্ত, চক্ষুগুলি বাষ্পাচ্ছন্ন।

সন্তোষ ও সুষমা এ সময় বাহিরে ছিল, সুতরাং প্রতাপের উপস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়াই ইঁহারা ঘরে ঢুকিয়াছিলেন।

গৃহস্বামীকে দেখিয়াই প্রতাপ সবেগে সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং দুই হাত যোড় করিয়া অভিবাদন জানাইল। দুর্গাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া মুখে হাসি আনিয়া কহিল,—কাকাবাবু, আপনারা বেরুবার পরই ইনি এসেছেন।

মুখখানা রীতিমত গম্ভীর করিয়া এবং অস্ফুট হুঙ্কারের অনুরূপ শুধু একটি 'হুঁ' বলিয়া জাহ্নবী ভিতরে চলিয়া গেলেন।

এ অবস্থায় কোন রকমে আত্ম-সম্বরণ করিয়া দুর্গা কাকিমার দিকে চাহিয়া বলিল,—কাকিমা, প্রতাপবাবু—

কটমট-দৃষ্টিতে একবার প্রতাপের মুখের দিকে চাহিয়া কাকিমা বলিলেন,—জানি। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলেকে জলটল কিছু খাইয়েছ, না সেই অবধি গল্পই চালিয়েছ?

দুর্গা মুখখানি নীচু করিয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল,—চা জলখাবার উনি খেয়েছেন কাকিমা।

প্রতাপ এই সময় কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া সুহাসিনীকে গড় করিল। কাকিমা দুই পা পিছাইয়া গিয়া বলিলেন,—থাক্ থাক্, জানা নেই শোনা

নেই, যার তার কাছে মাথা হেঁট করা ঠিক নয়! আচ্ছা—তুমি বাইরে গিয়ে ব'স ; এই সন্তু, একে বাইরের ছোট ঘরখানা দেখিয়ে দে'ত—বলিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

দুর্গা ও প্রতাপ দুজনেই স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। দুর্গার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ।

সন্তোষ এই সময় প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা দিদি, প্রতাপবাবু আসতে তুমি কত আহ্লাদ করলে, আর বাবা মা অমন বেজার হলেন কেন?

দুর্গা সন্তোষের কথার কোন উত্তর না দিয়া প্রতাপের দিকে চাহিয়া আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল,—প্রতাপ বাবু!

সহজকণ্ঠে প্রতাপ বলিল,—কেঁদো না দুর্গা, ছি! আমি জানি উনি আমার প্রতি বরাবরই বিরূপ, জেনেও পীঠে গণ্ডারের চামড়া বেঁধে আমি এসেছি এখানে দুর্গা,—তোমার বাবার ইচ্ছা ত আমার অজ্ঞাত নয়, আর আমি জানি—তোমার বর্ত্তমান অভিভাবকও সব জানেন। আমি এসেছি এর হেস্ত-নেস্ত করতে।

জাহ্নবী এই সময় কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রশ্ন তুলিলেন,—তুমি কোথায় উঠেছ হে?

প্রতাপ উত্তর দিল,—ধর্ম্মশালায়।

জাহ্নবী কর্কশকণ্ঠে কহিলেন,—আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পার। দুর্গা, তুমি ভেতরে যাও, এঁরা ডাকছেন।

প্রতাপের দিকে নীরবে একবার চাহিয়া দুর্গা ধীরে ধীরে ভিতরে চলিয়া গেল।

প্রতাপ মনের সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,—আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। এইজন্যই এখানে আমার আসা।

রুক্ষস্বরে জাহ্নবী বলিলেন,—সেটা আমারও জানা আছে। কিন্তু কথাটা তোলা নিষ্প্রয়োজন। তুমি ও দুরাশা ত্যাগ কর। একটা মার্কামারা বদ্‌মাসের হাতে পুলিশ-সুপার জাহ্নবী মিত্র তার ভাইঝিকে তুলে দেবে না।

—মার্কামারা বদমাস! আপনি কি প্রকৃতিস্থ আছেন স্তর!

—সাট্-আপ ইয়ু ব্রুট্—গেট আউট, গেট আউট্—মিছির—

ভিতর হইতে সুহাসিনী, দুর্গা, পাচিকা, পরিচারিকা এবং বাহির হইতে দেহরক্ষী মিশ্রজী ও আরও কতিপয় ভৃত্য ছুটিয়া আসিল।

জাহ্নবী তাঁহার দেহরক্ষীর দিকে চাহিয়া হুকুম দিলেন,—কাণ পাকাড়কে ইস্ উল্লুকো বাহার নিকাল দো।

প্রতাপের ব্যায়ামপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহটা তখন ফুলিয়া দ্বিগুণ হইয়াছে; দেওঘর পুলিসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহসী ও শক্তিমান পলোয়ান মিশ্রজীরও সাহস হইল না যে, এই অসাধারণ মানুষটির কাণ পাকড়াইয়া বাহিরে লইয়া যায়। কয়েক মাস পূর্ব্বে পাটনা ষ্টেসনে এই লোকটাই যে তাহাকে তুলার বস্তাটির মত তুলিয়া তাহার হুজুরের বিছানার বস্তার উপর ফেলিয়া দিয়াছিল, সম্ভবত, তাহা সে ভুলে নাই। বাবুর কথিত উল্লুকটির পথরোধ করিয়া সে দাঁড়াইল মাত্র।

প্রতাপ সংযতকণ্ঠে কহিল,—দেখুন, পুলিশের মার্কা আপনার সর্ব্বাঙ্গে থাকলেও—যে মহাপুরুষ আপনার জ্যেষ্ঠ—তাঁর স্মৃতির দিকে চেয়ে ভাবতুম যে, আপনার ভেতরটায় বাইরের ছাপ পড়েনি। কিন্তু এখন দেখছি —আমার অনুমানটা ভুল হয়েছে। তবে আপনার ভুলও একদিন ভাঙ্গবে। কথাটা শেষ করিয়াই সে মিছিরজীকে দুই হাতে তুলিয়া লুফিবার মত করিয়া পাথরের মোটা টেবিলটার উপর বসাইয়া দিল, পরক্ষণে জাহ্নবীর উদ্দেশ্যে হাতখানি কপালে ঠেকাইয়া সবেগে বাহির হইয়া গেল।

সকলেই অবাক। আড়ষ্ট দেহটাকে নামাইয়া প্রভুকে তুষ্ট করিতে মিছির হুঙ্কার তুলিয়া বাহিরে ছুটিল।

গৃহিণী ও দুর্গার পানে চাহিয়া জাহ্নবী কহিলেন,—যে রাস্কেলগুলোর পাল্লায় পড়ে দাদা মেয়েটাকে পথে বসিয়ে গেছেন—এটা হচ্ছে তাদের চাঁই। আমি একে দুরস্ত করে তবে ছাড়বো।

মনের এই ঝালটুকু এই কয়টি কথাতেই প্রকাশ করিয়া জাহ্নবী নিরস্ত হইলেন না—তাঁহার বিপুল ক্ষমতা প্রসারিত করিয়া প্রতাপকে দুরস্ত করিতে তিনি যে কাণ্ড করিয়া বসিলেন, তাহাতে দেওঘর সহরটা আলোড়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রতাপ ছিল ততোধিক সতর্ক, প্রতিপক্ষের আয়োজনের ফাঁক দিয়াই সে এক সময় অতি সন্তর্পণে পুলিস সুপারের বাংলোয় ঢুকিয়া দুর্গাকে দুটি কথায় সান্ত্বনা দিয়া এমন কৌশলে অন্তর্দ্ধান করিল যে, কোন সন্ধানই তাহার পাওয়া গেল না।

যাইবার পূর্ব্বে এই নির্ভীক ছেলেটি অতর্কিতভাবে দুর্গার সহিত দেখা করিয়া যে আশ্বাস তাহাকে দিয়া যায়, তাহার মর্ম্ম এই যে,—তুমি ভেবো না দুর্গা, তোমার কাকা আমার কিছুই করতে পারবে না। তোমার বাবার আশীর্ব্বাদে দম্ভাসুরকে জব্দ করে দুর্গোৎসব আমি করবই।

—সাত—

প্রতাপকে ধরিবার জন্য দেওঘর সহর ও সন্নিহিত সকল অঞ্চল ব্যাপিয়া পুলিস ফৌজ টহল দিয়া বেড়াইতে লাগিল,—থানায় থানায় তাহার আকৃতির আভাষ দিয়া হুলিয়া বাহির হইয়া গেল, চারিদিকে রীতিমত একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল।

ঠিক এই সময় পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের আফিসে এক ভীষণ দুর্ঘটনার খবর আসিল। শুধু খবর নয়, ত্রিকূট থানার ইন্‌স্পেক্টরের লম্বা লেফাফার সঙ্গে কালো রঙের একটা হ্যাণ্ডব্যাগও পুলিস-হরকরা জাহ্নবী মিত্রের সম্মুখে দাখিল করিল। খবরটির মোটামুটি মর্ম্ম এইরূপ—

"ত্রিকূট নামক দুর্গম পাহাড়টির একটি অংশ ধ্বসিয়া পড়ায় এক দল ভ্রমণকারী তাহার চাপে এমন শোচনীয় ভাবে মারা পড়িয়াছে যে, তাহাদের দেহের সামান্য কিছু অংশ ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় নাই। দুর্ঘটনার সময় একজন সাধু অকুস্থল হইতে আন্দাজ বিশ হাত তফাতে ছিলেন, অল্পের জন্য তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দলটিতে পাঁচ কিম্বা ছয় জনের বেশী লোক ছিল না। সম্ভবতঃ ইহারা হিন্দুস্থানী, কেন না দলের সকলের মাথাতেই পাগড়ী ছিল। এই দলটির পিছনে আর একটি লোককে তিনি দেখিয়াছিলেন, সে সম্ভবতঃ বাঙ্গালী, তিনি তাহার মাথায় পাগড়ী বা কোন টুপী দেখেন নাই। লোকটি খুব লম্বা চওড়া। তাহার হাতে একটা ব্যাগ ছিল। এই লোকটি যখন খাদ পার হইতেছিল, সেই সময় পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে। লোকটি তাহাতে খাদের ভিতরে পড়িয়া যায়, কিন্তু তাহার হাতের ব্যাগটি ঠিকরাইয়া সাধু

যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার কাছাকাছি গিয়া পড়ে। ভীষণ শব্দে সাধু প্রথমটা অজ্ঞানের মত হইয়া যান। তাহার পর একটু সামলাইয়া ধ্বংসস্তূপের দিকে গিয়া দেখিতে পান, একশো হাত গভীর খাদটি পাহাড় ভাঙ্গা স্তূপে একেবারে ভরিয়া গিয়াছে, খাদের ওপারেও স্তূপের রাশি, তাহার নীচে প্রথম দলের লোকগুলি চাপা পড়িয়াছিল। শব্দ শুনিয়া একদল সাঁওতাল সেখানে ছুটিয়া আসে। সাধুর মুখে মানুষ চাপা পড়িয়াছে শুনিয়াই তাহারা খাদের অপর পার্শ্বের ধ্বসস্তূপ সরাইতে আরম্ভ করে। খাদের ভিতরে যে লোকটি চাপা পড়ে, তাহার ব্যাগটি লইয়া সাধু থানায় উপস্থিত হন ও দুর্ঘটনার খবর দেন। থানা হইতে তৎক্ষণাৎ বহু লোক অকুস্থলে গিয়া দেখিতে পায় যে, পাথরের স্তূপ সরাইয়া কয়েক টুকরা হাড়-মাংস মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ব্যাগ খুলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে, প্রতাপ দত্ত নামক যে বাঙ্গালী যুবকটির সম্বন্ধে হুলিয়া বাহির হইয়াছে, ব্যাগটি যে তাহার এবং দুর্ঘটনার সময় তাহারই হস্তচ্যুত হইয়া দূরে পড়িয়াছিল, ব্যাগের ভিতরের জিনিষগুলি হইতেই তাহা স্পষ্টভাবে জানা যাইবে। ইহাকে পরমেশ্বরের শাস্তি বলিয়াই মনে করিতে হইবে। পুলিশের নাগালের বাহিরে আসিয়াও সে নিয়তির নাগাল ছাড়াইতে পারে নাই। এমন জায়গায় সে চাপা পড়িয়াছে যে, তাহার দেহাবশেষও বাহির করিবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতেই জাহ্নবী মিত্রের চক্ষু দুটি উত্তেজনায় উজ্জ্বল হইতেছিল। তাঁহার মনে তখন এই প্রশ্নই জাগিতেছিল, যে দুরন্ত আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সমস্ত ডিষ্ট্রিক্ট তিনি তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছেন, সত্যই কি নিয়তি তাহাকে আহ্বান করিয়া ত্রিকূটের অতল-স্পর্শ খাদে এই ভাবে জীবন্ত সমাধি দিলেন!

চিঠিখানা রাখিয়া তাড়াতাড়ি তিনি ব্যাগটি টানিয়া লইলেন। ক্লিপটি টানিতেই তাহা খুলিয়া গেল। ভিতর হইতে বাহির হইল একখানি মার্কস্-এর 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' তাহাতে ইংরাজীতে লেখা আছে—প্রতাপ দত্ত, কেয়ার অফ যদুপতি মিত্র, বাঁকিপুর, পাটনা। একখানা লম্বা চওড়া তোয়ালে, তাহার কোণে লাল রঙ্গের সুতায় ইংরাজী P অক্ষরটি হাতে বুনিয়া তোলা হইয়াছে। তোয়ালের নীচে আছে একটি টর্চ্চ, চিঠির কাগজের একটা সাদা প্যাড, এক প্যাকেট খাম, আর খামে ভরা একখানা চিঠি, খামের উপর যে ঠিকানাটি লেখা আছে তাহা এইরূপ—

শ্রীমতী দুর্গা মিত্র
পুলিস সুপারের বাংলো
দেওঘর, এস, পি

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জাহ্নবী মিত্র খামের ভিতর হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। চিঠিখানি সুদীর্ঘ ও তাহার বিষয়বস্তু এইরূপ—

স্নেহের দুর্গা—

তোমার কাকা ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছেন—আমাকে জেলে পুরে তবে ছাড়বেন। এজন্য সমস্ত অঞ্চলটাই বেড়া-জালে ঘিরেচেন। কিন্তু তিনি জানেন না যে, জাল কেটে পালাবার মন্ত্র আমার জানা আছে। আমার দুঃখ হচ্ছে শুধু তোমার জন্য। হৃদয়হীন অভিভাবকের নিষ্ঠুর

আচরণ নিশ্চয়ই তোমার মনে বেদনার সঞ্চার করেছে। তোমার বাবা কি তোমার সম্বন্ধে তাঁর ইচ্ছা তোমার কাকার কাছে বলবার সুযোগ পান নি? কিম্বা তোমার কাকাটি তাঁর নির্দ্দেশ পেয়েও নিজের ইচ্ছার তালেই তাকে অস্বীকার করছেন? যদি আমার প্রথম অনুমান সত্য হয়, তাহলে অভিভাবক-রূপে তোমার কাকা তোমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করবেন, নির্ব্বিচারে তোমাকে তাই মেনে নিতে হবে, আমিও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী হব না। এক্ষেত্রে তোমার বাবার উপদেশ আমাদের উভয়-কেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে—শিক্ষা কখন বিদ্রোহকে প্রশ্রয় দেয় না, সত্যকার শিক্ষার আলোক শিক্ষিতকে দেয় সত্যের সন্ধান, স্বেচ্ছাচার তার অন্তরকে আকৃষ্ট করতে পারে না। আমরা যখন শিক্ষার অভিমান রাখি, গুরুর নির্দ্দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করব, গুরুজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাথা তুলব না। আর যদি আমার দ্বিতীয় অনুমান সত্য হয়, তাহলে আমাদের

সত্যব্রত গুরুর অন্তরের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, তোমার কাকা শত চেষ্টা করলেও তাঁর ইচ্ছা কখনই সিদ্ধ করতে পারবেন না ; কারণ, তিনিই এ-ক্ষেত্রে সত্য-ভঙ্গ করছেন। সত্যভ্রষ্টকে সত্যের সন্ধান দিতে—সত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে তখন যদি আমরা শঠতাকে অস্ত্ররূপে গ্রহণ করি, তাতে কোন অপরাধই আমাদের হবে না। এক্ষেত্রে গান্ধীর অহিংস-নীতি মেনে নিয়ে কখনই আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করব না,—সামরিক ঐতিহ্যের লীলাভূমি ভারতবর্ষে ভারতের ঋষিরা অহিংসার যে ব্যাখ্যা করেছেন, গুরুদেবের চরণ তলে বসে আমরা অহিংসার যে মন্ত্র শুনেছি—এ-অবস্থায় আমরা তারই অনু-সরণ করব। জীবনের উচ্চ আদর্শ শান্তি, সেই শান্তিই আমাদের কাম্য ; কিন্তু শান্তিরক্ষার এই অর্থ নয় যে, ক্ষমতাদর্পে নিজের খেয়াল চরিতার্থ করতে কোন স্বেচ্ছাচারী অধর্মাচারী হলে তার অনাচারের তলায় নেতিয়ে পড়ে জানাতে হবে—'দেখ আমাদের মনে মোটেই হিংসে নেই, আমরা মার খাচ্ছি,

কিন্তু মারবার জন্যে আঙ্গুলটিও তুলছি না।' একে অহিংসা বলে না—এর নাম আত্মবঞ্চনা, দুর্ব্বলতা। এ নীতি বিড়াল-তপস্বীর মর্ম্ম-কথাই মনে করিয়ে দেয়। 'মেরেছ কলসীর কানা, তা'ব'লে কি প্রেম দিব না'—অহিংসার এই খাঁটি মন্ত্র মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের মত মহাপুরুষের মুখ থেকেই বেরুতে পারে। তাঁর অহিংসা মন্ত্রের জোরে হিংস্র হিংসা ভুলে তাঁরই তরণতলে নেতিয়ে পড়ত। তাঁর অহিংসা মানেই হিংসাকে বারণ করা, পাপীকে নিষ্পাপ করে মুক্তি দেওয়া, তাঁর কাছে ছিল সবাই সমান। ভণ্ডামী ত সেখানে ছিল না। মহাপ্রভুর আসল অহিংসার নকল করে আজ দেশবাসীকে নাকাল করাই হচ্ছে। তাই গুরুদেব এর প্রতিবাদ করে এসেছেন বরাবর, তিনি বলতেন—কোন রকম দৌর্ব্বল্যকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, শান্তি ও সংগ্রাম উভয়ের জন্যই মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হবে, আত্মরক্ষার জন্য ব্যক্তিগত ও জাতিগত সামর্থ্য সঞ্চয় করা একান্ত প্রয়োজন। ছল বল কৌশল কোনটিই

উপেক্ষার বস্তু নয়, প্রত্যেকটির সার্থকতা প্রচুর। এইগুলি ভাল করে বিচার করে আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে। এক পাহাড়ের গুহায় বসে এই লম্বা চিঠিখানা তোমার জন্যে লিখেছি। ডাকে না পাঠিয়ে এমন কোন পাকাপোক্ত লোক দিয়ে চিঠিখানা পাঠাতে চাই— যাতে তোমার হাতেই ঠিক ওঠে। সে লোকের সন্ধানে চলেছি। চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে—আমার কাজ তখন সুরু হয়ে গেছে। আজ এই পর্য্যন্ত।

ইতি—

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—প্রতাপ

চিঠিখানি পড়িয়া জাহ্নবী কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। সেই স্বাস্থ্যবান হৃষ্টপুষ্ট শক্তিমান ছেলেটির অসাধারণ দেহযষ্টি তাঁহার চক্ষুর উপর যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, পরক্ষণে সেই দেহের শোচনীয় অবসানের এই নির্ঘাত প্রমাণ ক্ষণিকের জন্য তাঁহার কঠোর অন্তরের অভ্যন্তরে পিন-ফোটার মত সামান্য একটু বেদনারও অনুভূতি বোধ হয় দিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি সোজা হইয়া বসিয়া চিঠিখানার উপর পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। শেষাংশের ছত্রগুলি কি সাংঘাতিক! যদি এই বেয়াদপ আসামী সাঁওতাল পরগণার সীমারেখা অতিক্রম করিবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে—

যাক্, সে সম্ভাবনায় প্রকৃতিই শোচনীয় ভাবে যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছেন। মুখখানা প্রসন্ন করিয়া এবং জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জাহ্নবী নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন—ছোঁড়াটার অবস্থা শেষে দাঁড়ালো—From the frying pan to the fire.

—আট—

সে দিন অপরাহ্নে ড্রয়িং রুমে চায়ের টেবিলে বসিয়া সুহাসিনী সহসা স্বামীকে প্রশ্ন করিলেন—শুনছিলুম ত্রিকূট পাহাড়ে নাকি ভারি একটা য়্যাকসিডেণ্ট হয়েছে ?

জাহ্নবী পত্নীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, পাহাড় ধ্বসে পড়ায় জন কতক লোক চাপা পড়েছে।

—বল কি ! বেঁচেছে কেউ, না—

—নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ওপরে যে কটা লোক চাপা পড়েছিল, তাদের দেহাংশ কিছু কিছু পাওয়া গেছে, কিন্তু খাদের ভেতরে যে লোকটা চাপা পড়েছিল, তার হয়েছে জীবন্ত সমাধি।

—তার মানে ?

—এক শ হাত গভীর খাদ, লোকটা তার ভেতরে পড়েছে, আর হাজার মণ পাথর ভাঙ্গা স্তূপে সে খাদটার সমস্ত ভরাট হয়ে গেছে। কাজেই তার সম্বন্ধে কি আশা করা যেতে পারে ?

মুখ খানা ম্লান করিয়া এবং একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া সুহাসিনী এবার জিজ্ঞাসা করিলেন—লোকগুলো কি এদেশী ?

জাহ্নবী কহিলেন—তদন্ত চলেছে, সঠিক খবর এখনও পাওয়া যায় নি। তবে খাদের ভেতর যে লোকটি পড়েছে, সে যে বাঙ্গালী, তাতে আর সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, লোকটা একবারে আমাদের অপরিচিতও নয়। কথাটা বলিয়াই তিনি টেবিলখানার কোণের দিকে উপবিষ্ট দুর্গার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিলেন।

দুর্গা তখন চায়ের পিয়ালায় চা ঢালিতে ব্যস্ত থাকিলেও, এই সাংঘাতিক সংবাদটির দিকে তাহার চিত্ত নিবিষ্ট না করিয়া পারে নাই। পাথরের চাপে এতগুলি প্রাণীর অপমৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া কোন নারীই স্থির থাকিতে পারে না, দুর্গাও পারে নাই; বেদনাহত মুখখানি তুলিতেই কাকার বক্রদৃষ্টি তাহার চোখে ধরা পড়িয়া গেল এবং সে সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিয়া লইল যে, এই সাংঘাতিক খবরটির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ আছে। তাহার বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল, কিন্তু নারীসুলভ কৌতূহল ও ঔৎসুক্য বোধ দমন করিবার শিক্ষাটুকু তাহার আয়ত্ত থাকায় সে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। শুধু কাকার মুখের দিকে একবার চাহিয়াই, চায়ের পিয়ালাটি তাঁহার দিকে ঠেলিয়া দিল।

সুহাসিনী কিন্তু কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই অধৈর্য্যভাবে বলিয়া উঠিলেন—বল কি, চেনা লোক আমাদের! কে সে—কে?

জাহ্নবী মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিলেন—দিন সাতেক আগে যে ছোকরা এই ঘরে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধিয়ে গিয়েছিল, সেই থেকে পুলিশ যাকে ধরবার জন্যে—

চোখ দুটি কপালে তুলিয়া সুহাসিনী বলিয়া উঠিলেন—য়্যাঁ, পাটনার সেই ডানপিটে ছোঁড়াটা—সেই প্রতাপ—

দুর্গার হাত হইতে পরিপূর্ণ পিয়ালাটি নীচে পড়িয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

জাহ্নবী তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন—এতটা বিচলিত না হলেও তুমি পারতে। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে এত সহজে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

সুহাসিনী জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—তুমিইত

বললে, যারা চাপা পড়েছে, তাদের কোন চিহ্নই নেই। তবে কি করে জানলে, খাদের ভেতরে যে লোকটা চাপা পড়েছে, সে-ই প্রতাপ ?

জাহ্নবী কহিলেন,—পুলিশের সৌভাগ্যক্রমে বেচারা তার প্রমাণ রেখে গেছে। য়্যাকসিডেণ্টের সময় তার হাতের ব্যাগটি খাদের এ-পারে ছিটকে পড়েছিল। সেই ব্যাগের ভেতরে তার নাম লেখা একখানা ইংরিজী কেতাব, তোয়ালে আর একখানা চিঠি থেকেই তার পরিচয় পাওয়া গেছে। বই আর তোয়ালে আফিসে আছে, তদন্তর পর দেখতে পাবে, উপস্থিত চিঠিখানা আমি সঙ্গে এনেছি।

এই সময় পকেট হইতে পূর্ব্বের সেই চিঠিখানি বাহির করিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন—চিঠিখানা সে একটা পাহাড়ের গুহায় বসে দুর্গার নামেই লিখেছিল, সেদিক দিয়ে একে 'প্রাইভেট লেটার' বলতে পার। কিন্তু ঘটনাচক্রে এখানা তদন্তের উপাদান হওয়াতে মালিকের হাতে না গিয়ে পুলিশের দপ্তরে উঠেছে। চিঠিখানি তোমাদের সামনে পড়ছি, তাহলেই সব বুঝতে পারবে, আমাকে আর খুলে কিছু বলতে হবে না।—বলিয়াই জাহ্নবী চিঠিখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

পড়া শেষ করিয়া জাহ্নবী ব্যঙ্গের সুরে মন্তব্য করিলেন—যারা বওয়াটে আর ডানপিটে এইভাবেই তাদের মরণ ঘটে। এইজন্যই আমি—

কিন্তু কথাটা আর সমাপ্ত হইল না, দুর্গাকে এই সময় আঁচলে মুখখানি চাপা দিয়া উঠিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি সহসা থামিয়া পত্নীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিলেন।

সুহাসিনী এই সময় প্রশ্ন করিলেন—ছোঁড়াটার তাহলে কোনো চুলোয় কেউ নেই ?

জাহ্নবী কহিলেন,—সেই রকমই ত দেখছি।

পরদা ঠেলিয়া মিশিরজী ড্রয়িং রুমে ঢুকিল এবং মিলিটারী কায়দায় সেলাম করিয়া একখানি চিঠি টেবিলের উপর রাখিল।

চিঠিখানা লইয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতেই মিশিরজী পুনরায় সেলাম বাজাইয়া সবিনয়ে জানাইল যে, ডুমকার জমিদার অদ্বৈত বাবুর চিঠি লইয়া একটি ছোকরা হুজুরের কাছে আসিয়াছে। তাহাকে বাহিরে রাখিয়া সে চিঠিখানি আনিয়াছে।

অদ্বৈত চৌধুরী বিহার প্রদেশের প্রসিদ্ধ জমিদার। ইঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য এবং বিপুল প্রতিপত্তির খ্যাতি প্রদেশবাসী সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। লাঠা-বাজীতে ইনি যেমন বেপরোয়া, মামলা চালাইতেও তেমনই ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। সাঁওতাল পরগণায় যে সময় ডাকাতির হিড়িক পড়ে এবং জিলার পুলিশ সাহেব মিঃ হুইলার জাহ্নবীর উপর দস্যু দলনের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন, সেই সময় ঘটনাচক্রে অদ্বৈত চৌধুরীর সহিত জাহ্নবীর পরিচয় ঘটে। জাহ্নবীর ভাগ্যাকাশ তখন সবেমাত্র পরিষ্কার হইয়াছে, অরুণোদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে নাই, তখনও তিনি ইনেস্পেক্টর; ডুমকার এক থানার ভার পাইয়াছেন মাত্র। যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে অদ্বৈত চৌধুরীর সহিত জাহ্নবীর আলাপ পরিচয় হইল, দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলের সাংঘাতিক দস্যুচক্রটির উচ্ছেদ ব্যাপারে অদ্বৈত চৌধুরীর প্রচুর সহায়তাও জাহ্নবীর সাফল্যলাভে নানাপ্রকার উপাদান যোগাইল। সত্য কথা বলিতে কি, অদ্বৈত চৌধুরীর সাহায্য না পাইলে জাহ্নবী কিছুতেই এত সহজে এবং অতিশয় তৎপরতায় পর-পর তিনটি দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করিয়া সমগ্র প্রদেশকে চমৎকৃত এবং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রশংসিত হইতে পারিতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এইটুকু যে, অদ্বৈত চৌধুরী এ-ব্যাপারে কোনও প্রকারে ধরা-ছোঁয়া দেন নাই, তিনি-যে নানাভাবে দস্যুদলনে জাহ্নবীকে

সাহায্য করিতেছেন, সাধারণে কেহই এ-সম্বন্ধে কিছুই জানিবার কোনও সুযোগই পায় নাই। বরং এমন কৌশলে তিনি অদৃশ্যভাবে কল-কাটি টিপিয়াছেন যে, জাহ্নবী নিজেই তাহার কোন হদিসই পান নাই। দস্যুদলকে ধরিতে গিয়া জাহ্নবী যখন দস্যুবেষ্টিত হইয়াছেন, নিষ্কৃতির কোন পথই নাই, মৃত্যু নিশ্চিন্ত ভাবিয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়াছেন,—ঠিক সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে দৈবপ্রেরিতের মতই অদ্বৈত চৌধুরীর পাইকদল আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বিপন্ন পুলিশ ইনেস্‌পেক্টরকে রক্ষা করিবার জন্য প্রশস্তির কোন অংশই তিনি গ্রহণ করেন নাই। সকলেই জানিয়াছে, দুঃসাহসী জাহ্নবী মিত্র একদল কনেষ্টবলকে সাঁওতালের ছদ্মবেশে সাজাইয়া দস্যুদলকে পাকড়াও করিতে দুর্গম পাহাড়ের ভিতর অভিযান করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই কৌশল সার্থক হইয়াছে, দস্যুদল ধরা পড়িয়াছে—ইত্যাদি। জাহ্নবীর অগোচরেই এই জনরব এমনভাবে প্রচারিত হইয়া পড়ে যে পরে জাহ্নবীকেও ইহার উপর নির্ভর করিতে হয়। পুলিশের বড়কর্ত্তা হুইলার সাহেব যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—'মিষ্টার মিত্র, ব্যাপার কি? তুমি যে দেখছি ডিটেকটিভ নভেলের একটা প্লট তৈরী করে ফেলেছ, চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে!' জাহ্নবী নিজেকে সামলাইয়া জবাব দিলেন—'পাজীগুলো যেমন ধড়িবাজ আর চালাক, আমাকেও তেমনি চালাকী করতে হয়েছে স্যার!' হুইলার সাহেব জাহ্নবীর পীঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—চমৎকার! কেসটা হয়ে গেলে, এর যোগ্য পুরস্কার তুমি পাবে মিষ্টার মিত্র। জাহ্নবী কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, ব্যাপারটার কলকাটি টিপিয়াছেন তাঁহার পরম হিতৈষী অদ্বৈত চৌধুরী। কথায় কথায় একদিন তিনি চৌধুরী মহাশয়কে এই রহস্যপূর্ণ ব্যাপারটি সম্বন্ধে প্রশ্নও করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—'আপনার সৌভাগ্যই ঐ সাহায্য পাঠিয়েছিলেন মিষ্টার মিত্র।

তবে যদি মামলার সময় সাহায্যকারী ছদ্মবেশী লোকগুলোকে দরকার হয়, আমি সৌভাগ্য দেবীর দরবারে দরখাস্ত করে তাদের ভেতর থেকে বেছে বেছে জন ছয়েককে আনিয়ে দিতে পারি। আপনি তাদের নামগুলো আপনার প্রাইভেট ডাইরীতে এই বলে টুকে রাখতে পারেন যে—ওদের আপনি ডাকাত ধরবার জন্য বাহাল করে তফাতে রেখেছিলেন—থানার কনেষ্টবলদের সঙ্গে মিশতে দেন নি। এতে আপনার দক্ষতাই প্রকাশ পাবে, কর্ত্তারাও কাজটার তারিফ করবে।' বলাবাহুল্য, জাহ্নবী চৌধুরী মহাশয়ের এই যুক্তিটুকুও গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। সুতরাং এহেন শুভানুধ্যায়ী ও নিঃস্বার্থ মানুষটির প্রতি জাহ্নবীর শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাকিবারই কথা। কিন্তু অদ্বৈত চৌধুরীর মত শক্তিমান ভূস্বামী দস্যুদলন ব্যাপারে জাহ্নবী মিত্রকে এভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন কেন, তাহার মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিলে এই অদ্ভুত মানুষটির নিছক একটা স্বাজাত্য-প্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে রামভরসা চৌবে নামক এক বিহারী ভুমকার সিনিয়ার ইনেস্পেক্টরের পদে বাহাল ছিলেন। চৌবেজীর মনে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে একটা ভীষণ রকমের বিদ্বেষ বদ্ধমূল ছিল। পুলিশ বিভাগের সংস্রবে কোন বাঙ্গালীকে দেখিলেই তিনি ক্ষেপিয়া উঠিতেন। সকলের সমক্ষেই বলিতেন যে, পুলিশের কাজে এ-জাত একবারে অযোগ্য। বিহারীরা আছে বলেই বাঙ্গলার পুলিশ বিভাগ চলছে ইত্যাদি। কথাটা অদ্বৈত চৌধুরীর কানে যায়। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে থাকেন।

চৌধুরী মহাশয়ের স্বভাবে এইটুকু বৈশিষ্ট্য ছিল যে, মনে মনে তিনি যাহার জন্য জিদ ধরিতেন, তাহা পরিপূর্ণভাবে সিদ্ধ না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করা কিম্বা সে-সম্পর্কে কোনরূপ বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। বিরুদ্ধ কথার উত্তর তিনি

কাজে প্রদান করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। দারোগা রামভরসা চৌবে বাঙ্গালী জাতির উদ্দেশে যে বিষোদ্গার করিতেছিলেন, চৌধুরী মহাশয় কদাচ তাহার প্রতিবাদ কথায় করেন নাই, কাজের দ্বারায় তাহার উত্তর দিবার সঙ্কল্পই তিনি দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হঠাৎ দুমকা অঞ্চলে ডাকাতির প্রাদুর্ভাব আশ্চর্য্য রকমে প্রবল হইয়া উঠিল। চৌবেজী তাহার কোন কিনারা করিতে পারিলেন না, চারিদিকে দস্যুদল আতঙ্কের শিহরণ তুলিয়া দিল। হুইলার সাহেব চৌবেকে তাড়া লাগাইলেন, একদিন সর্ব্বসমক্ষে অপদার্থ বলিয়া ধমকও দিলেন। চৌবে সাহেবের বুট স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, কোনরূপ গাফলতি তিনি দেখান নাই, কিন্তু ডাকুরা এমনই শয়তান যে, কিছুতেই তাহাদের পাত্তা পাওয়া যাইতেছে না। এ অবস্থায় পাটনার কোন পাকা ইনেসপেক্টরের সহায়তা পাইলে সহজেই তিনি ডাকুদিগকে গিরেফতার করিতে পারিবেন।

ইহার পরেই মিষ্টার হুইলারের চেষ্টায় জাহ্নবী মিত্র পাটনা হইতে দুমকায় আসিলেন। চৌবেজী চমকাইয়া উঠিলেন এবং মনে মনে সাহেবের উপর চটিলেন। কিন্তু মুখে বলিবার কোন উপায় নাই। তিনি লোকের কাছে নানা কথাই দম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, সাহেবের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হইয়াছে, নতুবা এক বাঙ্গালীকে আনাইলেন কি না ডাকাত গিরেফতার করিবার জন্য—তাঁহার মত চৌখস লোক যেখানে হালে পাণি পাইতেছে না! কথাটা অদ্বৈত চৌধুরীর কানে গেল, তাঁহার চক্ষু দুটি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তখন চৌবের কথার জবাব দিবার জন্য তৈয়ারী হইয়াছেন। ইহার পরই সুকৌশলে জাহ্নবী মিত্রকে আমন্ত্রণ এবং সেই সূত্রে আলাপ-পরিচয় ও প্রীতি-বন্ধন। চতুর জাহ্নবী আলাপ করিয়া জানিলেন, অদ্বৈত চৌধুরীর প্রতিপত্তি প্রচুর, দেশের অনেক খবরই রাখেন; ডাকাতদের ব্যাপারে

অনেক সহায়তাই ইঁহার নিকট পাওয়া যাইবে। অদ্বৈত চৌধুরী বুঝিলেন—মানুষটি অত্যন্ত দাম্ভিক, দেশাত্মবোধের কোন প্রেরণাই ইঁহার চিত্তকে স্পর্শও করে নাই। কিন্তু ক্ষমতা আছে, জিদ আছে এবং অতিশয় নির্ভীক। স্থির করিলেন—ইঁহাকে উপলক্ষ করিয়া প্রথমে চৌবের কথাগুলার জবাব দিবেন, তাহার পর এই দাম্ভিক মানুষটির উষর মানসক্ষেত্রে ধীরে ধীরে দেশাত্মবোধের বীজ ছড়াইয়া দিবেন। এমন সন্তর্পণে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সঙ্কল্পিত কাজটি সুরু করিলেন যে, জাহ্নবী মিত্রের হাড়হদ্দ—নাড়ীর খবরটি পর্য্যন্ত তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু জাহ্নবীর পক্ষে চৌধুরী মহাশয়ের জীবনধারার পটভূমিকাটি অদৃশ্যই রহিয়া গেল।

ডাকাতীর হাঙ্গামা মিটিবার পর বাঙ্গালী ইনেসপেক্টর জাহ্নবী মিত্র যেদিন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উচ্চ প্রশংসিত হইলেন এবং গুনকার গুণগ্রাহী ইংরাজ অফিসার মিষ্টার হুইলারের উদ্যোগে ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে পাকা হইয়া বসিলেন, পক্ষান্তরে রামভরসা চৌবেজীকে সব-ইনেসপেক্টরের পদে ডিগ্রেড করা হইল, সেইদিন অদ্বৈত চৌধুরী যাচিয়া চৌবেজীর সহিত দেখা করিতে যান এবং তৎকালে উভয়ের মধ্যে আলাপসূত্রে যে সংলাপ চলিয়াছিল, তাহা এইরূপ—

অদ্বৈত চৌধুরী—কেঁওজী! বঙ্গালী ক্যায়সা চীজ হ্যায়?

চৌবেজী—বড়ী তাজ্জব বনানেবালি চীজ হ্যায়। ওহ লোগ short cut ঢুঁড় লেনে মেঁ বড়ে উস্তাদ হোতে হ্যঁয়।

অদ্বৈত চৌধুরী—ঠিক বাত হ্যয়! পর্—ওহ লোগ short cut লেকর আগে বড়তে হ্যঁয়, অওর আপ লোক নীচে উতরতে হ্যঁয়। ইসি তরহ-সে জাহ্নবী-মিত্তির-সাহব ইন্সপেক্টরী-সে পুলিস-সুপারকে পোষ্ট-পর পঁহুচ গয়ে,

অওর আপ অপ্‌নি দশ সালকি পুরাণি তক্ত-কো ছোড়-কর্‌ সাব-ইনেসপেক্টরী কী তক্ত পর লওট গয়ে!

চৌবেজী—অরে আপ জানবাজ মিত্তিরকী বাত কর রহে হঁয়! মুঝে অক্ল্‌ খুব মিলি হুয় সাহব! হমারা কাম হুয় চেলাকা, উসকো ছোড় কর গুরু বননেকো গয়াথা, উস বজহ-সে য়হ হালত!

ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায় আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু ডুমকা হইতে দেওঘরে আসিয়া জাহ্নবী মিত্রের সহিত অদ্বৈত চৌধুরীর আর কোনরূপ আলাপ বা পত্র বিনিময় হয় নাই। কাজেই হঠাৎ একান্ত শুভানুধ্যায়ী-স্থানীয় মানুষটির পত্র পাইয়া তাঁহার কৌতূহল ও ঔৎসুক্যবোধ প্রবল হইবারই কথা। বাদামী রঙ্গের একখানা অনাড়ম্বর লম্বা লেফাফা খুলিয়া তিনি অদ্বৈত চৌধুরীর পত্রখানা পড়িতে লাগিলেন।

সুহাসিনী প্রশ্ন করিলেন—ব্যাপার কি? কার এমন জরুরী চিঠি এল? ত্রিকূটের কোন ব্যাপার নয় ত?

জাহ্নবী প্রসন্নভাবেই উত্তর দিলেন—না। তবে মস্ত লোকের চিঠি। পড়ে শোনাবার মত।

সুহাসিনী—লোকটি কে?

জাহ্নবী—তুমি তাঁর নাম শুনেছ, তবে দেখনি নিশ্চয়। ডুমকার সেই অদ্বৈত চৌধুরী।

সুহাসিনী—ও! তা আসছেন নাকি এখানে? তুমি ত আসবার নেমন্তন্ন করে এসেছিলে। কিন্তু এসে অবধি বোধ হয় চিঠিটি লিখেও খবর নাও নি। এই জন্যেই মেয়েলী কথায় আছে—বিয়ে ফুরুলে ছাদনায় লাথি!

জাহ্নবী—কথাটা ঠিক। সত্যিই, আমার কাজটা ভারী খারাপ হয়েছে। আমি কোন খবরই তাঁর নিতে পারি নি, নিজের খবরও জানাই নি। অথচ, তিনি আমাকে ভোলেন নি। আমার জন্যে এক 'বিচ্চু' পাঠিয়েছেন।

চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—বিচ্চু পাঠিয়েছেন? কি বলছ তুমি!

জাহ্নবী—ভয় পাবার মত কিছু নয়, পাহাড়ে বিচ্চু নামে বিছে-জাতীয় কোন জানোয়ার অবশ্য পাঠান নি, তেমনই শক্ত গোছের একটি ছেলে পাঠিয়েছেন। চিঠিখানা তাঁর পড়ি, তাহলেই বুঝতে পারবে।—বলিয়াই জাহ্নবী অদ্বৈত চৌধুরীর চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। চিঠির বয়ান এইরূপ—

প্রিয় জাহ্নবী বাবু,

দেওঘরে গিয়ে এবং পুলিস-সুপারের দায়িত্বের চাপে আমাকে বোধ হয় ভুলেই গেছেন। আমি কিন্তু আপনাকে ভুলিনি, আপনার কথা নিত্য ভাবি, আপনার খবরও সব রাখি। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, যদিও আপনাদের মত সন্ধানী দৃষ্টি আমাদের নেই এবং হাতে-কলমে পাকা-পোক্ত হবার মত শিক্ষা পাইনি, কিন্তু মানুষ চেনবার ও মানুষকে তৈরী করবার মত কিছু

কিছু ক্ষমতা ভগবান আমাকে দিয়েছেন। সম্প্রতি আমার হাতে একটি চমৎকার ছেলে এসেছে। এর গোড়ার পরিচয়টা হচ্ছে—এক মেম সাহেবের দয়াতেই সে বেঁচে যায় ও মানুষ হয়। তার মা ঐ মেমের কাছে আয়ার কাজ করত। মা যখন মারা পড়ে, সে তখন তিন বছরের শিশু। সংসারে তার আর আপনার বলতে কেউ ছিল না। মেম সাহেব দায়পরাবশ হয়ে এই মাতৃহীন শিশুটিকে মানুষ করে তোলেন। মেম সাহেবের সঙ্গে নানা দেশ সে ঘুরেছে, অনেক কিছু শিখেছে। বিলেতে যাবার সময় তিনি ছেলেটিকে পাটনার এক পাদরীর হাতে তুলে দিয়ে যান। পাদরীর হাত-ফিরতি হয়ে সে এক বাঙ্গালী বাবুর হাতে পড়ে। বাবুটি আবার মস্ত লিখিয়ে, কাজেই তিনি ছেলেটিকে বাংলা শিখিয়ে তবে ছেড়েছেন, তা ছাড়া পাটনার পাঠশালায় প'ড়ে চালাক চতুরও খুব হয়েছে। জাতে কিন্তু ছেলেটি সাঁওতাল। এদিকে ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের ঠেলায় পড়ে

বাঙ্গালী বাবুটির চাকরী যায়, তিনি বাংলা ইউনিভারসিটির দলে ভিড়ে পড়েন। তাঁরা তাঁকে ইয়োরোপে পাঠিয়ে দেয়। তিনি যাবার সময় তাঁর এই সচল রত্নটিকে আমার কাছেই পাঠিয়ে দেন। আমি তাকে যাচাই করে দেখলুম যে, আপনার মতন রত্নাকরের কাছেই এ-রত্নের কদর হবে। নাম এর —বিচ্ছু। দেখলে মনে হবে—বারো বছরের শিশু, কিন্তু এখন এর বয়স চলেছে আঠারো। আপনার কাছে একে পাঠাবার উদ্দেশ্য এই যে, বিলিতি গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেকের স্মিথের মত, 'জানমারা মিত্তিরে'র বিচ্ছুও বিখ্যাত হবে। তবে একটা অনুরোধ, এর কাজ কর্ম্ম দেখে—কেমন একে লাগল, এক খানা চিঠিতে তা জানালে ভারী খুসী হব। আমার নমস্কার নেবেন। ইতি—

আপনার হিতৈষী
অদ্বৈত চৌধুরী

সুহাসিনী হাসিয়া বলিলেন—কোথায় তোমার বিচ্চু, আনাও না দেখি।

মিশিরজী আদেশ প্রতীক্ষায় দরোজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, জাহ্নবী চোখের ইসারায় তাহাকে ছেলেটিকে আনিবার আদেশ দিলেন। মিশিরজী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

সুহাসিনী কহিলেন—লোকটি দেখছি সত্যিই তোমাকে ভালবাসে।

মুখখানা ভার করিয়া জাহ্নবী উত্তর দিলেন—নিজের ভুলটুকু এখন কিন্তু গুরুতর ত্রুটির মতই মনে খোঁচা দিচ্ছে।

দরোজার সামনে টাঙ্গানো পরদা ঠেলিয়া বিচ্চুর সহিত মিশিরজী ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিল। মিশিরজীর চেয়েও ক্ষিপ্র এবং সুষ্ঠু কায়দায়—খর্ব্বদেহ বাঁটুল ছেলেটি কেদারায় আসীন হুজুর ও হুজুরাইনকে সেলাম করিল।

মানুষের গায়ের রঙ নিকষ কালোর কত ডিগ্রী উঁচুতে উঠিতে পারে, এই ছেলেটির চামড়া যেন তাহার একটা রেকর্ড রাখার মত নমুনা দেখাইয়া দিল। পুলিস-সুপার জাহ্নবী ত সমস্ত সাঁওতাল পরগণা তছনছ করিয়া বেড়াইয়াছেন, কিন্তু মানুষের গায়ের এমন চিক্কন-কালো রঙ এবং এই ধরণের এমন এক খানি চেহারা তাঁহার দৃষ্টিকে কোন দিন আকৃষ্ট করে নাই। জাহ্নবী সস্ত্রীক চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, ছেলেটির মাথার কালো কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলির সঙ্গে গায়ের রঙের কোন তফাৎ নাই—দিব্যি মিশিয়া খাপ খাইয়া গিয়াছে। তবে তাহার পুরু পুরু ঠোঁট দুটি কিন্তু দেহের রঙের সহিত মিতালী করে নাই, কে যেন তুলি চালাইয়া তাহার উপর সন্তর্পণে ম্যাজেণ্টার রঙ এক পোঁচ ছোপ ধরাইয়া দিয়াছে। দেহের তুলনায় মুখখানি তাহার ভারি, হাঁ-টি বড়,—এত বড় যে, হাসিলে ভিতরের

দন্ত পাটি পুরাপুরি ভাবেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। চিবুকটিও খুব চওড়া, ভ্রূ দুটির উপর কেশ নাই বলিলেই চলে, সেখানে পাশাপাশি দুটি অস্থিখণ্ড উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। নাকটি অস্বাভাবিক মোটা। চোখ দুটি ছোট ছোট হইলেও অতিশয় তীক্ষ্ণ, দেহটি লম্বায় খাঁটো, আড়ে বহরে তাহার অনুপাতে একটু বেশী চওড়া। চৌধুরী মহাশয়ের চিঠির বর্ণনার সহিত বয়সটি হুবহু মিলিয়া যায়, দেখিলে মনে হয় ছেলেটির বয়স বারোর বেশী হইতেই পারে না। পরণে তাহার খাঁকী রঙ্গের হাফ প্যাণ্ট, গায়ে নীল রঙ্গের একটা হাতকাটা সোয়েটার, পায়ে রঙ্গবেরঙ্গের বনাতের পটি বাঁধা, জুতাও নিশ্চয়ই ব্যবহার করিতে ছেলেটি অভ্যস্ত, কিন্তু সাহেবের ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই বাহিরে তাহা ছাড়িয়া আসিয়াছে। ছেলেটির মুখমণ্ডলে প্রতিভার একটা স্বাভাবিক আভা যেন বিদ্যুতের মত খেলা করিয়া বেড়াইতেছে।

জাহ্নবী ছেলেটিকে দেখিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইলেন বটে, কিন্তু সুহাসিনীর মুখে বিরক্তির ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। চাকর-বাকর বেশী রকমের চালাক চতুর হয়, ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। ছেলেটিকে দেখিয়াই তাঁহার মনে হইল, তাহার মুখখানা যেন দুষ্টামী মাখানো, চোখ দুটো যেন খটাসের চোখের মত ভীষণ; এ রকম ছেলেকে সংসারের ভিতর রাখা ঠিক নয়। কিন্তু মনের কথা তিনি মুখে প্রকাশ করিলেন না।

জাহ্নবী ছেলেটিকে হিন্দী, বাঙ্গলা ও ইংরিজীতে নানা রকম প্রশ্ন করিলেন। ছেলেটি তাঁহার মত রাশভারী পুলিশ অফিসারের সম্মুখে এমন সপ্রতিভ ও নির্ভীক ভাবে প্রশ্নগুলির জবাব দিল যে, সস্ত্রীক জাহ্নবী চমৎকৃত না হইয়া পারিলেন না, আর মিশিরজী দরোজার কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হতভম্বের মত অস্ফুটস্বরে বলিয়া ফেলিল—ক্যা তাজ্জব হ্যায়!—

সত্যই, বেচারা বিশ বৎসর ধরিয়া পুলিশে নকরী করিতেছে, কিন্তু সেও এমন করিয়া কথা বলিবার ধরণ ধারণ কিছুই শিখে নাই, আর তার এমন এলেমও নাই।

যাহাহৌক, জাহ্নবী খুসী হইয়া বিচ্চুকে তাঁহার বেয়ারার পদে বাহাল করিয়া লইলেন। স্থির হইল, বিচ্চু এ-বাড়ীতেই থাকিবে,—খাওয়া পরা ছাড়া উপস্থিত সে দশ টাকা করিয়া বেতন পাইবে এবং কাজে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে তাহা ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে। বিচ্চু আহ্লাদে আটখানা হইয়া ও তাহার বত্রিশ পাটি দন্ত বিকাশ করিয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

জাহ্নবী দেখিলেন, ছোকরা নামেও বিচ্চু, কাজেও তাই। কথা বেশী বলে না, কিন্তু যাহা বলে নির্ঘাত। কথা অপেক্ষা কাজেই সে অধিক পটু। সহধর্ম্মিনীর অসাক্ষাতে জাহ্নবী বিচ্চুকে তাহার কাজের রুটিন বাতলাইয়া দিলেন। তন্মধ্যে এমন একটা নির্দ্দেশ ছিল, সুহাসিনী শুনিলেই তৎক্ষণাৎ কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিতেন। সেই গোপন নির্দ্দেশটি হইতেছে—সন্ধানী দৃষ্টিতে অন্যের অজ্ঞাতে এই বাড়ীর সকল সংবাদ রাখা এবং সংগোপনে তাঁহাকে প্রদান করা। ইহা ছাড়া আর একটি খবরদারীর ভারও তিনি বিচ্চুর উপর চাপাইয়া দিলেন, তাহাতে দুর্গার উপর প্রথমেই বিচ্চুর সতর্ক দৃষ্টির পাহারা পড়িল। নিজের সংসারভুক্ত করিয়াও জাহ্নবী এই মেয়েটিকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ প্রতাপের অপমৃত্যুর সংবাদ পাইয়া যে-কাণ্ড সে বাধাইয়া বসে—অর্থাৎ চায়ের পিয়ালা ফেলিয়া ও আসর ছাড়িয়া মুখে আঁচোল চাপা দিয়া উঠিয়া যায়—তাহা জাহ্নবীর ভালো লাগে নাই। কাজেই অতঃপর সে কি করে, কোন্ পন্থা ধরে, কিম্বা যদি কোন চিঠিপত্র কাহাকেও পাঠায়—সব দিকেই পাকা গোয়েন্দার মত নজর রাখিবার

নির্দেশটুকু বিচ্চুকে দিয়া তিনি বলিলেন,—এইটিই হচ্ছে তোমার প্রথম কাজ বিচ্চু, এতেই তোমার কেরামতী বুঝবো।

বিচ্চু তাহার অদ্ভুত মুখখানার এক বিচিত্র ভঙ্গী করিয়া সবিনয়ে জাহ্নবীর হুকুমটি তামিল করিবার সম্মতি জানাইল।

জাহ্নবী খুসী হইলেন। বুঝিলেন, ছেলেটি সত্যই তাঁহার কাজে লাগিবে। সুতরাং অবাধে তাহার কাজ করিবার মত সকল ব্যবস্থাই তিনি করিয়া-দিলেন

—নয়—

দ্বিপ্রহরের পর বাংলোর আর সকলেই যখন দিবা নিদ্রায় অভিভূত, দুর্গা সে সময় বাংলোর শেষের দিকে তাহার নিজস্ব ঘরখানির ভিতর তাহার পিতার বাঁধানো ছবিখানির সম্মুখে স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল। ঘরখানি মাঝারী রকমের। একধারে ছোট একখানা লোহার খাট, তাহার মাথার দিকে একটি ছোট টিপয়, সেইটির উপর স্বর্গগত অধ্যাপক যদুপতির পুষ্পমালা-ভূষিত ছবিখানি পিতলের দুইটি ফুলদানির সাহায্যে সংন্যস্ত। অন্যদিকে ছোট একটি টেবিল, তাহার সম্মুখে একখানা চেয়ার, টেবিলের পাশে এক-খানা টুলের উপর একটি সুশ্রী সুটকেশ; দেওয়াল ঘেঁসিয়া একটি সুদৃশ্য আলমারি।

সকালের সেই দুঃসংবাদ শুনিবার পর হইতে এই মেয়েটি কি করিয়া যে তাহার মনকে সবলে সংযত করিয়া রাখিয়াছে, উচ্ছ্বসিত অশ্রু-তরঙ্গ রুদ্ধ করিয়া নিষ্ঠুর অভিভাবকদের মন যোগাইয়াছে, তাহার অন্তর দেবতা ছাড়া অপরে তাহার কি বুঝিবে! পাছে তাহাকে লইয়া বাড়ীতে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং ব্যাপারটা অপ্রীতিকর হইয়া উঠে, এজন্য তাহাকে একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেও মধ্যাহ্ন-ভোজনে যোগ দিতে হইয়াছে, কলের পুতুলটির মত ঘুরা-ফিরাও করিয়াছে, কিন্তু সে পাট চুকিলে সেই-যে সে তাহার ঘরটির ভিতর ঢুকিয়া তাহার স্বর্গগত পিতার আলেখ্যখানির পানে চাহিয়া একইভাবে বসিয়া আছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি তাহার ক্লান্তি নাই। সে যেন এই প্রাণহীন ছবিখানিকে প্রাণময় করিয়া কোন জটিল সমস্যার সমাধান করিতে কঠোর সাধনায় রত।

সহসা সে নিজের মনেই বলিয়া উঠিল—পেয়েছি, আমি পেয়েছি। তুমি যে ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যাশ্রয়ী, নিষ্পাপ, ভুল তুমি কর নি। তবে কেন তোমার আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হবে। না—এ হতে পারে না।

পরক্ষণেই সে সুটকেশটি খুলিয়া একখানি ব্রোমাইড ফটো বাহির করিল, সেখানি মাথায় ঠেকাইয়া টেবিলের উপরে একখানা মোটা কেতাবের গায়ে হেলাইয়া রাখিল। তাহার পর চেয়ারটির উপর বসিয়া আলেখ্যটির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল—সত্য উপলব্ধি করবার যে শিক্ষা আমরা দুজনেই আমাদের গুরুর কাছে পেয়েছি, আজ বড় সঙ্কটে তারই আলোয় জানতে পেরেছি তিনি ভুল করেন নি, তাঁর কাজে ত্রুটি হয় নি, আশীর্ব্বাদ তাঁর মিথ্যা হতে পারে না। তবে কেন নিয়তি এমন নিষ্ঠুর হয়ে শাস্তি দিতে হাত তুললেন? এযে অসম্ভব! মহাপুরুষের মুখের কথা মিথ্যা হবে! একি সত্য, না—শঠে শাঠ্যং—নীতিটি নিয়ে আমাকে চঞ্চল করছ। তোমার চিঠিত চোখে দেখিনি, কানে শুনিছি, কিন্তু তার একটা কথা আমার কানে এখনো বাজছে, সে হচ্ছে—শঠতা। তাই কি?

—হিঃ হিঃ হিঃ!

পিছন হইতে চাপা হাসির একটা তীক্ষ্ণ সুর দুর্গার কানে বাজিল। বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া চাহিতেই সে সবিস্ময়ে দেখিল—বিচ্চু নামে নবাগত সাঁওতাল ছেলেটি তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে চাহিয়া আছে ও তাহার আকর্ণ-বিস্তৃত মুখখানার ভিতর দিয়া দুই পাটি দাঁতের বিচিত্র বাহার যেন কাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

দুর্গার মুখের বিরক্তি ও চোখের দৃষ্টিতে দীপ্তি দেখিয়াও বিচ্চু দমিল না, হাসিমুখেই বলিল—আমি জানি কার ঐ তসবীর!—হিঃ হিঃ হিঃ!

অসহ্য ক্রোধে দুর্গার সারা দেহ তখন কাঁপিবার মত হইয়াছে, কণ্ঠে জোর দিয়া সে বলিয়া উঠিল—ভারি যে আস্পর্দ্ধা দেখছি—

কিন্তু ছেলেটি তৎক্ষণাৎ মুখখানা বন্ধ করিয়া এবং বাম হাতের তর্জ্জনী দিয়া বদ্ধ ঠোঁট দুখানি চাপিয়া এমন ভঙ্গীতে ডান হাতের তর্জ্জনীটি দুর্গার মুখের উপর তুলিল যে, দুর্গার মুখের কথাও এইখানে বন্ধ হইয়া গেল। এরূপ ভঙ্গীর যে কোন গূঢ় অর্থ আছে, দুর্গার মত শিক্ষিতপটু মেয়ের তাহা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় নাই।

পরক্ষণেই বিচ্চু সোয়েটারের ভিতর হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া দুর্গার বিস্ফারিত চক্ষুর উপর তুলিয়া ধরিল। পরিচিত হাতের অক্ষরে নিজের নামটি দেখিয়া দুর্গার দুই চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু ওষ্ঠ দুটি নড়িবার আগেই চিঠিখানা তাহার হাতে আসিয়া পড়িল। খাম খুলিয়া চিঠির কয়টি ছত্রের উপর এক নিঃশ্বাসে ক্ষুধিত দুই চক্ষুর দৃষ্টি বুলাইয়াই মুখ তুলিতে সে দেখিল—চিঠির বাহকটি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার একটু আগে জাহ্নবী তাঁহার আফিসের খাস কামরা হইতে উঠি উঠি করিতেছেন, এমন সময় দরোজার পরদা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল বিচ্চু।

জাহ্নবীর চক্ষুদুটি তাহার দিকে পড়িবামাত্রই সে মিলিটারী কায়দায় সেলাম করিয়া মুখখানার এমন ভঙ্গী করিয়া প্রভুর পানে চাহিল যে, জাহ্নবী বুঝিতে পারিলেন কোন সংবাদ সে বহন করিয়া আনিয়াছে। প্রসন্নভাবেই তিনি প্রশ্ন করিলেন—কি খবর ?

বিচ্চু মুখে কিছু বলিল না, দুই পা অগ্রসর হইয়া তাহার সোয়েটারের ভিতর হইতে ভাঁজকরা একখানা কাগজ বাহির করিয়া জাহ্নবীর টেবিলে রাখিল।

তৎক্ষণাৎ সেখানি তুলিয়া ও ভাঁজটি খুলিয়া দৃষ্টি সংযোগ করিতেই জাহ্নবীর মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কাগজখানায় বিচ্চু সে দিনের কয়েক ঘণ্টার রোজ-নামচা এমন কায়দা করিয়া লিখিয়া দাখিল করিয়াছে যে, জাহ্নবীর মত ঝুনো পুলিশ-অফিসার মনে মনে তাহার প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না।

যে কাগজখানা বিচ্চু দাখিল করিল, তাহাতে বিচ্চু রোজনামচার আকারে পুলিস-সুপারের বাংলোর কয়েক ঘণ্টার যে খবরগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিল, তাহার ফিরিস্তি এইরূপ—

"হুজুর বাংলো থেকে বেরিয়ে আসবার খানিক পরেই ভেতরে একটা হল্লার মত আওয়াজ পাই। চুপি চুপি খবর নিতে যেতে হল। গিয়ে দেখলুম, দিদি-মণি কাঁদছেন, মা'জী তাঁকে বকছেন। দিদিমণির কথা শুনতে পাইনি, মা'জীর কথা শুনিছি। তিনি বলছিলেন—কোথাকার কে তার ঠিক নেই, তার জন্যে তোমার এত শোক কিসের? না খেয়ে কদিন থাকবে?

এই কথার পর দিদিমণি খেতে যান। কিন্তু তিনি ভাতের থালার সামনে বসেছিলেন এই পর্য্যন্ত। খাননি বললেই হয়। খাবার পরে তিনি পশ্চিম দিকের

ঘরখানার ভেতরে ঢুকেই তার খিল এঁটে দিলেন। খোকাবাবু আর খুকী রাণী দরোজার কাছে এসে কত ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু দিদিমণি দোরও খুললেন না, সাড়াও দিলেন না। ঘরের ভেতরে তিনি কি করছেন, তাই দেখবার জন্যে আমি বাংলোর পেছন দিক দিয়ে ঘুরে তাঁর জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, তিনি মেঝের ওপর বসে বিড় বিড় করে কি সব বলছেন। স্পষ্ট কিছুই শুনতে পেলুম না—আর দেয়ালটার আড়ালে ছিলেন বলে তাঁকেও ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলুম না। তবে ভেজানো দরোজাটার দিকে নজর পড়তে দেখলুম, খিলটি হাঁসকলে চেপে বসেনি—একটু লেগেই আছে। তাই ফের ভেতরে ফিরে গিয়ে লোহার একটা সরু সিক দরজার ফাঁক দিয়ে চালিয়ে এমনি আস্তে আস্তে হাঁসকল থেকে খিলটাকে খুলে ফেললুম যে একটুও শব্দ হল না, দিদিমণিও টের পেল না। তারপর দোরের একটা

পাল্লা একটু ফাঁক করে ঢুকে ঘরের ভেতর সেঁধিয়ে জানলার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখান থেকে দেখলুম—দিদিমণি একখানি তসবীরের সামনে বসে কাঁদছেন।

আমি যেমন চুপি চুপি ঢুকেছিলুম, তেমনি চুপি চুপি বেরিয়ে মা-জীর খবর নিতে গেলুম। দেখলুম, তিনি খাটের ওপর শুয়ে একখানা কেতাব নিয়ে পড়ছেন, কেতাব পড়তে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

খোকাবাবু আর খুকুরাণী তাঁদের পড়বার ঘরে খেলতে খেলতে ঝগড়া সুরু করলেন। খুকুরাণী নাকি খোকা বাবুর খাতায় কালি ফেলে দিয়েছিল, তাই খোকা বাবু তাঁর চুল ধরে টানেন। আমি গিয়ে দুজনকে থামাই, অনেক গল্প করি, আমার সঙ্গে এখন তাঁদের দিব্যি ভাব হয়ে গেছে।

এদের দুটিকে ঘুম পাড়িয়ে আমি ফের যাই দিদিমণির সন্ধানে। বাগান থেকে ফুল তুলে এক ছড়া মালা গেঁথে দরজার কাছে গিয়ে তাঁকে ডাকলুম।

তিনবার ডাকের পর তিনি দরজা খুলে আমাকে দেখেই চোখ পাকিয়ে বললেন—কি দরকার, ডাকাডাকি কেন? আমি মালাটি দেখিয়ে বললুম—আপনার তসবীরে যে মালা দিয়েছেন বাসি, তাই টাটকা মালা এনেছি, পরিয়ে দিন। দিদিমণি মালাটি নিয়ে তসবীরটির গলায় পরিয়ে দিয়ে গড় করলেন। বললেন—আমার বাবার তসবীর। তারপর অনেক কথাই আমার সঙ্গে হল। বললেন—আমি বড় দুঃখী, আমার দিকে চাইতে কেউ নেই। আমি বললুম—দিদিমণি, আমাকে আপনার ছোট ভাই বলে মনে করবেন, যখন যা দরকার হবে আমাকে বলবেন, আমি আপনার হুকুম কোনদিন ঠেলব না। আজ এই পর্য্যন্ত কথা হয়েছে। এর পর যা যা হবে, হুজুরকে জানাবো।

ইতি—

জাহ্নবী সহাস্যে কহিলেন—বেশ। আমি খুশী হয়েছি। এর পর চিঠি পত্র যদি কিছু তোমার দিদিমণি লেখে, তোমার হাত দিয়েই ডাকখানাতে পাঠাবে নিশ্চয়ই—

বিচ্চু অমনি তাড়াতাড়ি কহিল—আমি অমনি ডাকখানায় না ফেলে হুজুরের হাতে এনে দেব।

জাহ্নবী কহিলেন—তুমি বাহাদুর। তোমার উন্নতি হবে।

মুখখানা নীচু করিয়া বিচ্চু কহিল—হুজুর মা-বাপ সব।

পরদিনই জাহ্নবী অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া অদ্বৈতচৌধুরীকে এক পত্র লিখিলেন। বিচ্চুর প্রচুর সুখ্যাতি এবং সপরিবার অদ্বৈতবাবুকে বৈদ্যনাথ দর্শনের-মিনতি পত্রখানির অধিকাংশ স্থান অধিকার করিল। যথাসময় অদ্বৈত বাবুর নিকট হইতে প্রত্যুত্তরও আসিল। তিনি লিখিয়াছেন—কোনও একটি গুরুতর বৈষয়িক কার্য্যের সম্পর্কে তাঁহাকে কয়েক মাস বিশেষভাবে ব্যস্ত ও ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। এমন কি, তাঁহার বিদেশে যাইবারও সম্ভাবনা আছে। যদি কার্য্যটি সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হয় এবং তিনি আশ্বিন মাসের পূর্ব্বেই দুমকায় ফিরিতে সমর্থ হন, দুর্গোৎসবের সময় সপরিবার বৈদ্যনাথ দর্শনে আসিবেন। বৈদ্যনাথের সন্নিহিত বিখ্যাত কুণ্ডেশ্বরীর মাতার স্থানে তাঁহার স্ত্রীর বড় রকমের একটা মানত আছে। ঐ সময়েই এক সঙ্গে দুই কার্য্য সারিবার ইচ্ছা তাঁহার রহিল।

এক সপ্তাহ পরের কথা।

বাংলোর ড্রয়িংরুমে বসিয়া সপরিবার জাহ্নবী প্রভাতী চা-পান করিতে ছিলেন, বড় টেবিলখানির সামনাসামনি বসিয়াছিলেন গৃহস্বামী ও তাঁহার গৃহিণী সুহাসিনী, বাম পার্শ্বে দুই পুত্রকন্যা, আর বিপরীত দিকে

উদাস মনে পেয়ালায় চা ঢালিতেছিল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী দুর্গা। কালো চুলের রাশি তাহার পিঠ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, পরিধেয় পাতলা নীলাম্বরী শাড়ীখানির ভিতর হইতে অষ্টাদশী তরুণীর রূপের প্রভা ফুটিয়া বাহির হইয়া সেই কক্ষ যেন আলোকিত করিতেছে। ঠিক সেই সময় জাহ্নবীর প্রিয় বালক-ভৃত্য বিচ্চু অসঙ্কোচে দরজার উপর প্রসারিত পরদাখানি ঠেলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল, এবং একখানি চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। চক্ষুর দৃষ্টি চিঠির উপর ফেলিয়া এবং চায়ের পেয়ালাটি স্পর্শ না করিয়া অপ্রসন্ন মুখেই তিনি চিঠিখানা টেবিল হইতে তুলিয়া লইলেন।

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটু যে চা খাবে, তারও যো নেই! ছোঁড়াটার যদি একটু আক্কেল-বিবেচনা থাকে,—অথচ ওর প্রশংসা আর তেমোর মুখে ধরে না! কেন, চা খেয়ে বাইরে যাবার পর চিঠিখানা—

এই সময় সাদা লেফাপার ভিতর হইতে বাহির-করা লাল রঙের চির-কুটটিতে তাঁহার নজর পড়িতেই তিনি মুখের কথাটার মোড় ফিরাইয়া, আগ্রহের সুরটুকু মিশাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওমা, নেমন্তন্নর চিঠি দেখছি যে! কোথ্ থেকে এলো? বড়দি'র মেয়ে মিনতির বি'য়ে ত এই মাসেই,—জামাই বাবুর চিঠি না কি?

শুষ্ক একটু হাসিয়া জাহ্নবী চিঠিখানা স্ত্রীর দিকে আগাইয়া দিলেন।

চিঠিখানা পাঠ করিয়া গৃহিণীর কণ্ঠস্বর কাঁসরের মত বাজিয়া উঠিল—মুখ্থে আগুন চিঠির! কোন্ মুখপোড়া লিখেছে?

জাহ্নবী সহজ কণ্ঠেই বলিলেন,—কেন? নাম ত নীচেই র'য়েছে, পড় না ভাল ক'রে।

গৃহিণী চিঠিখানায় লিখিত পর পর তিনটি পংক্তি পুনর্ব্বার পড়িলেন,—

বাহাদুরীর নমুনা

নমুনা—নম্বর এক

বাহাদুর !

তাহার পর চিঠিখানা তিনি সক্রোধে স্বামীর চায়ের খালি ডিসখানার উপর ফেলিয়া দিলেন।

জাহ্নবী ইতিমধ্যে চা-টুকু নিঃশেষ করিয়া টেবিলের বেলটি ঘুরাইয়া দিলেন। কলের যন্ত্রটির ক্রিং-ক্রিং শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই জাহ্নবী মিত্রের বালক-ভৃত্যটি ঘরে ঢুকিয়া পরদার পিঠে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। জাহ্নবী তীক্ষ্ন-দৃষ্টিতে তাহার দিকে চিঠিখানা তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন,—এ চিঠি এনেছিল কে ?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই বালক-ভৃত্য বলিল,—পা-গাড়ী চেপে একটা লোক এসেছিল চিঠিখানা নিয়ে ; সে-ও আসে আর ঘড়িতে অমনি সাতটা বাজে। আমায় চিঠি দিয়ে ব'লে গেলো—'সাহেবকে দিয়ো, নেমন্তন্নর চিঠি। আমি আবার আসবো।'—ব'লেই সে আবার পা-গাড়ীতে উঠে ইষ্টিসানের রাস্তা ধ'রে চলে গেলো।

জাহ্নবী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—তার চেহারা তোর মনে আছে ?

মিশমিশে কালো মুখের উপর লালচে দুটি ঠোঁটে হাসির একটু ঝিলিক তুলিয়া বিচ্চু বলিল,—জরুর ! বেশ জাঁদরেল চেহারা যে, ভোলবার মত নয়। মাথা নেড়া, মুখে দাড়ী, পরণে লুঙ্গী, গায়ে একটা গেঞ্জী। বয়সে আন্দাজ ত্রিশ বত্রিশ,—একটা চোখ আবার কাণা।

—দেখলে তাকে চিনতে পারবি?

—জরুর!

—আচ্ছা যা।

যেমন ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়াছিল, তেমনই ক্ষিপ্রভাবেই সে চলিয়া গেল। জাহ্নবী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—কেন একে এত পেয়ার করি, বুঝলে ত? কেমন গুছিয়ে কথাগুলি বললে, তুমিও এমন ক'রে বলতে পারতে না।

প্রখর দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া গৃহিণী বলিলেন,—আমি ত আর গোয়েন্দাগিরি ক'রব বলে তোমার সংসারে আসিনি!

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জাহ্নবী প্রশ্ন করিলেন—এ কথা বলবার মানে?

গৃহিণী মুখখানা ঘুরাইয়া উত্তর দিলেন—মানে তুমি কিছু বুঝতে পার নি? তুমি চাও তোমার বাড়ীর টিকটিকিটি পর্য্যন্ত জেনে রাখে—পুলিশের মার্কা তার গায়ে আঁকা আছে, সন্দেহ ও সন্ধান নিয়ে তোমার মন যোগাতে হবে। ও ছোঁড়া খুব চালাক, তোমাকে বেশ চিনেছে, যা চাও, তাই যোগান দেয়। আমরা পারিনি, কিন্তু ও পেরেছে। তাতেই পেয়ার-করে ওটাকে এমনি বাড়িয়ে তুলেছ যে—ও-হারামজাদা আমাদের পেছনেও গোয়েন্দার মত ঘুরতে সাহস পায়! ছি—ছি!

সত্যই, বিচ্চুকে শিখাইয়া-পড়াইয়া ইতিমধ্যেই জাহ্নবী এমন করিৎকর্ম্মা করিয়া তুলিয়াছেন যে, তাহার আদর দেখিয়া গৃহিণী-পর্য্যন্ত তাহাকে স্বামীর গোয়েন্দা সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু জাহ্নবীর তাহাতে দুঃখ নাই। বরং মুখখানি প্রসন্ন করিয়াই তিনি বলিলেন,—বিচ্চুর পক্ষে এটা উঁচুদরের একটা সার্টিফিকেট! কিন্তু ও-কথা থাক, আমার মনে হচ্ছে কি জান?

চিঠিখানার পেছনে একটা প্রকাণ্ড রহস্য আছে! উৎপাত একটা আসছে বোধ হয়।

দরজার পরদা আবার দুলিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল বিচ্চু। তাহার মুখখানি দেখিয়া মনে হইতেছিল—কোন দুঃসংবাদ সে বহন করিয়া আনিয়াছে!

প্রশ্নের পূর্ব্বেই সে এক নিশ্বাসে জানাইল,—মীনাবাজারের রাজারাম মাড়োয়ারীর গদীতে কাল রাত্তিরে ভারি ডাকাতি হ'য়ে গেছে। পাঁচ হাজার টাকা লুঠ হ'য়েছে! ফাঁড়ির দারোগা লালজী ভেট করতে এসেছেন।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়াই জাহ্নবী মিত্র উঠিলেন। গৃহিণীর বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করিয়া উঠিল; বুঝিলেন—স্বামীর অনুমান সত্য, উৎপাত বুঝি এই অলুক্ষণে চিঠিখানার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত!

বাহিরে আসিয়া জাহ্নবী দেখিলেন যে, দারোগা লালজীর সহিত মাড়োয়ারী রাজারামও উপস্থিত। ডাকাতির রিপোর্ট জাহ্নবীকে চমৎকৃত করিয়া দিল। রাত আন্দাজ বারোটার সময় রাজারাম সে-দিনের আমদানীর টাকাগুলি মিলাইয়া থলিতে ভরিয়াছে; এমন সময় নেড়া-মাথা, লুঙ্গি-পরা, দাড়িওয়ালা, এক-চোখ কাণা—এমনই দুষমণ চেহারার একটা লোক যেন মাটী ফুঁড়িয়া তাহার সামনে উঠিয়া দাঁড়াইল, পিস্তল তুলিয়া এক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাহাকে এমনই কাবু করিয়া ফেলিল যে, টুঁ শব্দটিও করিবার ফুরসৎ সে বেচারা পায় নাই। তার পর যখন সে হাঁক-ডাক সুরু করে, ডাকু তার আগেই টাকার থলি লইয়া চম্পট দিয়াছে! রাখিয়া গিয়াছে এক কেতা লাল চিঠি।

চিঠিখানা দারোগা জাহ্নবীর হাতে দিল। সাদা লেফাপায় রাজারাম মাড়োয়ারীর নাম লেখা। লেফাপা খুলিতেই বাহির হইল লাল রঙের একখানা কাগজ; তাহাতে তিনটি ছত্রে সেই সাংঘাতিক শব্দ তিনটি লিপিবদ্ধ—একটু আগে বিচ্ছু চায়ের টেবিলে যে পত্রখানি দাখিল করিয়াছিল—অবিকল সেইরূপ!

—দশ—

এই বাহাদুর ডাকাতের সন্ধান এবং লাল চিঠি সংক্রান্ত রহস্যটুকুর মর্ম্মভেদ করিতে জাহ্নবী মিত্র সদলবলে সারা সব-ডিভিসন তোলপাড় করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এলাকায় ডাকাতি—এত বড় আস্পর্দ্ধা! কিন্তু এই অদ্ভুত ডাকাতটিকে ধরিবার বা রহস্যটার কিনারা করিবার মত কোন বাহাদুরীই তিনি দেখাইতে পারিলেন না। অথচ, এই ঘটনার পর—তিনটি মাসের ভিতর তাঁহার এলাকায় আরও কুড়ি জন বিশিষ্ট ধনীর বাড়ীতে অনুরূপ ডাকাতি হইয়া গেল! প্রতিবারই ডাকাতির রিপোর্ট পাইবার পূর্ব্বে বাহাদুরীর নমুনার নম্বরযুক্ত অনুরূপ লাল চিঠি তিনি প্রাপ্ত হন, এবং যথাকালে লুণ্ঠিত গৃহস্বামী ডাকাতির রিপোর্টের সহিত বাহাদুরের চিঠির অনুরূপ আর এক কেতা চিঠি দাখিল করিয়া তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। প্রত্যেক চিঠিতে ক্রমিক সংখ্যাটুকুর পার্থক্য ভিন্ন আর কোন প্রভেদ নাই! কিন্তু একুশটি রিপোর্টেই ডাকুর আকৃতিগত বিভিন্নতা ব্যাপারটাকে ক্রমশঃই জটিল করিয়া তুলিতে লাগিল। প্রথম রিপোর্টে প্রকাশ—ডাকুর মাথা নেড়া, একমুখ দাড়ী, পরণে লুঙ্গি এবং একচোখ কাণা।

কিন্তু এই ঘটনার তিন দিন পরে ছাগলব্যাপারী হুকুম শার ছাগল-বেচা তহবিল যখন ঐভাবে লুণ্ঠিত হয়, সে তখন স্পষ্টই দেখিয়াছে—ডাকুর মাথায় বাবরি চুল, দাড়িগোঁফের চিহ্ন মাত্র নাই; পরণে হাফ-প্যাণ্ট, চোখে চশমা।—প্রাপ্ত লাল চিঠিখানার দ্বিতীয় পংক্তিতে লেখা ছিল—নমুনা নম্বর দুই।

পরদিনেই তিন নম্বরের নমুনায় সহরশুদ্ধ সকল লোক অবাক হইয়া গেল। জাহ্নবী মিত্রের শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কীয় কোন বিশিষ্ট আত্মীয় দেওঘরে সপরিবারে বেড়াইতে আসেন। নদীর ধারে একখানি সুন্দর বাংলো তাঁহাদের বাসের জন্য জাহ্নবী মিত্রই ঠিক করিয়া দেন। আত্মীয়ের নাম বিপিন বসু। সম্পর্কে তিনি জাহ্নবীর স্ত্রী সুহাসিনীর মামা। কলিকাতা পুলিসের স্পেশ্যাল ব্র্যাঞ্চে দীর্ঘকাল চাকুরী করিয়া সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন। যে-দিন তিনি সপরিবার সেই বাংলোয় উঠিলেন, সেই রাত্রিতেই সুহাসিনী স্বামীকে বলিলেন—তোমার বাহাদুর যে রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, মামা বেচারী তার খপ্পরে না পড়ে!

জাহ্নবী উত্তর দিলেন—সেখানে ঘেঁসবে না, তাঁর কাছে পিস্তল আছে। দুটো গুর্খা দারোয়ান সঙ্গে এসেছে, তা ছাড়া কোতোয়ালী থেকেও—তিনজন পাহারাওয়ালা বন্দুক নিয়ে সেই খানে গিয়ে পাহারা দিবে।

ঠিক এই সময় বিচ্চু একখানা খামে-আঁটা চিঠি হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিল ও সহজ স্বরে বলিল,—মামা বাবু পাঠিয়েছেন। ব'লে দিয়েছেন—ভারী জরুরী চিঠি, এখুনি জবাব চাই।

তাড়াতাড়ি লেফাপা ছিঁড়িতেই তাহার ভিতর হইতে রক্তবর্ণ জরুরী চিঠিখানা বাহাদুরীর তিন নম্বরের নমুনাসহ ক্রুদ্ধ বিষধরের ফণার মত বাহির হইল! জাহ্নবী অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে বিচ্চুর পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—চিঠি যে এনেছে, সে আছে, না ভেগেছে?

বিচ্চু নির্ভয়ে উত্তর দিল,—জবাব নেবে ব'লে দাঁড়িয়ে আছে; আর সে যে চেনা লোক হুজুর! মহল্লার চৌকিদার—ভুলুয়া।

ঝড়ের বেগে বাহিরে আসিয়া জাহ্নবী দেখিলেন, বিচ্চুর সংবাদ সত্য; লোকটা চৌকিদারই বটে। সে যাহা বলিল, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার

কিছু নাই। সে রোঁদে বাহির হইয়াছিল; পথে এক সাহেব তাহাকে রোখে। চিঠিখানা তাহার হাতে দিয়া বলে—মিত্তির সাহেবের মামাবাবু দরিয়া কুঠিতে উঠেছেন, এ তাঁরই চিঠি—জলদি সাহেবের কুঠিতে নিয়ে যাও; আর সাহেব যে জবাব দেবে—তা নিয়ে দরিয়া কুঠিতে যাবে। —চৌকিদার বেচারী কেমন করিয়া এমন জরুরী হুকুম ঠেলতে পারে?

মামাবাবুর খবর লইবার জন্য জাহ্নবী মিছিরকে হুকুম দিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহারই গুর্খা চাকর সমসের হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাংলোর হাতায় আসিয়া চীৎকার করিয়া জানাইল—কুঠিতে লুঠ হয়েছে, ডাকু এসেছিল। বাবুর চিঠি আছে, হুজুরকে সেলাম দিয়েছেন তিনি।

ইংরেজীতে দুই ছত্রে যে চিঠিখানা বিপিন বাবু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই,—"প্রিয় জাহ্নবী, বড় লজ্জার কথা যে—বাঘের ঘরেই ঘোগ ঢুকে তার মুখে কালি লেপে দিয়ে গেছে! তুমি এলে সব বলবো। যে চিঠিখানা রেখে গেছে পাঠাচ্ছি।"

সেই লাল চিঠি। দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সেই সাংঘাতিক চিঠিখানিও জাহ্নবীকে দেখিতে হইল। অনুরূপ চিঠি—একই বয়ান, বাহাদুরীর নমুনার তৃতীয় দফার মর্ম্মভেদী পরিচয়।

—এগারো—

তিন মাস পরের কথা। বেলা তখন দশটা। সদর কোতোয়ালীর খাস-কামরায় বসিয়া জাহ্নবী নিবিষ্টচিত্তে একখানি চিঠি পড়িতেছিলেন। ডাকে এ চিঠি আসে নাই, চিঠিখানি আনিয়াছে ডুমকা হইতে সরাসরি মোটর-বাইকে চড়িয়া এক পাঞ্জাবী জমাদার। ইহার প্রেরক সাঁওতাল পরগণার পুলিস বিভাগের বড় কর্তা মিষ্টার হুইলার। ডুমকা তাঁহার হেড-কোয়ার্টার; সেখান হইতে তিনি এই জরুরী চিঠি পাঠাইয়াছেন।

পত্রবাহক জমাদার চিঠিখানা পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাতে দিয়া চিঠির রসিদ লইয়া চলিয়া গেল। এভাবে আধা-সরকারী চিঠি পাইবার গুরুত্বটুকু, এই সাব-ডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত বিচক্ষণ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জাহ্নবী মিত্রের অবিদিত ছিল না। সুতরাং চিন্তাকুল চিত্তে খাস-কামরায় আসিয়া তাঁহার উপরওয়ালার এই জরুরী পরোয়ানাখানিতে মনসংযোগ করিয়াছেন। ইংরেজী চিঠি, বাংলা ভাষায় তাহার অনুবাদ এইরূপ—

> প্রিয় মিষ্টার মিটার,
>
> তুমি নিশ্চয়ই জান যে, বৃটিশ-সরকার যোগ্যতার পুরস্কার দানে যেমন সিদ্ধহস্ত, অযোগ্যকে দণ্ডদান করিতেও তেমনই অভ্যস্ত। এ অঞ্চলের তিনটি বড় বড় ডাকাতি-ব্যাপারে ডাকাতগুলোকে সদলে ধরিয়া দোষী প্রতিপন্ন করিতে পারায়

সরকার পুরস্কারস্বরূপ তোমাকে দেওঘর সব-ডিভিসনের পুলিশ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে প্রমোসন দেন। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা, সংপ্রতি তোমার এলাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। গত তিন মাসের ভিতর একুশটা ডাকাতি হইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই ডাকাতির সাফল্য পুলিশের ক্ষমতাকে উপেক্ষা ও উপহাস করিয়াছে। তুমি এ-পর্যান্ত কোনটারই কিনারা করিতে পার নাই। আরো বিচিত্র ব্যাপার—প্রত্যেক ডাকাতির পর ডাকাতের তরফ হইতে রীতিমত রিপোর্ট আসে দুমকার পুলিশ আফিসে, ও প্যাটনার স্বরাষ্ট্র-সচিবের দপ্তরে। ইহা হইতে সরকারের ও আমার মনের অবস্থা, এবং তোমার নিজের ভবিষ্যৎও তুমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছ। যাহা হউক, আজ হইতে ঠিক একটি মাস সময় দিয়া তোমাকে জানাই—এই সময় মধ্যেই এই রহস্যময় দস্যুদল নির্ম্মূল করা চাই-ই; অন্যথায় তোমাকে তোমার বর্ত্তমান পদের অযোগ্য বোধে সরমার থানায় ডিগ্রেড্ করিয়া

১১

রামভরসা চৌবেকে আর একবার চান্স
দেওয়া যাইবে। সুতরাং যাহাতে ডিগ্রেড্
না হইতে হয়—আশা করি, সেই চেষ্টাই
তুমি করিবে।

তোমার বিশ্বস্ত
হুইলার

মাসাধিক কাল হইতেই জাহ্নবী মিত্র এমনই এক অপ্রীতিকর পত্রের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। চিঠিখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তিনি অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

বস্তুতঃ, গত তিন মাসের মধ্যেই পর পর একই ধরণের একুশটি ডাকাতি হইল! সন্ধানী বুদ্ধি, শক্তি, কৌশল, দুঃসাহস—সমস্তই যথাযথভাবে প্রয়োগ করিয়াও এ পর্য্যন্ত এই সকল রহস্যময় ডাকাতির কোনটিরই তিনি কিনারা করিতে পারেন নাই।

ইহার পর এ-পর্য্যন্ত এই ধরণের সাংঘাতিক চিঠিগুলির সহিত এই বহুরূপী দস্যুর বাহাদুরীর যে সব ফিরিস্তি আসিয়াছে—টেবিলের উপর সাজানো একুশটি ফাইলের ভিতর হইতে সেগুলিও বুঝি মিষ্টার হুইলারের চিঠির মতই তাঁহাকে বিদ্রূপ-বিদ্ধ করিতেছে!

কি ভাবিয়া তিনি কলিং বেলটি টিপিলেন; শব্দ শুনিয়া আরদালী ছুটিয়া আসিল। জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ছোট সাহেব কোথায়?

আভূমি নত হইয়া আরদালী জানাইল—বাংলোয় আছেন।

এই ছোট সাহেবটি অপর কেহই নহেন, জাহ্নবীর আত্মীয়-স্থানীয় যিনি দরিয়া কুঠিতে বাসা পাতিতে না পাতিতেই বাহাদুরের কবলে পড়িয়াছিলেন

—সেই বিপিনবাবুর পুত্র, নাম সুদর্শন বসু, বয়স এখনও ছাব্বিশ পূর্ণ হয় নাই, দিব্য সুশ্রী যুবক। বি-এ পাশ করিয়া সি, আই, ডি, বিভাগে শিক্ষানবিশী করিতেছিল। বিপিনবাবু সম্প্রতি কলিকাতায় গিয়া পুত্রকে দেওঘরের বর্ত্তমান রহস্যময় ডাকাতির তদন্ত-সম্পর্কে জাহ্নবীর সহায়তা করিতে পাঠাইয়াছেন। সুদর্শন জাহ্নবীর সুবৃহৎ বাংলোর বাহিরের ঘরে বাসা পাতিয়াছে। এই প্রিয়দর্শন ছেলেটির সহিত পিতৃকুলের সম্বন্ধ থাকায় ইহার প্রতি গৃহিণী সুহাসিনীর আদর-যত্নের অন্ত নাই। জাহ্নবীও ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। সুদর্শন আগ্রহসহকারেই এই চাঞ্চল্যজনক ব্যাপারে তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং বড় সাহেবের পরবর্ত্তী মর্য্যাদার অধিকারী হওয়ায় 'ছোট সাহেব' আখ্যা পাইয়াছে।

সাহেবের চিঠিখানা জরুরী ফাইলটির ভিতর রাখিয়া জাহ্নবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আরদালী তাড়াতাড়ি হুক হইতে টুপীটি পাড়িয়া প্রভুর হাতে আগাইয়া দিল, এবং ফাইলটি লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। জাহ্নবী বাংলোর দিকেই চলিলেন।

—বারো—

ড্রয়িং-রুমে ঢুকিয়াই জাহ্নবী দেখিলেন, দুর্গা একখানা বই কোলে করিয়া বসিয়া আছে, মুখখানা বিষণ্ণ ও বিবর্ণ। প্রতাপ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনার পর হইতেই ভ্রাতুষ্পুত্রীর এই মনোবিকার তিনি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন।

পদশব্দে বুঝি দুর্গার চমক ভাঙ্গিল। পিতৃব্যকে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। জাহ্নবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুদর্শন কোথায় রে?

দুর্গা কোন উত্তর দিল না, মুখখানা ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

জাহ্নবীর মনের অবস্থা একেই ভাল ছিল না, ভ্রাতুষ্পুত্রীর এই উপেক্ষা লক্ষ্য করিয়া যেন জ্বলিয়া উঠিলেন; রুক্ষস্বরে কহিলেন,—কথাটা কি কানে ঢুকল না তোমার? সুদর্শন কোথায়—জিজ্ঞাসা করা হ'য়েছে!

দুর্গা এই সর্ব্বপ্রথম শ্রদ্ধাভাজন কাকার কথার প্রতিবাদ করিল; উত্তরে নিরস স্বরে কহিল,—আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রছেন কেন? বাইরের লোকের খবর রাখা কি আমার কর্ত্তব্য ব'লতে চান কাকাবাবু?

কথাগুলি জাহ্নবীকে বুঝি স্তব্ধ করিয়া দিল, অথবা ক্রোধের প্রাচুর্য্যে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল।

বিচ্চু এই সময় পরদাটি তুলিয়া তাহার কালো মুখখানা বাড়াইয়া কহিল, —ছোট সাহেব বাগিচায় বেড়াচ্ছেন, ডেকে দেব?

জাহ্নবী কহিলেন,—হ্যাঁ, এখানে আসতে বল।

দুর্গা মুখখানা নত করিয়া ভিতরে যাইতেছিল; জাহ্নবী বাধা দিয়া কহিলেন,—যেয়ো না তুমি, ব'স ঐ চেয়ারে, কথা আছে।

পাশের চেয়ারখানা দেখাইয়া দিয়া জাহ্নবী তাঁহার নিজের চেয়ারে বসিলেন। এই সময় গৃহিণী আসিলে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—তুমিও ব'স। সুহাসিনী বসিলে দুর্গাকেও নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানায় বসিতে হইল।

জাহ্নবী বলিলেন,—আমার ত সুনাম, সম্মান দুটোই গেছে, চাকরীও যাবার দাখিল হ'য়েছে। এক মাসের মধ্যে যদি এই ডাকাতিগুলোর কিনারা ক'রতে না পারি, ওপরওয়ালা আমাকে ডিগ্রেড করবে। এখন একমাত্র ভরসা আমার ঐ সুদর্শন। কিন্তু ওকে যদি আমরা পর ক'রে রাখি, অর্থাৎ দুর্গা যদি ওকে ও-ভাবে অবহেলা করে, তাহ'লে ওকেও আমাকে মানে মানে বিদেয় দিতে হবে। এখন আমি জানতে চাই—দুর্গার ইচ্ছাটা কি? সুদর্শনকে বিদেয় ক'রে দেব?

দুর্গা মুখখানা তুলিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল,—আমার ইচ্ছার সঙ্গে সুদর্শন বাবুর এখানে থাকা না থাকার কি কোন সম্বন্ধ আছে কাকাবাবু?

জাহ্নবী স্বরে জোর দিয়া বলিলেন,—আছে। সেই হা-ঘরে প্রতাপটা যে দিন এখানে এসেছিল, তখন ত তার সঙ্গে মেলা-মেশার কথা তোমাকে ব'লতে হয়নি। সুদর্শন আমাদের তার চেয়েও অনেক বেশী আপনার লোক এবং হিতৈষী। প্রতাপ আমাকে অপদস্থ করে ভয় দেখিয়ে চলে যায়, আর—এ ছোকরা এই দারুণ সঙ্কটের সময় আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

দুর্গা এবার তাহার কাকার মুখের উপর দুই চক্ষুর দৃষ্টি গভীরভাবে নিবদ্ধ করিয়া কহিল—তাহলে বলুন কাকাবাবু, আমাকে কি করতে হবে, আমি এখন থেকে নির্ব্বিচারে তাই করব।

জাহ্নবী সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—আমার ইচ্ছা, তুমি সুদর্শনের সঙ্গে বেশ সহজভাবেই কথাবার্ত্তা কও, মেলা-মেশা কর; প্রতাপের সঙ্গে যেমন—

প্রতাপের নাম উঠিতেই দুর্গার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল, গলাটাও বুঝি ধরিয়া আসিল। কষ্টে মনের ভাবটুকু দমন করিয়া দুর্গা এই সময় কাকার কথাটায় বাধা দিয়া বলিয়া ফেলিল,—প্রতাপবাবুর কথা এখানে নাই বা তুললেন কাকাবাবু! যাঁর সম্বন্ধে কথা আপনি ব'লছেন, বেশ—এখন থেকে তাই হবে। সব সঙ্কোচ কাটিয়েই আমি সুদর্শনবাবুর সঙ্গে মিশবো।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভ্রাতুষ্পুত্রীর আরক্তিম মুখখানার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে জাহ্নবী কহিলেন,—বেশ, এ-কথা শুনে আমি খুসী হলুম।

সুহাসিনী এতক্ষণে স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—ছেলেটা ত এসে অবধিই গোয়েন্দাগিরি করে গায়ের রক্ত জল করে ফেললে। যেটুকু সময় বাড়ীতে থাকে, কথা বলবার একটা সঙ্গী পেলে ওর মনেও আহ্লাদ হয়। আর যে-বংশের ও ছেলে, ডেপোমী কি জেঠামী ওদের কুষ্টিতেও লেখে নি।

সহসা দরজার পরদা নড়িয়া উঠিল ও তাহার পিছন হইতে সুদর্শন কহিল,—আমাকে ডাকছিলেন দাদাবাবু?

জাহ্নবী কহিলেন,—হ্যাঁ হে! ভেতরে এসো। এত লজ্জা তোমার কেন বল ত?

সুদর্শন ভিতরে আসিতেই জাহ্নবী দুর্গার ঠিক সামনের চেয়ারটির দিকে হাতখানি বাড়াইয়া বলিলেন,—ব'স, কথা আছে।

চেয়ারে বসিয়াই তাহাকে সোজা চাহিতে হইল; ফলে দুর্গার বিস্ফারিত চক্ষুর নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টির সহিত তাহার মুগ্ধ দৃষ্টির সংযোগ হইয়া গেল। দুর্গা লজ্জায় চক্ষু দুটি মুদিল না, মুখখানাও ফিরাইয়া লইল না। সুদর্শন বিস্মিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরে হর্ষ-শিহরণ জাগিল।

জাহ্নবী গম্ভীরভাবে উপরওয়ালার চিঠিখানা সুদর্শনের দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন,—মিষ্টার হুইলারের ওয়ার্ণিং। প'ড়ে দেখ।

চিঠিখানা সাগ্রহে লইয়া ও এক নিশ্বাসে পাঠ করিয়া সুদর্শন তাহার সুন্দর মুখখানা শক্ত করিয়া কহিল,—আপনি ভাববেন না দাদাবাবু, এর মধ্যেই আমি এই বদ্‌জাত ডাকুটাকে খুঁজে বা'র করবই—এ আমি প্রমীজ করছি আপনার কাছে।

জাহ্নবীর ম্লান মুখখানা ক্ষণেকের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুহাসিনী হাসিমুখে বলিলেন,—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।

দুর্গাও দুই চক্ষুর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া আর একবার সুদর্শনের দিকে তাকাইতেই পুনরায় তাহাদের চোখাচোখী হইল।

জাহ্নবী সহসা মুখখানা শক্ত করিয়া বলিলেন,—আমিও ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ করেছি সুদর্শন—আমার তরফ থেকে আমার কোন হিতার্থী যদি এ ব্যাপারে আমার মুখ রক্ষা করতে পারে, আমি তার নামে ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দেব—তাকে কিছুই আমার অদেয় থাকবে না।

শপথটি শেষ করিয়াই তিনি অপাঙ্গে দুর্গার দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টি অর্থপূর্ণ।

—তেরো—

কাকার নিকট সে-দিন দুর্গা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহার অন্যথা হয় নাই। নারী-সুলভ সঙ্কোচ ও আড়ষ্টতার প্রভাব বহু পূর্ব্বেই সে কাটাইয়া আসিয়াছে। কলেজে পড়াশুনা, এবং পিতার ছাত্রগণের সহিত অসঙ্কোচে আলাপ-আলোচনার ফলে পুরুষদের সহিত মিশিবার সামর্থ্য ও যোগ্যতা তাহার রীতিমতই ছিল। সুতরাং সুদর্শন এই মেয়েটির সংস্পর্শে আসিয়া, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও বাকপটুতায় চমৎকৃত হইল। সুহাসিনী আশ্বস্ত হইলেন, মুখ টিপিয়া হাসিয়া স্বামীকে জানাইলেন—সুদর্শন দেখছি খেলোয়াড় ছেলে, হাজার হোক্, কলকেতায় ছেলেবেলা থেকেই মানুষ কি না, চটক আছে সব দিকেই; তাই, এক দিনেই এমনই ভাব জমিয়ে তুলেছে দুর্গার সঙ্গে—যেন কত কালের চেনাশোনা, কত গভীর ভাব দু'টিতে !

জাহ্নবী মুখখানা প্রসন্ন করিয়া বলিলেন—এটা সুলক্ষণ নিশ্চয়ই। দুর্গার মতন চাপা মেয়ের মনের ঢাকাটি সুদর্শন যখন খুলতে পেরেছে, তখন আশা হচ্চে, বাহাদুরের লাল রোকার রহস্যটাও খোলা ওর পক্ষেই সম্ভব হবে। আমি ওকে পাকে-প্রকারে জানিয়ে দিয়েছি—বাহাদুরের ব্যাপারটার ও-যদি কিনারা করতে পারে, পুলিশ-লাইনে ভালো পোষ্ট ত একটা পাবেই, তার ওপরে ফাউ—ঐ দুর্গা।

সুহাসিনী ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সেটা-ও ভালো ক'রেই বুঝেছে, তুমি দেখে নিও—মুখ তোমার ও রাখবেই।

মেয়েলী একটা কথা আছে—'মিটমিটে ডান ছেলে খাবার রাক্ষস!' অর্থাৎ এক শ্রেণীর মানুষ আছে, লোকের কাছে বাইরের ভাবভঙ্গীতে জানাতে চায় তারা ভারি ভালো, মনের ভেতর তাদের কোন গলদই নেই। কিন্তু এদের ভিতরের স্বভাবটি লোভের সংস্পর্শে সঙ্কোচের আবরণ ভেদ করিয়া নগ্নভাবে যখন দেখা দেয়—সেসময় ঐ প্রবচনটাই ভুক্তভোগীরা স্মরণ করিয়া থাকেন।

দুর্গার সংস্পর্শে আসিয়া সুদর্শনের অবস্থাও ঠিক এইরূপ হইয়া দাঁড়াইল। যেদিন এই ছেলেটি প্রথম জাহ্নবীর বাংলোয় উপস্থিত হয়, তাহার লাজনম্র মধুর ব্যবহার, বিনয়বিজড়িত নম্র স্বর, লজ্জা ও সঙ্কোচাচ্ছন্ন গতিবিধি গৃহস্বামী ও গৃহিণীকে বিমুগ্ধ করিলেও, দুর্গা কিন্তু এই প্রিয়দর্শন ছেলেটির চোখ দুটির ভিতর দিয়াই তাহার ভিতরের প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছিল।

সুদর্শনের অগোচরে দুর্গাকে শুনাইয়া স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যখন এই অভিজাত ভদ্র যুবকটির সম্বন্ধে রীতিমত প্রশস্তি চলিত, দুর্গা তখন মনে মনে হাসিয়া ভাবিত—তাহার বাবার শিক্ষালয়ে এই ছেলেটির এরূপ অবাধ-প্রবেশ কখনই সম্ভবপর হইত না—দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহাকে চরিত্র গঠনের জন্য সাধনা করিতে হইত।

দুর্গার অগ্নিশিখাবৎ রূপজ্যোতি সুদর্শনের চক্ষু দুটিকে প্রথম দর্শনেই ঝলসিত করিয়া দেয়,—কিন্তু অন্তরের দুর্ব্বলতাটুকু ঢাকিবার জন্য এমনভাবে লজ্জা-সঙ্কোচের আবরণ তাহাকে টানিতে হইত যে, তাহার প্রকৃতির এই আপাতমধুর সৌন্দর্য্যে সস্ত্রীক জাহ্নবী মুগ্ধ না হইয়া পারিতেন না। দুর্গার কিন্তু এ সব বালাই ছিল না। অপরিচিত পুরুষের সংস্পর্শে আসিলেই সাধারণতঃ যে সঙ্কোচভাব বাঙ্গালী মেয়েকে আচ্ছন্ন করে, শৈশব হইতেই দুর্গা তাহার প্রভাবমুক্ত হইবার শিক্ষা পাইয়াছে। কাজেই, এই

অপরিচিত ছেলেটি এই পরিবারটির সংস্রবে আসিলে দুর্গার আচরণে সঙ্কোচের কোন নিদর্শনই যেমন পাওয়া যায় নাই, কোনরূপ আন্তরিকতাও সে তাহার আচরণে বা বচনে প্রকাশ করে নাই। চায়ের টেবিলে অসঙ্কোচেই সে সুদর্শনকে চা পরিবেষন করে, অন্যের অলক্ষ্যে সুদর্শনের সতৃষ্ণ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়িলেও সে স্থির থাকে—মুখখানা তাহার লজ্জায় এতটুকু আরক্ত হইয়া উঠে না,—অথচ এই রূপবান লাজুক ছেলেটির সহিত আলাপ করিবার বা মিশিবার কোনরূপ আগ্রহও সে প্রকাশ করে না। কিন্তু এই মেয়েটির সহিত মিশিবার বিপুল আগ্রহ-যে সুদর্শনকে ক্রমশঃ অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে, বাহাদুর ডাকাতের রহস্যোদ্ঘাটনে পুলিশ-সুপারকে সহায়তা করা অপেক্ষা দুর্গার দুর্গম অন্তরটির রহস্যোদ্ঘাটনেই যে তাহার উৎসাহ অধিকতর উদগ্র—দুর্গার তাহা অবিদিত ছিল না।

অথচ, কুলে শীলে বিদ্যায় অবস্থায় এই ছেলেটি অতিবাঞ্ছিত পাত্র হইলেও তাহার বৈরাগ্য যে কত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার আশা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। এ সম্বন্ধে সুদর্শনের দৃঢ় যুক্তি এই যে, পুলিশ-বিভাগের কোন উচ্চপদ অলঙ্কৃত করিবার পূর্ব্বে সে বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে না। পিতার চেষ্টায় কলিকাতা-পুলিশের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে শিক্ষানবিসীরূপে সে প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এই বিভাগের দ্বাররক্ষী কনেষ্টবল গুলিও মাসান্তে যে-পরিমাণ তলব পাইয়া থাকে, সুদর্শন তাহাতেও বঞ্চিত; সে এখানে য়্যাপ্রেন্টিস মাত্র, কতদিন পরে যে তাহার নাম বেতনভোগীদের তালিকায় উঠিবে, কে জানে! এ অবস্থায় কেমন করিয়া সে জীবন-সঙ্গিনীর ভার বহন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে?

পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পিতা উদ্বিগ্নই ছিলেন। দেওঘরে আসিয়া

তিনি জাহ্নবীর ভাগ্যোন্নতির কাহিনী শুনিলেন, তাঁহার মনে তখন এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল যে, বাঙ্গলার বাহিরে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাগ্যোদয়ের ক্ষেত্র এখনও উন্মুক্ত আছে। জাহ্নবীও কথাটা স্বীকার করিলেন। তিনি সুদর্শনকে জানিতেন। বলিলেন—চমৎকার ছেলে, চেহারার চটকেই সে চাকরী পাবে। আপনি যদি সুদর্শনকে পাঠান, আমি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে ওয়াকিভহাল করে একটা ভাল পোষ্টে বসিয়ে দেব।

বিপিন বাবু দেওঘরে যেদিন আসেন, জাহ্নবীর বাংলোতেই মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা তাঁহাদের ছিল। সেই সময়ই সুদর্শনের সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা হয়। এই সঙ্গে গোপনে আরও একটি কথা এক রকম পাকা হইয়া যায়। দুর্গাকে দেখিয়া সস্ত্রীক বিপিন বাবু অত্যন্ত আনন্দিত এবং পুত্রের ব্রত ভঙ্গের সম্বন্ধে আশান্বিত হন। অতঃপর দুই পরিবারের মাতব্বরদের গোপন-বৈঠকে এক রকম সাব্যস্ত হইয়া যায় যে, বিপিন বাবুরা কলিকাতায় গিয়াই সুদর্শনকে পাঠাইয়া দিবেন, সে এইখানে থাকিয়া জাহ্নবীর সহযোগিতা করিবে। জাহ্নবী তাহাকে যেমন করিয়া হউক একটা ভাল পোষ্টে বসাইয়া দিবেনই। আর এখানে থাকিতে থাকিতেই দুর্গার মত মেয়ের রূপের ঝলকে সুদর্শনের মনের জিদটুকুও ভাঙ্গিয়া যাইবে। ইহার উপর সুহাসিনী মামীকে চুপি চুপি বলিয়াছিলেন—একবারে ঠকতেও হবে না, দুর্গার বাবা মেয়ের জন্যে তিন হাজার টাকা নগদ রেখে গেছে, আর গয়নাপত্তর যা আছে—তাও চার হাজারের কম নয়।—শেষের খবরটি শুনিয়াই মামীর মনে প্রাপ্তি সম্বন্ধে যে খুঁতটুকু ছিল, তাহাও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

কিন্তু পরামর্শটি খুব গোপনে হইলেও, বিচ্চুর কানদুটিকে চাপা দিতে পারে নাই। এ-বাড়ীর মেয়ে দুর্গা এবং অভ্যাগত অতিথিদের পুত্র

সুদর্শন নামক ছেলেটিকে লইয়া যে-সব আলোচনা সুহাসিনীর রুদ্ধ কক্ষের বৈঠকে একটি ঘণ্টা ধরিয়া চলিয়াছিল, এই সতর্ক ছেলেটি অতি সন্তর্পণেই রুদ্ধ কক্ষের আলোচ্য বিষয়বস্তুটি তাহার মনের খাতায় লিখিয়া লইয়াছিল।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বিপিনবাবু সস্ত্রীক তাঁহার বাসায় চলিয়া যান। এই সম্মানভাজন আত্মীয় অতিথিদের সম্বর্দ্ধনা ও আলোচনার মধ্যে বাহাদুরের প্রসঙ্গটা উঠিবার আর সুযোগ পায় নাই।

রাত্রি দশ ঘটিকার সময় দুঃস্বপ্নের মত এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা যখন সহসা সুহাসিনীর স্নায়ুমণ্ডল আলোড়িত করে এবং তাঁহার মুখেই আত্মীয়দের নিরাপত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে,—তাহার পূর্ব্বেই-যে বাহাদুর সুহাসিনীর সন্দেহকে কঠোর সত্যে পরিণত করিয়া বিপিনবাবুর মূল্যবান রিভলভারটিকেই তাহার তিন-নম্বরের বাহাদুরীর নিদর্শন সরূপ লইয়া যায়—তাহা আগেই প্রকাশ পাইয়াছে।

এই দুর্ঘটনার পর, ব্যাপারটির কিনারা করিবার জন্য বিপিনবাবুও মরিয়া হইয়া উঠেন। তাঁহার অপহৃত রিভলভারটির উদ্ধার এবং এই রহস্যময় দস্যুলীলার নায়ক বাহাদুরকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য জাহ্নবীর সহযোগিতায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ ব্যাপী ব্যর্থ চেষ্টায় তিনি যখন হিমসিম খাইয়া গেলেন, উপরোক্ত তাঁহাদের এই বিপুল উদ্যোগ ও রীতিমত সতর্কতাকে ব্যঙ্গ করিয়া বাহাদুর তাহার বাহাদুরীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়াইয়া চলিল, তখন বিপিনবাবু হাল ছাড়িয়া দিয়া দেওঘরের বাসা তুলিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যান ও তাহার এক সপ্তাহ পরেই সুদর্শনের আবির্ভাব ঘটে।

সুদর্শনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া যায়। চেহারা, তৎপরতা, আভিজাত্যের দম্ভ, দৈহিক শক্তি এবং সর্ব্বোপরি

পুলিশ-সুপারের ঢালাও ক্ষমতা—এইগুলির সহায়তায় অবিলম্বেই সকলকে জানাইয়া দেয় যে—সে এখানে কেউ কেটা নয়।

কিন্তু বাংলোয় এই পরিবারটির সংস্পর্শে চায়ের টেবিলে, ভোজন-গৃহে বা বিশ্রম্ভালাপে দক্ষ অভিনেতার ভঙ্গীতে এমন ভাবে সে বিনয় সঙ্কোচ ও লজ্জা প্রকাশ করিত যে, জাহ্নবী ও সুহাসিনীর তাক লাগিয়া যাইত। কিন্তু ইহারই মধ্যে এই ভিজা-বিড়ালটির বুভুক্ষু দৃষ্টি অন্তের অলক্ষ্যে যখন দুর্গার মুখখানির দিকে বক্রগতিতে নিবদ্ধ হইত, দুর্গা তখন মনে মনে হাসিত। মানব-চরিত্র-নির্ণয়ে শিক্ষিতপটু এই মেয়েটি এক নজরেই এই বিড়াল-তপস্বীর অন্তরটির সত্য পরিচয় পাইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এইটুকু যে, জাহ্নবীর মত বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং সুহাসিনীর মত পাকা গৃহিণী এই ছেলেটির যে-বিপুল লজ্জা ও সঙ্কোচকে তাহার চরিত্রের অলঙ্কার বলিয়া জোর গলায় প্রচার করিতেন, দুর্গা তাহাকেই সাংঘাতিক রকমের লালসা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিল।

দুর্গার এ-অনুমান যে মিথ্যা নয়,—পিতৃব্যের নির্দ্দেশ মত যেদিন সে প্রথম সুদর্শনের সহিত অসঙ্কোচে মিশিল, তাহার ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিকটুকু তুলিয়া প্রথম মুখ খুলিল, সেই দিনই তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

এক ঘণ্টার মধ্যেই সুদর্শন তাহার লজ্জার আবরণটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া এমন ভাবে এই সদ্যোপরিচিতা মেয়েটির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে ঝুঁকিল যে, তাহার মত ভদ্রবংশীয় শিক্ষিত যুবার পক্ষে কোন মতেই যাহা সুশোভন নহে। ঝাঁ করিয়া অমনি দুর্গার মনে এই ছেলেটির সম্বন্ধে পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নীর অনর্গল প্রশংসা মনে পড়িয়া গেল। দুর্গার মনের হাসির আভাটুকু বুঝি তাহার মুখে পড়িয়াছিল, তাই সে পুলকিত

হইয়া ভাবিল—আর কি, নিতান্ত দুর্ভেদ্য ভাবিয়া যে দুর্গটির উপর সে 'চড়াও' করে নাই, প্রথম আলাপেই তাহার দরজা খুলিয়া গিয়াছে। এখন এই খোলা দুর্গে ঢুকিতে বা জয় করিতে কতক্ষণ!

কল্পিত এই আনন্দের আবেগে সুদর্শন কথার মোড়টি হঠাৎ ফিরাইয়াও এক মুখ হাসিয়া কহিল—আপনি কিন্তু খুব চাপা মেয়ে, এ বিষয়ে মহাভারতের কুন্তীকেও হারিয়ে দিয়েছেন।

দুর্গা—কেন বলুন ত? কি ভেবে ঐ উপমাটি দিলেন? কোন্ গুপ্ত কথাটি আমি চেপে রেখেছি?

সুদর্শন—অনেক। আলাপটা আমাদের আজই প্রথম হচ্ছে। কিন্তু আমি কবে এখানে এসেছি বলুন ত? আজকের দিনটা ধরে এক সপ্তাহ তিন দিন হল না?—অর্থাৎ পরিপূর্ণ দশটা দিন?

দুর্গা—তা হবে।

সুদর্শন—তাহলে হিসেব করুন ত কতগুলো ঘণ্টা! একটা অহোরাত্রির পরিমাণ যদি চব্বিশ ঘণ্টা হয়, তাহলে দশটি দিবারাত্রির ঘণ্টা হিসেব করলে ২৪০ ঘণ্টা হয় না কি?

দুর্গা—তা হয়।

সুদর্শন—এ থেকে বাদ দিন দৈনিক দশটি ঘণ্টা; কারণ, আহার আছে, নিদ্রা আছে, বাজে কাজও কিছু আছে। তাহলে, দশ দিনে একশো ঘণ্টা বাদ দিয়ে হাতে থাকে একশো চল্লিশটি ঘণ্টা। এখন হিসেব করে বলুন, ক্ষতি কতটা করেছেন?

দুর্গা—আমি ত আপনার মতন পণ্ডিত নই, অঙ্কশাস্ত্রে মেধাও আমার কিছু মাত্র নেই। তা ছাড়া, লাভও কোন দিন বুঝি নি, লোকসানের হিসেবও খতাইনি। কাজেই বুঝতে কিছুই পারছিনে।

সুদর্শন—তাহলে আপনি দেখছি সত্যিই হোপলেস! যে মেয়ের চেহারায় এতখানি চটক, চোখে মুখে প্রতিভার আভা জ্বল জ্বল করে, তার পেটে বুদ্ধি নেই? এ হতেই পারে না। এমন সোজা হিসেবটা সত্যিই আপনি বুঝতে পারেন নি? সত্যিই?

দুর্গা—আপনি কলকেতার ছেলে, কত পড়া শোনা করেছেন, কত দিক দিয়ে কত অভিজ্ঞতা পেয়েছেন, অজ পাহাড়ে দেশের মেয়ে আমি—আপনার মনের কথা বোঝা কি আমার কাজ?

সুদর্শন—আপনিত পাটনায় ছিলেন শুনিচি, লেখা পড়াও জানেন, স্কলারসিপ পেয়েছিলেন ম্যাট্রিকে, কলেজেও পড়েছেন—

দুর্গা—সে গুড়ে বালি। পরে আমাকে পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে সরে পড়তে হয়েছিল। আর পাটনার কথা যা বলছেন—সেও ত ছাতুর দেশ। আপনাদের নকল করেই ত ওরা আজ ভব্য হয়েছে। কাজেই কোন দিক দিয়েই আপনার বুদ্ধির সঙ্গে আমার বুদ্ধির তুলনা হতে পারে না। এখন বলুন—কি ক্ষতিটা আমি আপনার করেছি দশটা দিনে?

সুদর্শন—শুনবেন? আচ্ছা, তাহলে একটা হিসেব ধরুন—

দুর্গা—মাপ করুন, বরাবরই আমি বে-হিসেবি। ওজিনিষটি আমার মাথায় মোটেই ঢোকে না, ভুলে মরি।

সুদর্শন—পরিষ্কার হিসেব, শুনুন না বলি—আচ্ছা, ঠিক এক ঘণ্টা হতে চললো, আপনি আমার কাছে মুখ খুলেছেন, নয় কি?

দুর্গা—তা হবে।

সুদর্শন—এই একটি ঘণ্টায় যে সংলাপ আমাদের মধ্যে হয়েছে, তার শব্দগুলো গণনা করলে কত হবে বলুন ত? খুব কম করে ধরলেও হাজারের কম নয়। অতএব, ভেবে দেখুন—এক ঘণ্টায় আমরা দুজনে

এক হাজার শব্দ সৃষ্টি করেছি। তাহলে এক শো চল্লিশ ঘণ্টায় কত হাজার শব্দ আমাদের মুখ দিয়ে বেরুত বলুন ত? একে ক্ষতি করা বলে না?

দুর্গা—আপনার এই অপূর্ব্ব আবিষ্কারটির জন্ত কি পুরস্কার দেব বলুন ত?

সুদর্শন—বলব?

প্রশ্নের ধারায় কথাটা বলিয়াই সুদর্শন লোলুপদৃষ্টিতে দুর্গার কৌতুকোজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিল মাত্র, পরবর্ত্তী কথাগুলি আর তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া দুর্গা বলিল—ওকি, হোঁচট খেলেন যে! বক্তব্যটা বলে ফেলুন। বলুন—কি পুরস্কার আপনাকে দেব?

সুদর্শনের সাহস এবার চরমে উঠিল। যে-উত্তরটা বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিল না, মুখে বাধিতেছিল, দুর্গার প্রশ্নটার পুনরুক্তি সে বাধা বুঝি ভাঙ্গিয়া দিল। পরক্ষণেই সে সবেগে সামনে ঝুঁকিয়া—নিপুণ শিল্পীর হাতে রচিত মৃন্ময় প্রতিমার করপল্লবের মত দুর্গার অনবদ্য হাত-দুইখানির মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে ভাবাদ্রস্বরে কহিল—বুঝতে পেরেছ ত, কি চাই?

কিন্তু হঠাৎ যে কি হইয়া গেল, সুদর্শন তাহা ঠিক করিতে পারিল না। তড়িতাহত হইলে মানুষ যে ভাবে ঝাঁকুনি খাইয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, সুদর্শনের দেহের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল। তাহার সমগ্র মুখমণ্ডল ঝলসিত করিয়া যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ বহিয়া গেল, তাহার মনে হইল, কোনরূপ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সহসা তাহার মাথাটা ঘুরাইয়া দিয়াছে এবং কোন রকমে সে খাড়া আছে। প্রকৃতিস্থ হইয়া সামনের দিকে

চাহিতেই সে দেখিল—এই সুযোগে তাহার সঙ্গিনীটি হাত দুইখানি ছাড়াইয়া লইয়া এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে যে, পুনরায় হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরা কঠিন।

চোখোচোখি হইতেই একটা চাপা মৃদু হাসি দুর্গার ঠোঁট দুখানির উপর খেলিয়া গেল, পরক্ষণেই সে পরিহাস-তরল-কণ্ঠে কহিল—অতবড় হিসিবি মানুষ হয়েও আপনি এত বড় ভুল করে বসলেন সুদর্শন বাবু!

সদ্যোপরিচিতা সঙ্গিনীর বিহসিত মুখখানির উপর দৃষ্টি পড়িতেই সুদর্শন বুঝিয়াছিল, সে রাগ করে নাই। সুতরাং মনে মনে নিজের দুঃসাহসটির তারিফই করিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ এই কয়টি শ্লেষাত্মক কথা তাহাকে একটু চমকিত করিল, কথাটার অর্থ ঠিক ধরিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে তাহার এই রহস্যময়ী সঙ্গিনীর পানে চাহিয়া রহিল।

দুর্গার মুখের চাপা হাসি তখনও অদৃশ্য হয় নাই, হাসিটুকু আরও কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট করিয়া সে কহিল—আপনি দেখছি কিলিয়ে কাঁচা কাঁঠাল পাকাতে চান! কিন্তু সেটা কি সম্ভব সুদর্শন বাবু?

সুদর্শন তথাপি নিরুত্তর। কথাগুলি দুর্বোধ্য হইলেও তাহাকে ক্রমশঃই কৌতূহলাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল।

দুর্গা কহিল—আপনি ত কলেজে পড়েছেন, বলুন ত—প্রফেসরের একশো চল্লিশ ঘণ্টার লেকচারগুলো অবহেলা করে, শেষে এক দিনের এক ঘণ্টা লেকচার শুনেই সাফল্যের দাবী করাটা কি ঠিক?

সুদর্শন এতক্ষণে কথাটা বুঝিল ও মুখখানা শক্ত করিয়া সদর্পে উত্তর দিল—নিশ্চয়ই, প্রফেসরের লেকচারে য়্যাটেণ্ড না করলেও এক ঘণ্টার ভেতরেই আমি যে ১৪০ ঘণ্টার নোটগুলো জেনে নিয়েছি। যারা বুদ্ধিমান, তারা বরাবরই সর্ট কার্ট খোঁজে। আগে কলকেতা থেকে দেওঘর আসতে

দশ দিন সময় লাগতো, এখন ট্রেনে সাত ঘণ্টায় আসা যায়, আর এরোপ্লেনে উঠলে এক ঘণ্টাও লাগে না। অতএব আপনিও মনে মনে ধরে নিতে পারেন—এরোপ্লেন চালিয়েই আমি আপনার মনোরাজ্যে পাড়ি দিয়েছি।

দুর্গা—তাহলে আপনার আর একটা পরিচয়ও পেলুন। শুধু উঁচুদরের হিসেবনবিশীই আপনি নন, সেই সঙ্গে মনস্তত্ত্বের ওস্তাদ! এক ঘণ্টাতেই আপনি মানুষের মনোরাজ্যের ওপর জয়পতাকা ওড়াতে পারেন।

সুদর্শন—যারা শক্তিমান আর দুঃসাহসী এটা তাদের পক্ষেই সম্ভব। ইতিহাসে পড়েননি—জুলিয়াস সিজার এসিয়ায় এসেই বলেছিলেন—এলুম, দেখলুম আর জয় করলুম। তারপর আফ্রিকায় গিয়ে মিশর-রূপসী ক্লিওপেট্রাকে জয় করতেও তাঁর এক ঘণ্টার বেশী সময় বোধ হয় লাগেনি।

দুর্গা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সুদর্শন স্থির দৃষ্টিতে তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—হাসলেন যে?

হাসি-মুখেই দুর্গা উত্তর দিল—আপনার আইডেন্টিফিকেসনের মহা-মানুষটিকে দেখে। ভাগ্যিস্—ইতিহাসের পাতায় সিজারের নামটি ছিল! নইলে, দুঃসাহসী প্রেমিকদের অবস্থা যে কি হ'ত সেটা ভাবতেও কষ্ট হয়। মুস্কিল হয়েছে মেয়েদের। যদি তারা পথে ঘাটে, ট্রেনে, জাহাজে কিম্বা কোন মজলিসে এমন দুঃসাহসী পুরুষদের পাল্লায় প'ড়ে মনের কবাটটি খুলে দেন, কিম্বা প্রাণ খুলে একটু হাসেন,—অমনি সিজারের ভূত এসে ঐ দুঃসাহসী পুরুষগুলোর ঘাড়ে চেপে বসে, আর তাদের মুখ দিয়ে সিজারের কথাগুলোই বেরিয়ে পড়ে—ভিনি, ভিডি, ভিসি!—এলুম, দেখলুম, জয়

করলুম! আমার বানানো কথা নয়, অনেকগুলির নজীরও দেখাতে পারি।

সুদর্শন দমিল না কিম্বা কথাটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টাও করিল না, গলার স্বরে জোর দিয়া সে কহিল—সিজারের ভুত যাদের ঘাড়ে চাপে, তারা কখনো পেছোয় না, জিৎ জেনেই তারা এগোয়। পরের কথা শুনে ত কিছু লাভ নেই—নিজের ব্যাপারেই জেনেছি—আমার ক্লিওপেট্রা নিজেই তাঁর দুর্গদ্বারটি আমার সামনে খুলে দিয়েছেন।—কথা কয়টি বলিতে বলিতেই সে বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া দুর্গার ঠিক পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু সুদর্শনের সবল বাহুদুটি দুর্গার সুশ্রী সুঠাম গ্রীবাটি বেষ্টন করিবার প্রাক্কালে দ্বারদেশ হইতে হাসির একটা গমক উঠিল—

—হিঃ হিঃ হিঃ।

হাসির ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া চাহিতেই সুদর্শন চমকিত হইয়া দেখিল, দরোজার উপর টাঙ্গানো নীল রঙ্গের পর্দাখানির পাশ দিয়া বিচ্চুর আকর্ণ-বিস্তৃত দন্তপাতি-বিকশিত মুখখানি বাহির হইয়াছে।

সাঁ করিয়া দরজার দিকে কয় পদ গিয়া তর্জ্জনের সুরে সুদর্শন কহিল—আমার সামনে ইয়ারকী রাস্কেল, হাণ্টার দিয়ে পীঠের চামড়া তুলে দেব এখুনি—

বিচ্চুর মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি পরদার আড়াল হইতে অবশিষ্ট দেহখানি বাহির করিয়া অভিমানের সুরে সে কহিল—আপনি হচ্ছেন ছোট সাহেব, আমার সাধ্যি কি—আপনার কাছে ইয়ারকী করি? পেছন থেকে চুপি চুপি আপনি দিদিমণির চোখ দুটো টিপে ধরতে হাত বাড়াচ্ছেন দেখেই আমি অমন করে হেসে উঠেছিলুম।

এখন বুঝতে পারছি হুজুর, কসুর হয়েছে; আমাকে মাপ করুন, এমন কাজ আমি আর কখনো করব না।

দুর্গা তাড়াতাড়ি কহিল—সাহেব তোমার কসুর মাপ করেছেন, আমি বলছি। ভাগ্যিস্, তুমি হেসেছিলে বিচ্চু, নইলে ছোট সাহেব ত চুপি-চুপি আমার চোখ দুটো টিপে ভারি অপ্রস্তুত করে দিতেন! আমি বলতেও পারতুম না—কে চোখ টিপেছে; উনি যে চুপি চুপি আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেম, তা কি আমি জানতুম?

দুর্গার এই কথাগুলি সুদর্শনের কানে যেন সুধা বর্ষণ করিল, বুঝিল—সে ভুল করে নাই, সাহসটুকু প্রকাশ করিয়া বাঞ্ছিত পাশাকে সে তাহার চিহ্নিত ছকের ভিতরেই পুরিয়া ফেলিয়াছে, বাজী মাতের আর বিলম্ব নাই। চোখের কোণে হাসির ঝিলিকটুকু ফুটাইয়া ও সেই চোখের বঙ্কিম দৃষ্টি দ্বারা দুর্গাকে বিদ্ধ করিয়া পরক্ষণেই গম্ভীর ভাবে বিচ্চুকে প্রশ্ন করিল—এ ঘরে তুই কি করতে এসেছিস্?

সোয়েটার হইতে একখানি সাদা লেফাফা বাহির করিয়া ও সেখানা সুদর্শনের দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিল—চিঠি দিতে এসেছিলুম। আপনার নামে চিঠি, ডাকে এসেছে। এই মাত্র পিওন দিয়ে গেল।

চিঠিখানি ক্ষিপ্র-হস্তে টানিয়া লইয়া সুদর্শন সাগ্রহে তাহার পাঠোদ্ধারে মনযোগ দিল, বিচ্চুও এই অবসরে দুর্গার দিকে একটিবার চাহিয়াই পর্দার পিছনে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়িয়া সুদর্শন চোখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল, দুর্গা হাসিতেছে। সেও হাসিমুখে প্রশ্ন করিল—হাসছেন যে?

দুর্গা উত্তর দিল—চিঠি দেখে ভেবেছিলুম, বাহাদুর বুঝি এবার আপনার উদ্দেশেই পরোয়ানা পাঠালে।

সুদর্শন—আমার মুখ দেখে বুঝি সে ভাবনা ছেড়ে দিলেন ?

দুর্গা—হ্যাঁ। আপনিও যে দমে গিয়েছিলেন, হাতের কাঁপুনিই সেটা জানাচ্ছিল। তারপর মুখে হাসি দেখে বুঝলুম—চিঠি আর যেই পাঠাক, বাহাদুর পাঠায় নি।

সুদর্শন—বাহাদুর যদি পাঠাত, আমি খুসী হতুম। কিন্তু সে সাহস তার হবে না। সে জানে—সুদর্শন বোস তার যম হয়েই এসেছে। তাকে শেষ না করে যাবে না।

দুর্গা—সিজারের আইডেন্টিফিকেসনটা এইখানে কিন্তু ঠিক মিলছে না। বাহাদুরকে জয় না করে—জয়ের কথাটা আপনার মুখে খাপ খাচ্ছে না।

সুদর্শন—বাহাদুরের নামে আপনার মুখে লাল পড়ে—আমি সে কথা শুনিছি—

দুর্গা—কথাটা কি আমার মুখ থেকেই শুনেছেন ?

সুদর্শন—আপনার কাকা বলেছেন। তাঁর কথায় মনে হয়—কাকার প্রতি আপনি প্রসন্ন নন ; বাহাদুরের এই ইতর ব্যাপারে তাই আপনি মনে মনে খুব খুসী।

দুর্গা—কাকা আপনাকে একথা বলেছেন ?

সুদর্শন—ঠিক খোলাখুলিভাবে না বললেও তাঁর কথায় আপনার সম্বন্ধে এমনি কটাক্ষ থাকে। আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, আমি তখনি এর প্রতিবাদ করেছি।

দুর্গা—তার মানে। আজই আপনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। আলাপের আগেই আপনার আমার প্রতি অতটা সহানুভূতির কারণ ?

সুদর্শন—বাংলোর এই ঘরখানায় যেদিন আমি ঢুকি, আপনার সঙ্গেই প্রথমে চোখাচোখি হয়েছিল। সেই থেকেই একটা আকর্ষণ অনুভব করি, আর আপনার মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারি—মনের ভেতরেও স্থান আমি পেয়েছি।

দুর্গা—উঃ! আপনার দৃষ্টিত তাহলে সাংঘাতিক। মুখ দেখেই আপনি আমার মনের ভেতরটা সব জেনে ফেলেছিলেন। কি সর্ব্বনাশ! আচ্ছা, মুখের কোন কথা না শুনেই, তখন কি ভাবতেন আপনি আমার সম্বন্ধে? বলুন না শুনি।

সুদর্শন—নারীর সম্বন্ধে যেটা শাশ্বত আর চিরন্তনী সত্য, তাই।

দুর্গা—সেটি কি?

সুদর্শন—বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না—এই। আমার সঙ্গে আলাপ করতে আপনি অত্যন্ত উৎসুক, কিন্তু মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

দুর্গা—সেই জন্যে আপনিও বুঝি পাল্টা জবাব দিতে অসম্ভব রকমের মুখচোরা সেজেছিলেন? যেন একবারে গো-বেচারী, খোকাটি; মেয়েদের দেখলেই লজ্জায় কুঁকড়ে পড়েন, মুখখানা নীচু করে থাকেন, আবার একটু ফাঁক পেলেই চুপি চুপি তাকান—

সুদর্শন—আপনি তখন মনে মনে কি ভাবতেন আমার সম্বন্ধে বলুন ত?

দুর্গা—ভাবতুম যে, তিলক কাটলেই বৈষ্ণব হয় না।

সুদর্শন—অর্থাৎ—

দুর্গা—এর ইংরিজী প্রতিশব্দ হচ্ছে—Cowls do not make monks. আরো খুলে বোঝাতে হলে—মিটিমিটে ডান মানুষ খাবার রাক্ষস—এইটেই বলতে হয়।

সুদর্শন—আপনি যাই ভাবুন আর ঠাট্টা করে এখন যাই বলুন, আমি কিন্তু আপনার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে খালি ভাবতুম—You are a plucky girl,—awfully nice girl. তাই, আপনার কাছে আমার মনের গেট্‌টা খুলে দেবার জন্যে উস্‌খুস্‌ করতুম।

দুর্গা—থামুন, আর বেশী বকবেন না। চিঠিখানাই আমার চোখের সামনে খুলতে সাহস পান না, আপনি আবার মনের দুয়ার খুলবেন!

সুদর্শন—আপনি কি বলতে চান, চিঠিখানা আপনার হাতে দিতে আমি কুণ্ঠিত? আপনি জানেন—এমন কোন কথা নেই বা থাকবে না, আপনাকে যা জানাতে আমি ইতস্ততঃ করব! এই নিন—পড়ুন চিঠি।

দুর্গা—পরের চিঠি গায়ে প'ড়ে পড়বার অভ্যেস আমার নেই। ইচ্ছে হয়—আপনিই পড়ে শোনাতে পারেন।

সুদর্শন—বেশ, তাহলে পড়ছি শুনুন। আপনি নিশ্চয়ই আপনার কাকার হিতৈষী বন্ধু অদ্বৈত চৌধুরীর নাম শুনেচেন। দুমাকায় থাকতে আপনার কাকা যখন কতকগুলো ডাকাতির তদ্বির করেন, এই লোকটি নাকি অনেক সাহায্য করেছিলেন। বাহাদুরের ব্যাপারেও সাহায্য পাবার আশায় আপনার কাকা এঁকে পর পর দুখানা চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু ভদ্রলোক কোন জবাবই তার দেন নি। তাই তৃতীয় চিঠিখানা তিনি আর নিজে না লিখে আমাকে লিখতে বলেছিলেন। আমার নিজের অবশ্য বে-সরকারী একটা লোকের কাছে সাহায্য-প্রার্থী হবার ইচ্ছাটুকু মোটেই ছিল না। কিন্তু আপনার কাকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত আর কিছু বলতে পারি না, তাই লিখতে হয়েছিল তাঁকে একখানা চিঠি। ভদ্রলোক এবার সাড়া দিয়েছেন। তিনি যা লিখেছেন, পড়ছি শুনুন—

প্রিয় সুদর্শন বাবু—

আপনার চিঠিতে আপনার পরিচয়ের সঙ্গে আমার প্রীতিভাজন বন্ধু জাহ্নবী বাবুর এলাকার অপ্রীতিকর খবরগুলি ও সেই সূত্রে যে জটিল অবস্থাটির উদ্ভব হয়েছে তা পড়েছি। অবশ্য এর আগেই এ সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর যে না পেয়েছি তা নয়। জাহ্নবী বাবুর দুখানা চিঠিও এই সঙ্গে পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে—যদিও চিঠির বিষয়বস্তু আমাকে নিরতিশয় বেদনা দিয়েছে এবং আমি এ-যাবৎ দূরদেশে থাকায় তাঁকে যথোচিত সাহায্য করা বা এ সম্বন্ধে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তিনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, কথার চেয়ে আমি কাজেরই পক্ষপাতী। তিনি যে সম্বন্ধে আমার সাহায্য চেয়েছেন—আমার বর্ত্তমানের জটিল অবস্থার মধ্যে যদি সেটা সম্ভব হয়, প্রয়োজনানুরূপ কাজেই তার জবাব দেব। আপনিও এই রহস্যময় ব্যাপারটির রহস্য ভেদ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন জেনে আশ্বস্ত

হয়েছি। জাহ্নবী বাবু যখন আপনাকে
তাঁর সহকারী করেছেন, তখন নিশ্চয়ই
আপনি দুঃসাহসী ও নির্ভীক। কাজেই
বাহাদুরের সকল বাহাদুরীর অবসান
এবার হবেই, এর ওপর পেছনে ত
আমরা আছিই।

শুভার্থী
শ্রীঅদ্বৈত চৌধুরী

শুনলেন ত! একটা হাম্‌বাগ্‌। আপনি কি বলেন?

দুর্গা হাসিয়া কহিল—আমি হচ্ছি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর রেখে আমার লাভ?

সুদর্শন গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল—না হয় আমাকে একটু সাহায্যই করলেন। ঐ অদ্বৈত চৌধুরীর চেয়ে আপনি বরং আমাকে অনেক বেশী সাহায্য করতে পারেন।

কথাটা শুনিবামাত্রই দুর্গার রক্তিম অধরে পুনরায় হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, ভ্রূদুটি নাচাইয়া কহিল—সত্যি? কিন্তু কি ভাবে সুদর্শনবাবু? বাহাদুরের মত দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতকে ধরতে যে সাহায্যটি আমার দ্বারায় সম্ভব হতে পারে—সেটি হচ্ছে তাকে চারে আনবার টোপ হওয়া; বাঘ ধরবার জন্যে শিকারীরা ফাঁদের মুখে যেমন ছাগল-ছানাকে বেঁধে রাখে!—তাই যদি আপনার ইচ্ছে হয়, আপনার মান আর মুখ রাখতে বাহাদুরকে ধরবার টোপ হতে আমি রাজি আছি সুদর্শন বাবু!

সুদর্শন বলিল—ঘরে বসে ওসব কথা বলতে বাধে না,—তবু যদি বাংলোর বাইরে কোনদিন বেরুতেন।

দুর্গা কহিল—একলা একলা ত আর বেরুনো চলে না, সাথীর মধ্যে ত কাকার দুটি অপগণ্ড খোকা আর খুকী—

সুদর্শন উৎসাহের সুরে কহিল—আপনি যদি বেরুতে চান—

দুর্গাই কথাটা শেষ করিয়া দিল—সাথী হতে আপনি রাজী আছেন, এই ত? বেশ, কাকাকে ব'লে ক'য়ে মতটা তাঁর নিন্—আমি ত পা বাড়িয়েই আছি।

সুদর্শন সোল্লাসে কহিল—আচ্ছা, সে ভার আমার। আপনি বিকেলে তৈরী থাকবেন। আজ থেকেই আমাদের সফর সুরু হবে।

সহাস্যে গ্রীবাটি নাড়িয়া দুর্গা সুদর্শনের কথাটায় সায় দিল।

—চৌদ্দ—

দুর্গাকে লইয়া বেড়াইবার প্রস্তাবটি জাহ্নবীর নিকট তুলিতেই তিনি ঈষৎ হাসিয়া সমর্থন করিলেন।

অদ্বৈত চৌধুরী সুদর্শনকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, সুদর্শন তাহাকে উপেক্ষা করিলেও, জাহ্নবী মনে মনে সহায়তা সম্বন্ধে তাঁহার সংক্ষিপ্ত আভাষটুকুর উপর ঈষৎ আস্থাও রাখিলেন। এই দৃঢ়চেতা ও অসামান্য শক্তিধর মানুষটিকে তিনি দুমকার ব্যাপারে ভালো ভাবেই চিনিয়াছিলেন। কথার উত্তর কাজে দিতে অভ্যস্ত—এরূপ অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ জাহ্নবী তাঁহার কর্ম্ম-জীবনে আর দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ!

এখন প্রত্যহ অপরাহ্নে সুদর্শন দুর্গাকে লইয়া ভ্রমণে বাহির হয়। প্রথম দিনের আলাপে সুদর্শন দুর্গার প্রতি অশিষ্টের মত আচরণ করিয়াছিল, বোধ হয় সেটা অশোভন ও অন্যায় বুঝিয়া তাহার পর সে অনেকটা সংযত হইয়াছে। যদিও তাহার ক্ষুধিত দৃষ্টি দুর্গার দিকে সর্ব্বক্ষণই নিবদ্ধ থাকে, কিন্তু দুর্গাও ইদানীং তাহার মুখে এমন একটা ভারিক্কি ভাব ও দৃষ্টিতে একটা তীক্ষ্ণ ভঙ্গি প্রকাশ করে যে, দুঃসাহসী সুদর্শনের উদ্দাম প্রকৃতিও স্তব্ধ হইয়া যায়। আবার, স্থানবিশেষে বিচ্চুর আকস্মিক আবির্ভাবও সুদর্শনকে লজ্জিত ও অপদস্ত করিয়া দেয়। ইহার উপর সুদর্শনকে অনধিকার চর্চ্চার ভিতর দিয়া বাড়াবাড়ি কিছু করিতে দেখিলেই দুর্গা তাহার সুন্দর ভুরু দুটি বাঁকাইয়া ও মুখে হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিয়া উঠে—থামুন, থামুন, আর এগোবেন না। এখনি হয়ত লাল পরোয়ানা নিয়ে বাহাদুর দেখা দেবে।

বাহাদুরের নামেই যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ে। সুদর্শনের অন্তরের পশুটা তৎক্ষণাৎ নারীর রূপলিপ্সার মোহ কাটাইয়া শিকারের লোভে যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, তাহার মস্তিষ্কে জ্বালা ধরে, মনের আক্রোশটুকু সবল দুইটি হাতের মুষ্টিতে নিবদ্ধ করিয়া হুঙ্কার তুলিতে থাকে। দুর্গাও বাহাদুরের প্রশস্তি গাহিয়া তাহাকে আরও উত্তেজিত করিয়া দেয়।

সেদিন সায়াহ্নে জেসিডির পথে বিস্তীর্ণ একটা গোলাপ-বাগানে ইহারা দুটিতে বেড়াইতেছিল। ঘুরিতে ঘুরিতে উভয়ে বাগানটির প্রান্ত-ভাগে এমন একটা স্থানে আসিয়া পড়িল, যেখানে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই, সম্মুখেই একটা ঝিল, দুই ধারে এবং পিছনে ফুটন্ত অর্দ্ধ ফুটন্ত ও মুকুলিত ফুলভারে অবনত অসংখ্য গোলাপের সারি। শরতের স্নিগ্ধ বাতাস সুবাস ছড়াইয়া সারা উদ্যানটিকে যেন মাতাইয়া দিতেছিল,—তাহার মদিরাময় আবেশ সহসা সুদর্শনকে বুঝি মাতাল করিয়া দিল। এই দিন আবার তাহার ঘাড়ে ভূত চাপিল। সহসা সে দুই হাতে দুর্গার চিবুকটি চাপিয়া ধরিয়া কহিল—এর কাছে হাজারো গোলাপ কিন্তু হার মানে—

কথা তাহার এইখানেই স্তব্ধ হইল—বিচ্চুর সেই সুপরিচিত হাসির উচ্ছ্বাসে—হিঃ হিঃ হিঃ।

তৎক্ষণাৎ হাত দুখানি নামাইয়া অভিভূতের মত সে দেখিল—ফুটন্ত গোলাপের একটি তোড়া হাতে করিয়া বিচ্চু তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আকর্ণবিশ্রান্ত দন্তরাশি বিকশিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ফুলের তোড়াটি সে ছোট সাহেবের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল—হুজুরের জন্যই তোড়াটি বানিয়েছি, বাগানের সেরা ফুলগুলোই এতে পাবেন।

তোড়াটি দিয়া ও কথা কয়টি শেষ করিয়া সে যন্ত্রচালিত পুতুলের মতই সরিয়া গেল।

সুদর্শন অপরাধীর ভঙ্গিতে দুর্গার অবিচলিত মুখখানির পানে চাহিয়া কহিল—সত্যি, ভারি অন্যায় আমার হয়েছে, এই সেকেণ্ড টাইম। কিন্তু তৃতীয়বার আর এ রকম ভুল হবে না।

দুর্গা মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল—কিন্তু মনে রাখবেন, যেন ভুলে না যান। তৃতীয় বার যদি এরকম ভুল করেন, তাহলে বাহাদুর কিন্তু আপনাকে আস্ত রাখবে না।

বাহাদুরের নাম শুনিয়াই সুদর্শনের মাথাটি অমনই গরম হইয়া উঠিল। চোখ দুটি পাকাইয়া দুর্গার দিকে তাকাইয়া রূঢ়স্বরে সে কহিল—ভাববেন না, তার দিন ঘনিয়ে এসেছে, সমস্ত সাঁওতাল পরগণা জুড়ে আমি জাল পেতেছি।

—কিন্তু শুনেছি, সে যাদু জানে, আপনার জাল ফেলাই সার হবে।

—চুপ্ করুন! আপনার কাকার কানে এ কথা উঠলে, তিনি ভাববেন আপনিও বাহাদুরের দলে।

—আপনি ত জানেন, তিনি এ কথা অনেক আগেই ভেবে রেখেছেন। কতবারই বলেছেন—বাহাদুর যতই বাহাদুরী দেখায়, দুর্গার মনে ততই আহ্লাদ হয়!

—আপনি নিশ্চয়ই বাহাদুরের প্রশংসা করেছেন?

—তা করিছি। আপনিই বলুন, সেটা কি অন্যায় হ'য়েছে? যে লোকটা এক তরফা জিতেই চ'লেচে, দেশশুদ্ধ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েচে,—তাকে শুধু নিন্দেই করতে হবে?

—তাই উচিত।

মুখখানা শক্ত করিয়া দুর্গা কহিল—আপনাদের পক্ষে হতে পারে, মেয়েদের পক্ষে কিন্তু নয়। আমি হলফ করে বলতে পারি, আমার কাকিমা

আর যে একুশটি বাড়ীতে বাহাদুরের লাল পরোয়ানা জারি হয়েছে—তাদের বাড়ীর মেয়েরা ছাড়া, এমন মেয়ে একটি নেই এ তল্লাটে—মনে মনে যে এই বাহাদুরের স্তুতি না করে।

সুদর্শন মুখখানা আরক্ত করিয়া কহিল—আপনার নিজের কথাটাও বলুন।

—এখনো বলবার আবশ্যক আছে সুদর্শন বাবু?

—কিন্তু বাহাদুরের প্রশংসায় আপনার মুখখানা যে হঠাৎ রাঙ্গা হ'য়ে উঠলো! তাহ'লে—

—বাহাদুরের প্রেমে পড়ে গেছি কি না জানতে চাইছেন ত? অস্বীকার ক'রে সত্যকে নাই-বা গোপন করলুম সুদর্শন বাবু! রবি ঠাকুর তাঁর একখান কেতাবে মেয়েদের এই মনস্তত্ব সম্বন্ধে যা বলেচেন, সেটা 'কোট্' করে নজীর দেখাতে পারি। শুনবেন?

—বলুন।

—তিনি লিখেছেন—'কর্ত্তব্য-বোধকে যারা অত্যন্ত সামলে চলে, মেয়েরা তাদের পায়ের ধুলো নেয়। আর যে সব দুর্দ্দাম দুরন্তের কোন বালাই নেই ন্যায় অন্যায়ের, মেয়েরা তাদের বাহু বন্ধনে বাঁধে।' কবির যে কেতাবে এই ছত্রটা আছে, আপনাকে উপহার দেব—পড়বেন।

—ধন্যবাদ! কিন্তু নভেল পড়া আমার অভ্যাস নেই।

—অভ্যাস করবেন, জ্ঞান সঞ্চয় হবে। দেশের লোকগুলোকে রক্ষা করবার পেশা যখন নিয়েছেন, দেশের বইগুলোর খবর অন্তত আপনার রাখা উচিত। বাহাদুরের একুশটি বিজয়-পর্ব্বের চর্চ্চাটা যদি করেন মন দিয়ে, দেখবেন—তার পড়াশুনাও আছে, জানাশুনাও আছে।

—তাহলে বাহাদুরের সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু—আপনার কাছ থেকেই ত আমরা জানতে পারি? আশ্চর্য্য এই যে, আপনার কাকা

আমাকে না আনিয়ে, আপনার সাহায্য নিলেই বাহাদুরের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারতেন।

দুর্গা গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল—কাকা জানতেন, সেটা হবে না, তাই আপনাকে আনিয়েছেন।

ক্রমেই ইহাদের ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তম হইবার সঙ্গে সঙ্গে মিলন ও গতিবিধির ক্ষেত্রও বৃহত্তম হইতেছিল। দর্শনীয় স্থানগুলির পরিদর্শন ও পরিভ্রমণ সমাপ্ত হইলে একদিন দুর্গাই প্রস্তাব করিল,—চলুন, এবার ঝাড়খণ্ডেশ্বরের মাথায় ফুল-বেলপাতা দিয়ে আসি।

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করিল,—তিনি থাকেন কোথায় ?

বিস্ময়ের সুরে দুর্গা বলিল,—অবাক কাণ্ড! ঝাড়খণ্ডে রয়েছেন, আর ঝাড়খণ্ডেশ্বরের খবর জানেন না! তবেই আপনি বাহাদুরকে ধরেছেন।

—মাহাত্ম্য কিছু আছে না কি ?

—নিশ্চয়ই। সন্ধ্যের সময় মাথায় বেলপাতা চাপিয়ে যা মানৎ করা যায়, তাই সিদ্ধ হয় শুনেছি। আপনার হাতে ত মস্ত বড় কেস্ পেণ্ডিং রয়েছে—পরীক্ষা করতে পারেন।

—বেশ ত, চলুন না এক দিন পরীক্ষা করা যাক্। অন্ততঃ দেব-দর্শন ত হবে। কাছাকাছি জায়গাগুলো ত ঘুরাঘুরি হ'ল, ঐটিই বা বাকি থাকে কেন! কত দূরে সেই মন্দির ?

—বেশী নয়, মাইল সাতেক। বলেন ত, যাবার দিন-একটা ঠিক করি।

—করুন।

দুর্গা একটু থামিয়া বলিল,—তাহ'লে আসছে সোমবারই যাওয়া হবে ঠিক করা গেল। সোমবার হচ্ছে শিবের বার; তা'ছাড়া, মাঝে কটা দিন রইলো। আপনি কাকাবাবুকে নোটিস দিয়ে রাখুন—ঐ দিন বিকেলে তাঁর ফোর্ডখানা যাতে পাওয়া যায়।

সুদর্শন হাসিয়া বলিল,—তাই হবে।

—পনেরো—

সহরতলীর অর্দ্ধ-অচেতন বিরাট অবয়বটির উপর দিয়া পুলিশ-সুপারের সুদৃশ্য মোটরখানি তির্য্যগ-গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। শরতের অপরাহ্ন, ঘণ্টা-দুই আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কঙ্করময় পথে তাহার কোন চিহ্নই নাই; আকাশও নির্ম্মল এবং পরিচ্ছন্ন। পথের দুই ধারে দিগন্তব্যাপী প্রান্তর, মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত কৃষক-পল্লীর সমাবেশ, উভয় পার্শ্বের সীমারেখা সমুন্নত গিরিশ্রেণীর কোলে মিশিয়া গিয়াছে।

মোটরের ভিতর আরোহীর আসন আজ আরোহিহীন; পুলিশ-সাহেবের জমকালো উর্দ্দীপরা সোফারের আসনে ষ্টিয়ারিং ধরিয়া বসিয়াছে আজ শ্রীমতী দুর্গা, এবং সোফারের পাশের লাল পাগড়ীওয়ালা আরদালীর স্থানটি অধিকার করিয়াছে সুদর্শন; কিন্তু তাহার ধোপদস্ত পাঞ্জাবীর পকেটে ছোট একটি রিভলভার ছাড়া সাজপোষাকে পুলিশের কোন নিদর্শনই নাই। আর দুর্গা পরিয়াছে—মারহাট্টা-প্যাটার্ণের একখানা বারো-হাত কালো সাড়ী, তাহার আঁচলটা কোমরে আঁট-সাঁট করিয়া জড়াইয়া রণরঙ্গিণী-মূর্ত্তিতে এই প্রথম আজ সে ষ্টিয়ারিং ধরিয়াছে। কুণ্ডা পর্য্যন্ত সুদর্শনই মোটরখানা চালাইয়া আসে; কিন্তু দুধনিয়ার বাঁকের কাছে আসিয়া মোটরখানা উল্টাইয়া হঠাৎ খাদের ভিতর পড়িয়াছিল আর কি! সৌভাগ্য-ক্রমে ব্রেকটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটিতে পাইল না। ইহার পরেই দুর্গা ষ্টিয়ারিং ধরিয়া বসিল, এবং বিস্মিত সুদর্শনের মুখের উপর বিদ্যুতের একটা ঝলক বর্ষণ করিয়া বলিল,—আমিই এখন সারথি, আপনি

ভেতরে গিয়ে রথী হ'য়ে বসুন। নইলে আবার একটা য়্যাকসিডেণ্ট ঘটতে পারে।

সুদর্শন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—আপনি কি মোটর চালাতেও জানেন?

অচল গাড়ীখানাকে সুকৌশলে পথের কিনারা হইতে মধ্যস্থলে তুলিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে স্মিত মুখখানা সুদর্শনের দিকে ফিরাইয়া দুর্গা প্রশ্নটির উত্তর দিল। সুদর্শন কিন্তু ভিতরে না গিয়া দুর্গার পাশে বসিয়া হাসিমুখে বলিল,—রথীর আসনের মায়া ছেড়ে আপনার পাশের স্থানটুকুই আমি বেছে নিলুম।

দুর্গার চোখের কোণদুটি ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল; কি একটা কথা মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া ষ্টিয়ারিংএর দিকেই সে দৃষ্টি সংলগ্ন করিল। গাড়ীর বেগ ক্রমশঃ দ্রুততর হইল।

সুদর্শন দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—রাগ করলেন আমার কথায়?

দুর্গা চোখের দৃষ্টি ষ্টিয়ারিংএ নিবদ্ধ করিয়া বলিল—আমার কথাও ত আপনি শুনেছেন সুদর্শন বাবু!

সুদর্শন—খুলেই বলুন, ঠিক যে মনে করতে পারচি না।

দুর্গা—আপনার কথাটা ত মনে করতে পারচেন, একটু আগে যা বললেন?

সুদর্শনের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, কহিল—পাশে ব'সবার স্থানটুকু চেয়ে কি অন্যায় ক'রেছি?

দুর্গা মুখখানি ঈষৎ গম্ভীর করিয়া বলিল—চাওয়া আর নেওয়া কি এক কথা সুদর্শন বাবু?

—তবে কি আমাকে উঠে যেতে ব'লছেন আপনি এখান থেকে?

—না, তা আমি বলিনে। আপনি ত জানেন—কত বার আপনাকে ব'লেছি—বাহাদুরের লাল পরোয়ানা যেন আমার চার পাশে ঘিরে আছে। ভয়ই বলুন আর আপত্তিই বলুন—আপনারই জন্যে; বাহাদুর পাছে ঐ লাল পরোয়ানা আপনার ওপরেও জারী করে!

কথাটা শুনিয়া আজ আর সুদর্শন চটিল না, বরং জোরে হাসিয়া উঠিল এবং হাসির গমকে তাহার মনের দ্বিধাটুকু তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন করিয়া কহিল—ওঃ, আপনি কিন্তু সত্যিই অদ্ভুত! এমন সিরিয়াস হয়ে কথাটা বললেন যে কার সাধ্য ওটাকে ঠাট্টা বলে ধরে!

বিদ্যুতের আভার মত মুখে একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া দুর্গা কহিল,—আপনার অনুমান-শক্তি কিন্তু খুব প্রখর সুদর্শন বাবু! আপনি তাহলে বাহাদুরকে না ধরে ছাড়বেন না দেখছি।

সুদর্শন সগর্ব্বে কহিল,—আর একটা 'উইক' সবুর করুন। বাহাদুরের মুখোসখানাকে খুলে আমি আপনার হাতেই তুলে দেব।

হঠাৎ মোটরের গতি শিথিল হইয়া আসিল।

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করিল,—ব্যাপার কি, স্পীড কমালেন যে? মনের ফূর্ত্তিতে?

দুর্গা কহিল,—না, অবসাদে। শীগ্‌গির আপনার পিস্তলটা বা'র করুন ত!

পাঞ্জাবীর পকেটে হাত রাখিয়া সুদর্শন কহিল,—কেন বলুন ত?

দুর্গা সহজ কণ্ঠে কহিল,—দেখছেন, এক ঝাঁক পাখী উড়ে আসছে, রাস্তা পার হ'য়ে যাবে। ঐ দেখুন—এসে পড়লো! আচ্ছা, চলন্ত মোটর থেকে ঐ ঝাঁকের একটা উড়ন্ত পাখীকে গুলি ক'রে মারুন ত দেখি—কেমন আপনার নিশানা!

পরক্ষণেই পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া সুদর্শন সামনের দিকে নিশানা করিল : সঙ্গে সঙ্গে সেই অরণ্য-প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পিস্তলটা 'গুড়ুম' শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। পাখীর ঝাঁক কলরব তুলিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; কিন্তু একটিও গুলীবিদ্ধ হইয়া মাটীতে পড়িল না।

দুর্গা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—পড়েনি—পড়েনি, পালাচ্ছে সব উড়ে! মারুন—মারুন—এইবার—

মোটরের গতি হঠাৎ দ্রুততর হইল, সঙ্গে সঙ্গে উপর্য্যুপরি আরও তিন বার ফায়ার হইল; কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। একটাও উড়ো-পাখী পড়িল না।

দুর্গা কহিল,—হেরে গেলেন! কার কাছে এ বিদ্যে শিখেছিলেন? দিন আমাকে, পাশে যখন বসেছেন সাহস ক'রে, আমার উচিত আপনাকে সামলে নেওয়া—অন্ততঃ একটিকেও শিকার ক'রে।

সুদর্শন হতাশের সুরে বলিল,—আর একটিও টোটা ওতে ভরা নেই! চারটে ছিল—সব শেষ হ'য়ে গেছে।

—সঙ্গে টোটা আছে ত; দিন ভ'রে দিই—

—বাড়তি টোটা ত সঙ্গে আনা হয়নি।

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া দুর্গা কহিল,—সর্ব্বনাশ! তাহ'লে উপায়? চ'লেছি তেপান্তর মাঠে; একটা কনেষ্টবলও আপনি সঙ্গে আনেন-নি ঐ হাতিয়ারের ভরসায়; এখন হঠাৎ যদি কোন বিপদ ঘটে,—কি ক'রে সামলাবেন?

সুদর্শন সদম্ভে বলিল,—কুছপরোয়া নেই। কেবল এই পিস্তল দেখিয়েই—

মুখ টিপিয়া হাসিয়া দুর্গা কহিল,—ভয়ে ভির্মী লাগিয়ে দেবেন ? কিন্তু যদি বাহাদুরই এসে পড়ে ? তাকেকি ঐ ফাঁকা পিস্তলটি দেখিয়ে ঘাবড়াতে পারবেন ?

সুদর্শনের চোখ দু'টি এবার জ্বলিয়া উঠিল, কহিল,—বাহাদুর-বাহাদুর ক'রে আপনি দেখছি অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লেন ! আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, ও-জাতটা পেঁচার সামিল,—কোটরে থাকে সমস্ত দিন লুকিয়ে, রাতে বেরিয়ে ঠোকর দেয়—তারও চেয়ে অধম যারা তাদেরই অঙ্গে। বীরপুরুষের সামনে রুখে দাঁড়াবার সাধ্য এদের নেই। এসে দাঁড়িয়েছে কোন দিন আপনার কাকার কাছে—কিম্বা আমার সামনে ?

স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া সহজ ও শান্ত স্বরে দুর্গা কহিল,—কিন্তু তৃতীয় দফায় আপনার বাবার সামনে সে এসেছিল শুনেছি ; আমার বিশ্বাস—তিনি, আপনি যতটা ব'লচেন, ততটা—

সুদর্শনের মুখখানা তৎক্ষণাৎ যেন কালো হইয়া গেল ! কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

দুরন্ত বায়ুর সহিত যেন পাল্লা দিয়াই মোটরখানা অপ্রতিহত গতিতে সম্মুখের দিকে ছুটিতেছিল। সুদর্শন সহসা বলিয়া উঠিল—কোথায় চলেছেন বলুন ত ? সামনে ত দেখছি শালবনের এলাকা !

মৃদু হাসিয়া দুর্গা বলিল—সুতরাং এই অঞ্চলেই বাহাদুরের থাকাটা স্বাভাবিক।

সুদর্শন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী সঙ্গিনীর দিকে চাহিল মাত্র, কোন উত্তর দিল না।

দুর্গা একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—আমার কাছে কিন্তু ভারি আশ্চর্য্য ঠেকছে সুদর্শন বাবু, বাহাদুরের সন্ধানে সারা সহর ও সহরতলী তোলপাড় করে বেড়িয়েছেন, কিন্তু এ পথটি মাড়াননি কোন দিন !

মোটরখানা এই সময় সোজা রাস্তা ছাড়িয়া মোড় লইয়া অপরিসর একটি রাস্তায় মৃদুগতিতে চলিল। দু'ধারেই শাল গাছের সারি, মাঝে মাঝে স্তূপের মত বিক্ষিপ্ত গুল্মরাজি। বাতাসের সঙ্গে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। পথে জন-মানবের চিহ্নও নাই। কাছে যে কোন লোকালয় আছে—পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে তাহা বুঝিবারও উপায় নাই; এদিকে সন্ধ্যাও আসন্ন। সুদর্শনের চিন্তাকুল মুখের দিকে চাহিয়া দুর্গা বলিল,—এই অঞ্চলটাই হচ্ছে ঝাড়খণ্ডি। মন্দির পর্য্যন্ত এই রাস্তাটা গিয়েছে। আর ঐ যে সোজা রাস্তাটা আমরা ছেড়ে এলুম, ওটা গেছে বরাবর সরমায়। আপনার বোধ হয় মনে আছে, পুলিশের বড় কর্ত্তা হুইলার সাহেব কাকাবাবুকে ভয় দেখিয়েছেন—বাহাদুরের বাহাদুরী ভাঙ্গতে না পারলে তাঁকে দেওঘর থেকে ঐখানেই বনবাসে পাঠাবেন!

মুগ্ধদৃষ্টিতে সঙ্গিনীর পানে চাহিয়া সুদর্শন বলিল,—আপনাকে প্রথম দর্শনে ভেবেছিলুম, ও-বাড়ীর আপনি একটা ঘর-সাজানো আসবাব-বিশেষ! আরও আশ্চর্য্য এই যে, আপনি কারুর কাছেই এ পর্য্যন্ত ধরা-ছোঁয়া দেননি—

দুর্গা একমুখ হাসিয়া বলিল,—অথচ ঘরের বাইরে এসে আপনার কাছেই ধরা পড়ে গেছি।—কথার সঙ্গে সঙ্গেই মোটরের গতি রুদ্ধ হইল। সুদর্শন চমকিয়া উঠিতেই দুর্গা বলিল,—নামুন, আমরা এসে পড়েছি। সামনেই মন্দির।

সুদর্শন চাহিয়া দেখিল,—চারি পাশে খানিকটা উন্মুক্ত জমির মধ্যে ছোট একটি মন্দির, সামনে প্রস্তরবদ্ধ একটু চত্বর। স্থানটি শান্তিময় ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ; কিন্তু মন্দিরোচিত বাহুল্য বা আড়ম্বরের কোন নিদর্শনই নাই।

সুদর্শন কহিল,—কোথায় আনলেন আমাকে? এই ঘুমটি-ঘরটাই কি ঝাড়খণ্ডের অধীশ্বরের আস্তানা?

দুর্গা গম্ভীর হইয়া বলিল,—চোখ যদি আপনার সত্যিকার থাকতো সুদর্শন বাবু, আপনি এ-কথা বলতেন না; কিন্তু আপনি—কথাটা শেষ না করিয়াই দুর্গা নীচে নামিল, এবং মোটরের ভিতর হইতে ফুল-বেলপাতা-ভরা সাজিটি বাহির করিয়া বলিল,—আসুন। গরীবের দেশে যখন এসেছেন, গরীব-দেবতাকেই দেখতে হবে, মানা না মানা আপনার ইচ্ছা।

সুদর্শনও নামিয়া বলিল—চলুন।—তাহার পর কি ভাবিয়া পিস্তলটি পকেট হইতে বাহির করিয়া সোফারের আসনটির নীচে বাক্সের মত একটা আধারের ভিতর রাখিয়া দিল।

দুর্গা জিজ্ঞাসা করিল—উদ্দেশ্য?

সুদর্শন উত্তর দিল—হাতিয়ারটা নিয়ে দেবতার ঘরে নাই বা ঢুকলুম, ওটা দেখে ভয় পেতে পারেন আপনার দেবতা!

দুর্গা হাসিয়া বলিল,—সাধু ইচ্ছা সন্দেহ নেই, কিন্তু শুনেছি, দেবস্থানে দেবতার ইচ্ছাই মানুষের ইচ্ছাকে চালিত করে। এই জন্যই সাধুরা তাঁকে বলেন—ইচ্ছাময়! আসুন, সন্ধ্যে হয়ে এলো।

—ষোল—

ছোট মন্দির; ভিতরটি যেমন অপরিসর, তেমনি অন্ধকার। নিকটে লোকালয় না থাকায় মন্দিরের পূজক বেলা থাকিতেই দেবতার আরতি শেষ করিয়া প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া যান। দেবতা একাই শিকলে আবদ্ধ ঘরটির ভিতর রাত্রিবাস করেন। ফলে, কোন হিংস্র শ্বাপদ মন্দিরে ঢুকিয়া উৎপাত করিতে পারে না, পক্ষান্তরে দৈবাৎ কোন ভক্ত অসময়ে দেবদর্শনে আসিলে দ্বারের শিকলটি খুলিয়া অনায়াসেই মন্দির প্রবেশ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে।

অসময়ের যাত্রিদ্বয় মন্দিরের শিকল খুলিয়া পূজা সারিয়া মিনিট কয়েক পরেই বাহিরে আসিল। দুর্গার হাতে ছিল শিবের উদ্দেশে নিবেদিত একটি অখণ্ড বিল্বপত্র। সে-টি অঞ্চলে বাঁধিয়া দরজার শিকলটি সে তুলিয়া দিয়াছে, এমন সময় সুদর্শন হাসিয়া বলিল,—আপনি প্রসাদী বেলপাতাটি নিয়েই খুসী হ'য়েছেন, আমি কি এনেছি দেখুন!—সগর্ব্বে সে হাতের মালাছড়াটি তুলিয়া দেখাইল। দুর্গা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—ও মা, মালা-ছড়াটা তুলে এনেছেন শিবের মাথা থেকে! না আনলেই পারতেন।

সুদর্শন বলিল,—অন্যায় কিছু করিনি; পাণ্ডা যদি মন্দিরে থাকতো, নিশ্চয়ই প্রসাদী মালাটি আপনার গলায় পরিয়ে দিয়ে আরো কিছু প্রত্যাশা করতো। সেই অধিকারটুকু দেবেন আমাকে দয়া ক'রে?—উত্তরে দুর্গার মুখের ভঙ্গিটুকু সন্ধ্যার আবছাওয়ায় সুদর্শন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু মুখের ব্যঙ্গোক্তি তাহাকে সচকিত করিয়া দিল,—মালা পরাতে চান আমাকে?

গভীর দৃষ্টিতে দুর্গার মুখের দিকে চাহিয়া সুদর্শন কহিল—চাই, পরাতে এবং পরতে। অর্থাৎ আপনার ঐ দেবতার স্থানেই আমাদের মালাবদলটা হয়ে যায়! এখন খুসী মনে আর হাসিমুখে গলাটি বাড়িয়ে দাও—লক্ষ্মীটি!—বলিয়াই মালাছড়াটি তুলিয়া সে দুর্গার গলায় পরাইয়া দিবার উদ্দেশে অগ্রসর হইল। পরক্ষণেই দুর্গার কথাটা যেন চাবুকের মত তাহার পীঠে পড়িল—কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন গাড়ীর মাডগার্ডের ওপর বসে একটা ষণ্ডামার্কা লোক কটমট্ ক'রে আমার পানে চেয়ে আছে?

পলকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সুদর্শন দেখিল, সত্যই একটা লোক তাহাদের গাড়ীখানার মাডগার্ডে বসিয়া যেন সুপরিচিতের মতই প্রতীক্ষা করিতেছে। মাথায় তাহার খদ্দরের একটা সাদা টুপী, গায়ে হাফ-হাতা খাঁকিরঙ্গের সার্ট, কাপড়খানা মালকোঁচা-ধাঁজে পরা, পায়ে সদ্য বুরুশ করা জুতা, সন্ধ্যার ঈষৎ আঁধারেও তাহার উজ্জ্বল রংটি যেন চিক্-চিক্ করিতেছে। লোকটির চেহারা বেশ পুষ্ট, পালোয়ানের মত দেহ সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ, কিন্তু তাহার মুখের বিচিত্র দাড়ীটার জন্য বয়সটি ঠিক উপলব্ধি হইল না।

হাতের মালাছড়াটি সুদর্শন দুর্গার উপরে নিক্ষেপ করিয়া, সলম্ফে গাড়ীর প্রায় পুরোভাগে গিয়া কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—কে হে তুমি? কেন ওখানে উঠেছ?

সংযত গম্ভীর স্বরে আগন্তুক উত্তর দিল,—আপনারই প্রতীক্ষা করছি; এক খানা চিঠি আছে। বলিয়াই সে হাতখানা সুদর্শনের দিকে বাড়াইয়া দিল। তাহার মধ্যমা ও তর্জ্জনীর মধ্যে ধৃত সাদা রঙ্গের চিঠিখানার প্রান্তভাগ বুঝি বিস্মিত সুদর্শনের চোখের কোণে ঠেকিল। খপ করিয়া সেখানা লইয়া অপ্রসন্ন ভাবেই সুদর্শন কভারটা ছিঁড়িয়া ফেলিল। দুর্গাও এই সময় তাহার পার্শ্বে আসিয়া সুদর্শনের হাতের বস্তুটির উপর কৌতূহলী দৃষ্টি

নিবদ্ধ করিয়াছিল। খামখানার ভিতর হইতে বাহির হইল—সেই সাংঘাতিক লাল চিঠি, তাহাতে সেই তিনটি ছত্র লিপিবদ্ধ—

বাহাদুরীর নমুনা

নমুনা নম্বর ২২

—বাহাদুর

স্তব্ধ সুদর্শনকে সচকিত করিয়া তুলিল দুর্গার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর,—ভাবছেন কি সুদর্শন বাবু, ধরুন ; নিশ্চয় এই লোকটা সেই ধড়িবাজ ডাকু—বাহাদুর !

সুদর্শন তাহার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি মোটরের মাডগার্ডে উপবিষ্ট সেই যণ্ডামার্কা মানুষটির দিকে নিক্ষেপ করিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল এই সময় তাহার পিস্তলটির কথা! খেয়ালের বশে উপর্য্যুপরি চারিটি গুলী সে অকারণ অপব্যয় করিয়াছে! কিন্তু লোকটাকে মাডগার্ড হইতে সরাইতে না পারিলে ত সোফারের সীটের ডালাটি তুলিয়া তাহার ভিতর হইতে পিস্তলটি বাহির করিবার উপায় নাই! হায়, দুর্গার সমক্ষে দেবতার উদ্দেশে বিদ্রূপ করিতে পিস্তলটা পকেটে না রাখিয়া কি বেকুবীই সে করিয়াছে!

তাহার মনের এই চিন্তাটির উপর ঘা দিয়াই যেন লোকটি দিব্য সহজ ও সপ্রতিভ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—আপনি অবশ্যই জ্ঞাত আছেন, জয়ী হ'য়েই বাহাদুর বরাবর জয়পত্র পাঠায়,—আজকের বিজয়-পর্ব্বের 'বুটি' হচ্ছে এই পিস্তলটি।—সে হাতখানা উঁচু করিয়া হাতের পিস্তলটি দেখাইল।

দুর্গা চীৎকার করিয়া কহিল,—আপনারই পিস্তল সুদর্শন বাবু, ডাকুটা সোফারের সীটবক্স থেকে ওটা বার ক'রে নিয়েছে।

লোকটি অবিচলিত কণ্ঠে কহিল—আপনার বাবার রিভলভারটি কিন্তু এত সহজে লুঠ করা সম্ভব হয়নি সুদর্শন বাবু!

উত্তেজিত কণ্ঠে দুর্গা পুনরায় কহিল—আমি আবার ব'লছি, এই লোকটাই বাহাদুর!

দেহের সমস্ত শক্তি সবল হস্তের মুঠিটার ভিতর প্রয়োগ করিয়া সুদর্শন সেটি চালাইয়া দিল আগন্তুকের টিকালো নাসিকার পার্শ্ববর্ত্তী আয়ত চক্ষু-তারকাটি লক্ষ্য করিয়া। কিন্তু সুদর্শন ও দুর্গা উভয়কেই স্তম্ভিত করিয়া, আক্রান্ত ব্যক্তি তাহার মাথাটি ঘুরাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে আঘাতকারীর হাতখানি চাপিয়া ধরিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর হাতে পিস্তলটি সুদর্শনের নাকের উপর তুলিয়া বলিল,—নড়েছেন কি মরেছেন। মনে ভাববেন না, এটা ফাঁকা; আমি এর ভেতর টোটা ভ'রে নিয়েছি।

দুর্গা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল,—সুদর্শন বাবু, হোপলেস্! এখন ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। লোকটা হিটলারের মতই ধূর্ত্ত, অত্যন্ত বিপজ্জনক!

বিপন্নের দৃষ্টিতে চাহিয়া এবং আভিজাত্যের আমেজটুকু বিকাশ করিয়া সুদর্শন কহিল,—কাউয়ার্ড, ব্রুট!

আগন্তুকের চোখ দুটি এবার দীপ্ত হইয়া উঠিল। মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল—কে? চোখটা লক্ষ্য করে কে আগে ঘুসী ছোঁড়ে? গুলীর ভয়ে কে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল পুতুলের মত স্থির হয়ে? ঐ ভদ্র মহিলাটিকেই সাক্ষী মানছি আমি, উনিই বলুন।

সুদর্শন সরোষে বলিল,—তুমি চোর, আমার রিভলভার চুরি ক'রেছ।

আগন্তুক বলিল,—একে চুরি বলে না। চোর বামাল নিয়ে পালায়, দাঁড়িয়ে থাকে না। আর তুমি কোন্ শ্রেণীর মহাপুরুষ? অন্যের বাক্‌দত্তা কুমারী কন্যাকে চুরি করবার মতলবে আছ!—তার গলায় মালা পরাতে

তোষামোদ করছিলে—আমি শুনি নি? তোমার ব্যবহারটা কি চোরের চেয়েও ইতর, লম্পটের মতই কদর্য্য নয়?

তর্জ্জনের স্বরে সুদর্শন বলিল,—সাটআপ্, ইউ স্কাউন্‌ড্রেল!

হাতের পিস্তলটা পকেটে রাখিয়া এক নিমেষে যেন বাতাসে ভর দিয়া সেই দীর্ঘদেহ, লৌহবৎ দৃঢ়কায় লোকটি সুদর্শনের ঠিক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া সুস্পষ্ট স্বরে সতেজে কহিল,—বেশ, আগে বোঝাপড়াটাই শেষ করা দরকার—কে স্কাউন্‌ড্রেল কিম্বা কাউয়ার্ড! তিনটে সেকেণ্ডের ব্যব্যধান, প্রস্তুত হও।—ওয়ান,—টু,—থ্রী—

এবারও সুদর্শন প্রথমাক্রমণের সুযোগ লইল। আগন্তুকের চোয়াল লক্ষ্য করিয়া সে-ই অগ্রে ঘুসী চালাইল; কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর অবার্থ ঘুসী তাহার ঘুসীকে ব্যর্থ করিয়া দিল। সুদর্শন তথাপি দমিল না, তাহার দেহেও প্রচুর শক্তি; এবং বহুদিন সে নিয়মিতরূপে শক্তি চর্চ্চাও করিয়াছে। এই চরম সঙ্কটে সে তাহার সুযোগ লইতে চাহিল। প্রথম প্রহারটি ব্যর্থ হইবার পরক্ষণে সে প্রতিদ্বন্দ্বীর পাঁজরে দ্বিতীয়বার আঘাত করিয়া তাহাকে একটু কাবু করিল বটে, কিন্তু এইভাবে আহত হওয়ায় সে লগুড়াহত ব্যাঘ্রের মত দুর্দ্দমনীয় হইয়া এমন তীব্রভাবে আক্রমণ চালাইল যে, সুদর্শন কয়েক মিনিটের মধ্যেই কতিপয় নির্ঘাত আঘাতে নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। সেই অবস্থায় দুই হাতে তাহাকে তুলিয়া ও কয়েকটি ঝাঁকুনি দিয়া সেই দুরন্ত বিজয়ী বিজয়োল্লাসে যখন তাহাকে মোটেরর ভিতর বসাইয়া দিল—তখন সুদর্শনের নাসিকা ও মুখের দুই কস দিয়া রক্তের স্রোত বহিতেছিল।

দুর্গা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া এতক্ষণ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর এই জীবনপণ

শক্তি-পরীক্ষা দেখিতেছিল। বিজয়ী আগন্তুক তাহার সঙ্গীটিকে খেলার পুতুলটির সামিল করিয়া মোটরে বসাইয়া দিলে, আস্তে আস্তে সে ঘুরিয়া মোটরের অপর পার্শ্বে গিয়া বেদনার সুরে ডাকিল,—সুদর্শনবাবু!

সঙ্গে সঙ্গে মোটরের এ-পারে দাঁড়াইয়া সুদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী মুখে তিক্ত হাসির রেখা ফুটাইয়া বলিল,—থামুন, সুদর্শন বাবুকে সম্বোধন করবার কোন অধিকারই আপনার এখন নেই। আপনি না জানলেও আমি জানি—বাহাদুরের সম্পর্কে আপনার কাকা এঁকে ব্ল্যাঙ্ক-চেক সহি ক'রে দেবেন ব'লেছিলেন, কিন্তু ইনি বাহাদুরকে ধ'রবার আগেই মনে মনে তাতে কালনেমির লঙ্কাভাগের দাগ কেটেছিলেন। এখন সে চেকখানা যদি আমি চাই—আর কুমারী দুর্গা দেবীর নামটি তাতে বসাই, তাতে আপনার আপত্তি আছে?

দুর্গা মুখখানা ম্লান করিয়া অর্দ্ধস্বরে কহিল—অ-সুদর্শন বাবু, শুনছেন?

মস্-মস্ করিয়া এই সময় নিকটে যুগপৎ কয়েক জোড়া বুটের শব্দ হইল; সঙ্গে সঙ্গে টর্চ্চের তীব্র রশ্মিতে স্থানটি আলোকিত হইয়া উঠিল। দুর্গা তারস্বরে বলিয়া উঠিল,—হেল্প্, হেল্প্! দস্যুর কবল থেকে পুলিশকে রক্ষা করুন।

পরক্ষণেই ভদ্রবেশধারী কতিপয় লোক স্থানটিকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে দলপতি-স্থানীয় এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন,—কি ব্যাপার এখানে, বলুন ত?

মোটরের ভিতর হইতে রক্তাপ্লুত মুখখানা অতি কষ্টে বাড়াইয়া ভগ্নকণ্ঠে সুদর্শন বলিয়া উঠিল,—বাহাদুর ডাকাত, ধরুন, হেল্প্ করুন পুলিশকে,—আমি পুলিশ-সুপার জাহ্নবী মিত্রের য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট।

বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া ঘোড়া টিপিল; কিন্তু 'ফচ্' করিয়া একটা শব্দ শুনা গেল মাত্র, ফায়ার হইল না।

আগন্তুকদের দলপতি তাঁহার রিভলভারটি বাহাদুরের দিকে তুলিয়া বলিলেন,—খবরদার! পাঁচটা গুলি এতে ভরা আছে, আমার সঙ্গীরাও সশস্ত্র। ভালো চাও ত, হাত তোল, ধরা দাও—

আগন্তুকের সঙ্গীরাও মিলিটারী কায়দায় তৎক্ষণাৎ বাহাদুরকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের স্ব স্ব হাতিয়ার উদ্যত করিল।

বাহাদুর পিস্তলটা ফেলিয়া দিয়া শিষ্টের মতই হাত দু'টি উঁচু করিয়া তুলিল। দুর্গা হাসিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল,—কেমন জব্দ! এই বার?

সুদর্শন নিক্ষিপ্ত রিভলভারটি দেখাইয়া উল্লসিত-কণ্ঠে বলিল,—ও রিভলভার পুলিশের। কিন্তু মোটর হইতে নামিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না; সেখানে বসিয়াই কোন রকমে বলিল,—বদমাসকে বাঁধুন, বাঁধুন—

কথার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা তাহার ঘুরিয়া গেল, মুখদিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না।

দুর্গা রিভলভারটি তুলিয়া লইল ও বাহাদুরের মুখের দিকে ধরিয়া বলিল,—হাত নামাও, তোমাকে বাঁধা হবে, ছোট সাহেবের হুকুম! তুমি আমার বন্দী।

কিন্তু দুর্গার এই স্বর কানে বাজিলেও, তাহার রণরঙ্গিণী মূর্তিটি সুদর্শনের আর দেখা হইল না, দৈহিক একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া সে তখন সংজ্ঞা হারাইয়াছে।

—সতেরো—

জাহ্নবী তাঁহার বাংলোর ড্রয়িং-রুমে অস্থিরভাবে ঘুরিতেছিলেন। রাত আটটা এই মাত্র বাজিয়া গিয়াছে; কিন্তু সুদর্শনের এখনও ফিরিবার নামটি নাই! ক্রোধের সঙ্গে তাঁহার মনে একটা দুশ্চিন্তাও যেন ক্রমাগত উঁকি দিতেছিল! এমন সময় পরদা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল বিচ্চু, তাহার হাতে চিঠি। চিঠিখানার আকৃতি দেখিয়াই জাহ্নবী চিনিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে এনেছে? ধরে রেখিছিস তারে?

বিচ্চু জানাইল,—কেউ আনেনি। বাইরে প'ড়েছিল। কি ক'রে এলো—কেউ জানে না।

কম্পিত-হস্তে চিঠিখানা খুলিতেই বাহির হইল সেই সাংঘাতিক লাল রোকা, ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত সেই তিনটি ছত্র অবিকল লেখা আছে—

বাহাদুরীর নমুনা

নমুনা নম্বর ২২

—বাহাদুর

চীৎকার করিয়া জাহ্নবী মিছিরকে ডাকিলেন। ডাক শুনিয়া সে ছুটিয়া আসিল; কিন্তু কেমন করিয়া চিঠিখানি তাঁহার ড্রয়িং-রুমের সামনে পড়িয়াছিল, তাহার কোন হদিসই সে দিতে পারিল না।

চীৎকারে ভীত হইয়া সুহাসিনী ছুটিয়া আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—আবার কি হ'ল?

—জাহ্নবী নীরবে চিঠিখানা গৃহিণীর হাতে দিলেন। তিনি ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিলেন,—আবার!—উঃ!

জাহ্নবী বলিলেন,—সুদর্শন এখনো ফেরেনি, এক দুর্গা ভিন্ন আর কেউ তার সঙ্গে নেই। সোফারকে পর্য্যন্ত সঙ্গে নেয়নি।

আর্ত্তস্বরে সুহাসিনী বলিলেন,—দেখ, এর পর কি খবর আবার আসে! আর যে ভাবতে পারিনে—

বাহিরে মোটরের হর্ণের শব্দ হইল। সচকিত হইয়া জাহ্নবী বিচ্চুকে বলিলেন,—দেখ্‌ত, ফিরলো বুঝি ওরা—

জাহ্নবী স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—যা আশা করেছিলুম, সব মিছে! ছেলেটা দেখতেই রাঙ্গা মুলো; বচনই সার, যাকে বলে—ওয়ার্থলেস! আসল কাজের ভাবনা চুলোয় দিয়ে, দুর্গাকে নিয়েই পাগল! এ আমি ভাল বুঝি না, আজ ওকে—

বিচ্চু এই সময় মুখের ভঙ্গীটা যে রকম বিকৃত করিয়া ঘরে ঢুকিল, তাহাতে কর্ত্তা গৃহিণী উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রশ্নের পূর্ব্বেই বিচ্চু সরোদনে সংবাদ দিল,—বাহাদুর ডাকু ছোট সাহেবকে ঠেঙ্গিয়ে আধমরা ক'রেছে।

য়্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ! বলিয়া সুহাসিনী আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। জাহ্নবী উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আর তোর দিদিমণি?

বিচ্চু কহিল,—তিনি ত গাড়ীতে নেই। অদ্বৈতবাবু ছোট সাহেবকে নিয়ে এসেছেন মোটরে ক'রে—

—কি বল্‌লি ? অদ্বৈতবাবু ?

—হ্যাঁ, হুজুর ! তিনিই ছোট সাহেবকে এনেছেন—

—কোথায় তাঁরা ?

—ছোট সাহেবের ঘরে—

গৃহিণীর দিকে চাহিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে জাহ্নবী বলিলেন,—চলো, দেখি কি ব্যাপার—

পরদা ঠেলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিতে ঢুকিতে অদ্বৈতবাবু বলিলেন,—এখন থাক, সুদর্শন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমটাই এখন ওর দরকার। ব্যাণ্ডেজ-ট্যাণ্ডেজগুলো আমি ডাক্তারখানা থেকেই ক'রিয়ে এনেছি।

সুহাসিনী মাথায় ঘোমটা টানিয়া ঘরের এক প্রান্তে সরিয়া গেলেন। স্বামীর মুখে এই ধনী ও বিশিষ্ট জমিদারটীর নাম তিনি বহুবারই শুনিয়াছেন। ইনিই তুমকার ব্যাপারে জাহ্নবীকে প্রচুর সাহায্য করেন, বিচ্চুকে জাহ্নবীর নিকট পাঠাইয়া দেন এবং বাহাদুরের সম্পর্কেও যথাসাধ্য ব্যবস্থার আভাষও দিয়াছিলেন। সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

জাহ্নবী মনের উদ্বেগ ও চাঞ্চল্য কোন রকমে দমন করিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া এই সম্মানভাজন মানুষটির সম্বর্দ্ধনা করিলেন, এবং তাঁহাকে একখানা আরাম-কেদারায় বসাইয়া দুর্গা ও সুদর্শনসম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি কাণ্ড ঘটেছে, আর আপনিই বা সুদর্শনকে কোথায় পেলেন—দয়া ক'রে বলবেন আমায় ? আর দুর্গা, আমার ভাইঝি—

জাহ্নবীর স্বর এখানেই রুদ্ধ হইয়া গেল।

অদ্বৈতবাবু বলিলেন,—সবই বলছি আমি। কাণ্ডটা অবশ্য খুবই বিতিকিচ্ছি গোছের; কিন্তু ঝঞ্ঝাট সব কেটে গেছে, ভাবনার আর কিছু নেই।

অতঃপর অদ্বৈতবাবু এ-দিনের সন্ধ্যার ব্যাপারটা—মোটরে চড়িয়া দুর্গা ও সুদর্শনের সফর হইতে আরম্ভ করিয়া বাহাদুরের হাতে সুদর্শনের চরম দুর্গতি পর্য্যন্ত সকল কথাই—অবশ্য যেমন তিনি দুর্গার মুখে শুনিয়াছেন—সমস্তই ব্যক্ত করিলেন। বিস্ময়ে অভিভূত জাহ্নবী আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলেন,—তার পর? আপনার সংযোগটা এ ব্যাপারের সঙ্গে কি ক'রে হল?

অদ্বৈত বাবু বলিলেন,—আপনার সঙ্গে আমার কথাই ছিল যে, এবার দুর্গোৎসবের আমোদটা দেওঘরে এসেই করা যাবে। দেবীপক্ষ প'ড়তেই গিন্নী ত অতিষ্ঠ ক'রে তুললেন। ভেবেছিলুম আপনাকেই লিখ্‌বো, কিন্তু বাহাদুরকে নিয়ে আপনি যে অশান্তির ভেতর পড়েছেন—তা জেনে আর আপনাকে ব্যস্ত করা উচিত মনে করিনি। তাই কুণ্ডার কুণ্ডেশ্বরীর সেবাইত মহাশয় আমার অনুরোধে কুণ্ডাতেই একখানা প্রকাণ্ড বাগানবাড়ী ঠিক ক'রে দেন। আজই আমরা সেখানে এসেছি। সন্ধ্যার পর আমরা বেরুই ঝাড়খণ্ডেশ্বর দেখ্‌তে। হঠাৎ শুনতে পাই মেয়ে-গলার একটা চীৎকার—'হেল্প্—হেল্প্!' শব্দ ধ'রে কাছে এসেই সব জানতে পারলুম। দলেও আমরা পুরু ছিলুম। বাহাদুর ত একলা, পারবে কেন? হাত তুলে তাকে ধরা দিতে হ'ল,—ধ'রলে তাকে আপনার ভাইঝি দুর্গাই।

আনন্দের আতিশয্যে বালকের মত চঞ্চল হইয়া জাহ্নবী বলিয়া উঠিলেন,—ধরা প'ড়েছে বাহাদুর, ধরা পড়েছে? সত্যি—ধরা পড়েছে? দুর্গা ধ'রেছে তাকে?

অদ্বৈত বাবু কহিলেন—হ্যাঁ, ধরা প'ড়েছে। আপাততঃ আমার বাড়ীতেই তাকে রাখা হ'য়েছে জাহ্নবীবাবু! আমার স্ত্রী দুর্গাকে এত-বড় হাঙ্গামার পর ছেড়ে দেননি। ভরসা করি, আপনি এতে রাগ করবেন না।

—রাগ করবো! আপনি কল্পনা করতেও পারবেন না অদ্বৈতবাবু, গত ক'মাস কি উদ্বেগের ভেতরেই আমি কাটিয়েছি! রাত্তিরে ঘুমোতে পারতুম না, একটু তন্দ্রা এলেই স্বপ্ন দেখতুম—লাল রোকা পড়ছি, আর বাহাদুর হাসছে! মিষ্টার হুইলার ওয়ার্ণিং দিয়েছেন—একটি মাসের ভেতর এর কিনারা করতে না পারলে আমাকে পুনর্মূষিক হতে হবে!—এ অবস্থায় দেবতার মত এসে আপনি আমার মুখরক্ষা করলেন! চিঠিতে যে একটু আভাষ দিয়েছিলেন, কাজে তাই দেখিয়ে দিলেন। আমি করবো আপনার ওপর রাগ!

—বাঁচলুম, আমার একটা ভাবনা কেটে গেলো। তাহ'লে নির্ভয়ে এবার গরীবের কুণ্ডার বাসায় যেতে অনুরোধ করতে পারি আপনাকে—শুধু একলা নয়, সস্ত্রীক এবং সপরিবার? দুর্গার মুখেই সব শুনবেন, বাহাদুরকেও দেখবেন।

জাহ্নবী উল্লসিত হইয়া বলিলেন,—আপনি না ব'ললেও যেতুম,—কেন না, ওটা এখন ডিউটির ভেতরে এসে-পড়েছে। আপনি যখন ব'লছেন—আমার স্ত্রীও অবশ্যই যাবেন বৈ কি ছেলে-মেয়ে নিয়ে। কিন্তু তার আগে কোতোয়ালীতে গিয়ে ডায়রিতে ব্যাপারটা লেখাতে হবে; এতে আপনারও সাহায্য দরকার। তা ছাড়া, এক দল কনেষ্টবল পাঠিয়ে এই রাত্তিরেই তাকে আমরা গারদে পুরে লক-আপ করতে চাই।

হাত দু'খানি যোড় করিয়া গম্ভীর মুখে অদ্বৈতবাবু বলিলেন,—ঐ বিষয়ে আমাকে কিন্তু মাপ করতে হবে জাহ্নবীবাবু! বাহাদুরকে লক-আপ করা চলবে না, এবং আজকের ব্যাপারটাও যথাযথ প্রকাশ পাবে না।

জাহ্নবী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! এ কি অদ্ভুত প্রস্তাব অদ্বৈতবাবুর? পুলিশের প্রেষ্টিজ রাখিতে আসিয়া তিনি কি না প্রেষ্টিজ ডুবাইতে

উদ্ধত! পুলিশের এত বড় শত্রুকে ধরিয়াও এভাবে রেহাই দিতে হইবে! ইহা যে কল্পনারও অতীত! বিস্মিত জাহ্নবী কণ্ঠস্বর রীতিমত গাঢ় করিয়া বলিলেন,—এ আপনি কি ব'লছেন অদ্বৈতবাবু! আপনার এ অনুরোধ রাখতে হ'লে পুলিশের মুখের চূণকালিও মুছবে না, প্রেষ্টিজও থাকবে না।

অদ্বৈতবাবু বলিলেন,—আমি এতটা বেকুব নই জাহ্নবীবাবু যে, আপনার প্রেষ্টিজটুকু বজায় না ক'রে এমন একটা প্রস্তাব ক'রে ব'সবো। ধরুন—এই রাত্তিরেই আপনি যদি বাহাদুরের আড্ডা থেকে ২২ দফা লুটের সমস্ত সম্পত্তিগুলি অক্ষতভাবে উদ্ধার করতে পারেন, আর কালই সদরে গিয়ে মিষ্টার হুইলারকে তার ফিরিস্তি দিয়ে জানান—আপনি আর আপনার য়্যাপ্রেণ্টিস্ য়্যাসিষ্টাণ্টের প্রাণপাত চেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছে; তার পর—বাহাদুর যদি একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাতে আপনার প্রেষ্টিজের ক্ষতিটা কি হবে? অপরাধের বিলোপ আর অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধার যদি হয়—অপরাধীকে ত্যাগ ক'রতে আপনার আপত্তি কি?

জাহ্নবী বলিলেন,—অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই হচ্ছে আইনের বিধি।

অদ্বৈত বলিলেন,—আইন আমি মানি, আইনের বিধিও জানি; আর আইন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিচিও অনেক। আইন বাঁচিয়েই কাজ আমি করবো। আপনি আমাকে বিশ্বাস ক'রেই চলুন,—কোতোয়ালী থেকে পুলিশ নিলেও ক্ষতি নেই; কিন্তু আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে—এ ব্যাপারে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করবেন না—আপনি।

জাহ্নবী নিরুপায় হইয়া বলিলেন,—বেশ, আমি এই প্রতিশ্রুতিই দিলুম।

—আঠারো—

গভীর রাত্রি। অদূরবর্ত্তী কুণ্ডেশ্বরী-মন্দিরের পেটা-ঘড়ি উচ্চরোলে এইমাত্র দ্বিপ্রহর ঘোষণা করিয়াছে। অদ্বৈতবাবুর বাসায়—সুবৃহৎ বাগান-বাড়ীর একটি কক্ষে একখানি অরোম-কেদারায় বাহাদুর আড় হইয়া পড়িয়া আছে,—ঘরের এক প্রান্তে একখানি খাটিয়ার উপর প্রসারিত তাহার শয্যাটির অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সে এ-পর্য্যন্ত তাহা স্পর্শও করে নাই! কোণের দিকে টিপয়ে মিট্‌মিট্ করিয়া একটি হরিকেন জ্বলিতেছে, তাহার স্বল্প আলোকে সুবৃহৎ ঘরখানির আসবাব-পত্র, এবং আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত মানুষটির মুখখানা সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছে না।

হঠাৎ বাহিরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পাতুকার শব্দ ঘরের মানুষটিকে সচকিত করিয়া তুলিল। পরক্ষণেই কক্ষমধ্যে ঢুকিলেন—অদ্বৈতবাবু, এবং তাঁহার পশ্চাতে পুলিশ-সাহেবের ইউনিফরমে সজ্জিত জাহ্নবী মিত্র। বাহাদুর তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার শ্মশ্রুল মুখখানা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—পেলেন সব?

কাছেই আর দুইখানি আরাম-কেদারা ছিল। অদ্বৈতবাবু জাহ্নবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আসুন, বসা যাক; বাকি কথাগুলোও ত জানতে হবে আপনাকে।

এক সঙ্গেই উভয়ে অপর দুইখানি চেয়ারে বসিলেন। অদ্বৈতবাবু বাহাদুরের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ব'স বাহাদুর! হ্যাঁ, এবার তোমার

প্রশ্নের উত্তর দিই,—যে বাড়ীর কথা বলেছিলে, ফিরিস্তি-মত সবই সেখানে পাওয়া গেছে—টাকা, গয়না, নোট, পিস্তল, সুটকেশ, ক্যাস-বাক্স—একুশ দফা লুঠের সমস্তই; কিছুই এদিক-ওদিক হয়নি। এক জন সাব-ইন্‌সপেক্টরের জিম্বায় সে-সব কোতোয়ালীতে পাঠানো হ'য়েছে।

বাহাদুর বলিল,—আর, বাইশ দফার রিভলভারটা—

অদ্বৈতবাবু বলিলেন,—দুর্গা মায়ীর কাছে আছে। সেটা ত আর লুঠ হ'তে পারেনি, তাই ফিরিস্তিতে ওঠেনি। জাহ্নবীবাবুর পার্শন্যাল প্রপারটি ওটা, ওঁকে দিলেই হবে। হাঁা, জাহ্নবীবাবু, এখন আপনার যদি এঁকে কিছু জেরা করবার থাকে, করতে পারেন। আপনাকে তখনো ব'লেছি, এখনো ব'লছি—মিছে কথা বাহাদুর একটিও ব'লবে না, সবই ও স্বীকার ক'রবে।

জাহ্নবী এতক্ষণ তাঁহার তীক্ষ্ণ দুটি চক্ষুর সন্ধানী দৃষ্টি এই সাংঘাতিক মানুষটির দিকে নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন। ঘণ্টা দুই আগে এই লোকটিকে যখন প্রথম দেখেন, তখন ইহার শ্মশ্রুল মুখের যে উদাস ভাবটুকু তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল এখনও তাহা অব্যাহতই দেখিলেন। কিন্তু ইহার স্বীকারোক্তি সত্যে অনুরঞ্জিত হইলেও—ইহারই কথিত নির্দ্দিষ্ট একটি বাড়ীর মধ্যে সুরক্ষিত লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি আবিষ্কৃত হইলেও—জাহ্নবী মিত্র ক্রিমিন্যালিটির প্রতীকস্বরূপ এই ভয়ঙ্কর লোকটিকে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। অদ্বৈতবাবুর প্রশ্ন তাঁহাকে যেন প্রকৃতিস্থ করিয়া দিল। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—আমি শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই অদ্বৈতবাবু, সমস্ত সাবডিভিসানকে এ ভাবে জ্বালিয়ে তোলাবার মূলে কি উদ্দেশ্য এর ছিল?

দিব্য সহজ সুরেই বাহাদুর উত্তর দিল,—আপনার মস্ত একটা ভুল ভেঙ্গে দেওয়া।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জাহ্নবী বক্তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন, আয়ত্তাধীন অপরাধীর মুখ হইতে যে এরূপ নির্ভীক, সুস্পষ্ট উত্তর বাহির হইবে, ইহা তিনি প্রত্যাশা করেন নাই। কিন্তু প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া, মনের রাগ মনেই চাপিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন,—এ কথার মানে ?

বাহাদুর উত্তর দিল,—মানে এই—ক্ষমতার দ্বারা পালিত প্রবৃত্তি দিয়ে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্যপদ্ধতির বিচার করতে বসে গোড়াতেই আপনি যে ভুল করেছেন, তারই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে—বাহাদুরের বাহাদুরী।

এই দুর্বোধ্য কথাগুলির অর্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে জাহ্নবী পুনরায় বক্তার দিকে চাহিলেন। বক্তা এবার কথাটার অর্থ আরও সরল করিয়া দিল, কহিল,—ধরুন, রাম ছেলেটির সবই ভালো, আর-সকলের মতে সে আদর্শ ছেলে। কিন্তু এই অতি ভালোটাই হয় ত আপনার চোখে ঠেকলো অত্যন্ত খারাপ। রামের শক্ত চেহারা, গায়ের শক্তি, মনের তেজ পুলিশকে দিলে তাতিয়ে। বড় রকমের কিছু ব্যাপারে ভলনটিয়ারী ক'রে রাম পুলিশকেও অবাক করে দেয়। রাম অন্যায়ের দিক দিয়ে যায় না, আইনকেও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তা-ব'লে পুলিশকে সে প্রভুর আসনে বসাতে নারাজ, উলটে—পুলিশকে সে চাকরের সামিল করে কাজ আদায় করে নিতে চায়। পুলিশ উঠলো অমনি ফোঁস করে, বললে,—এ অন্যায়, আস্পর্দ্ধা। রাম ভাবলে—ঠিক রাস্তাই সে ধরেছে, পথ তার খোলা। এই নিয়ে বাধলো ঝগড়া ; শেষে ঘটনাচক্রে সেটা ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়ালো, আর পুলিশ বাগে পেয়ে রামকে বললে—নিকালো। শুধু তাই নয়, ক্ষমতার জোরে তাকে জেলে পুরবার জন্যে হন্যে হয়ে উঠলো। রাম বলে গেলো—এ ভুল আপনার ভাঙ্গবে। এর পর সেই রাম যদি বাহাদুরী ক'রে পুলিশের ভুলটা ভেঙ্গে দিতে তার মাথা খাটায়—সেটা কি অন্যায় হয়েছে ?

জাহ্নবী চেয়ার ছাড়িয়া সহসা সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—তুমি—তুমি—তাহলে—কি নাম তার ? তুমি—তুমি—

মৃদু হাসিয়া বাহাদুর বলিল—প্রতাপ দত্ত,—হ্যাঁ, আমিই সেই লোক, মরিনি। কিন্তু এ ব্যাপারেও আপনি হেরেছেন। ত্রিকূটের দুর্ঘটনাকে আড়াল করেই আমি অদৃশ্য হই, কিন্তু আমার মৃত্যু রটনাকে আপনি ভেবেছিলেন সত্যি।

ইতিমধ্যে মুখের কেয়ারী করা দাড়ি-গোঁফ নিশ্চিহ্ন করিয়া সে বলিল,—আর, সম্পর্কের দিক দিয়ে আমি আপনার অনুগত ভৃত্য। কেন না, আপনার জ্যেষ্ঠ ছিলেন আমার পিতৃতুল্য গুরু।

অভিভূতের মত জাহ্নবী মিত্র সে দিনের লাঞ্ছিত বিতাড়িত ও উদ্ধত ছেলেটির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার হিসাবের ভুলটুকু আজ বুঝি খতাইতে বসিলেন !

—উনিশ—

বাংলোর ড্রয়িং রুম।

জাহ্নবী মিত্র মিষ্টার হুইলারের চিঠিখানা মনে মনে তর্জ্জমা করিয়া সুহাসিনীকে শুনাইতেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে পাঞ্জাবী জমাদার দুমকা হইতে মোটরসাইকেলে বিভাগীয় পুলিশের বড়কর্ত্তার অন্য চিঠি আনিয়াছিল, সেই লোকটিই কিছু পূর্ব্বে সেই ভাবে আসিয়া এই চিঠিখানি দিয়া গিয়াছে। জাহ্নবী পড়িতেছিলেন—

প্রিয় মিষ্টার মিত্র,—

আমার পূর্ব্ব-পত্রের মর্য্যাদা তুমি যে ঠিক একুশ দিনের মাথায় এভাবে রক্ষা করতে পেরেছো—এজন্য অত্যন্ত আনন্দের সহিত তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। চুলোয় যাক্ তোমার বাহাদুর, তার দেহটার জন্য মাথা ঘামাবার কোন দরকার আর নেই আমাদের। তুমি যে তোমার সহকারী মিঃ বোসের সহযোগিতায় তার হাত থেকে সমস্ত লুণ্ঠিত মাল উদ্ধার ক'রে পুলিশ-বিভাগের সুনাম রক্ষা করতে পেরেছ—এই যথেষ্ট। এর উপযুক্ত পুরস্কার সরকার তোমাকে

দেবেন। আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—শীঘ্রই তুমি ভাগলপুর ডিভিসনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে পাকা হ'য়ে বসবে, আর আসছে বার্থডে গেজেটে—রায় বাহাদুর খেতাব তোমার নামের সঙ্গে ছাপা হয়েছে—দেখতে পাবে। তোমার য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট মিঃ বোসকে ইন্‌স্পেক্টরের পদে পাকা করবার জন্য আমি সরকারে সুপারিস ক'রেছি। তার মঞ্জুরী শীঘ্রই পাবে। তোমার বাহাদুর একখানা চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, তোমাদের মত দু'টো জবরদস্ত অফিসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়েই সে সব ছেড়ে-ছুড়ে পালাচ্ছে ; এ পথে আর সে কোন দিন ভিড়বে না। ডাকাতের এই সার্টিফিকেটের দামও একটা আছে,—সুতরাং ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠিখানা এখানেই শেষ করছি।

তোমার বিশ্বস্ত

হুইলার

সুহাসিনী এক মুখ হাসিয়া বলিলেন,—এবার সাহেবের উল্‌টো সুর ! মুস্কিল হ'ল এখন দুর্গাকে নিয়ে। এদের ব্যাপার যে কি ক'রে মিটবে—

বিচ্চু আসিয়া এই সময় খবর দিল—অদ্বৈতবাবু এসেছেন।

জাহ্নবী বোধ হয় ইঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নিজেই উঠিয়া-গিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া ভিতরে আনিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিতেই হুইলার সাহেবের চিঠিখানি তাঁহার হাতে দিয়া জাহ্নবী বলিলেন—পড়ুন।

পড়িতে পড়িতে অদ্বৈতবাবুর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল: বলিলেন—এখন ত বিশ্বাস হ'ল, বুঝতে পারছেন ত—বিগত অপ্রীতিকর ব্যাপারটাই আপনার পক্ষে শাপে বর হ'য়ে দাঁড়ালো। প্রতাপ আপনার অদৃষ্টের দুয়ারটা আরও খুলে দিয়েছে, সেই সঙ্গে সুদর্শনেরও।

জাহ্নবী নীরবে অদ্বৈতবাবুর মুখের দিকে চাহিলেন। আজ আর তাঁহার মুখের ভঙ্গীতে ও চোখের দৃষ্টিতে বিরক্তি বা বিরাগের চিহ্নটুকুও নাই।

অদ্বৈতবাবু বলিলেন,—দেখুন জাহ্নবীবাবু, বাহাদুরের সম্পর্কে আপনি ত ব্ল্যাঙ্কচেক সই ক'রে দিতে রাজী ছিলেন; সেই চেকখানা আমি এখন চাইতে পারি কি?

প্রসন্ন মুখে জাহ্নবী বলিলেন,—নিশ্চয়ই পারেন; কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক-চেক দিলেও আপনার ঋণ পরিশোধ হবে না ত অদ্বৈতবাবু!

অদ্বৈতবাবু বলিলেন,—যাতে হয়, সেই যুক্তিই আমি দিচ্ছি জাহ্নবীবাবু! আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই—কি উদ্দেশ্যে আমরা দেওঘরে এসেছি?

জাহ্নবী হাসিয়া কহিলেন,—দুর্গোৎসবের আনন্দটুকু উপভোগ করা ত?

অদ্বৈতবাবু উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ; তবে হাতে-কলমে সেই উৎসবটা সম্পন্ন ক'রে।

বিস্ময়ের সুরে জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—বটে! তাহ'লে মা-দুর্গাকে আপনি কুণ্ডার বাসায় আনচেন না কি অদ্বৈতবাবু?

অদ্বৈতবাবু কহিলেন,—মা-দুর্গা পায়ে হেঁটেই আমার বাসায় গিয়েছেন; কিন্তু উৎসবটা করতে যে আপনার অনুমতিটুকু আগেই প্রয়োজন জাহ্নবী বাবু! আর তার সঙ্গে চাই মন-খোলা প্রীতির সংযোগ।

বক্তার প্রশান্ত মুখখানার উপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটুকু নিবদ্ধ করিয়া জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্যাপারখানা খুলে বলুন ত।

অদ্বৈতবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন,—মহাসপ্তমীর দিন মা-দুর্গার আমি অর্চ্চনা করতে চাই জাহ্নবীবাবু—ধান-দুর্ব্বা আর চন্দন দিয়ে, আমার ভাগিনেয় শ্রীমান প্রতাপ দত্তের অভিভাবক হ'য়ে। এই অনুমতিই আমি প্রার্থনা ক'রতে এসেছি আপনার কাছে জাহ্নবীবাবু!

বিস্ময়ানন্দে উৎফুল্ল হইয়া জাহ্নবী বলিয়া উঠিলেন,—কি ব'ললেন? প্রতাপ আপনার ভাগনে!

মৃদুস্বরে অদ্বৈতবাবু জানাইলেন,—হ্যাঁ, আজ আপনাকে বলছি—বাড়ীতে আমার বহু পোষ্য;—কিন্তু নিজের সন্তান ব'লতে কেউ নেই, অভাবটা পূর্ণ ক'রেছে ঐ প্রতাপ। ঐ আমার সর্ব্বস্ব, আমার একমাত্র ওয়ারিস। এছাড়া ওর পৈতৃক সম্পত্তির আয়ও কম নয় জাহ্নবীবাবু! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী অপাত্রে পড়বে না, এ ভরসা আমি দিচ্ছি।

জাহ্নবী বলিলেন,—আপনি আমাকে অবাক ক'রে দিলেন দেখছি!

অদ্বৈতবাবু কহিলেন,—কিন্তু জবাব ত পেলুম না জাহ্নবীবাবু?

পশ্চাতে শঙ্খধ্বনি শুনিয়া অদ্বৈতবাবু চমকিত হইলেন; চাহিয়া দেখিলেন, সুহাসিনী পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার হাতে শঙ্খ, মুখে নির্ম্মল

হাস্য। তিনি কহিলেন,—জবাব পেয়েছেন ত অদ্বৈতবাবু, তাহ'লে দুর্গোৎসবের আয়োজন করুন। কিন্তু আমরা যেন বাদ না পড়ি।

অদ্বৈতবাবু আহ্লাদে গদ-গদ স্বরে কহিলেন,—মা-মেনকাকে বাদ দিয়ে কি দুর্গোৎসব হ'তে পারে কখনো? বিশেষ ক'রে তিনিই যখন শাঁখ বাজিয়ে উৎসব ঘোষণা করলেন! তাঁকে করযোড়ে জানিয়ে যাচ্ছি—মহা-সপ্তমীর উষায় কুণ্ডেশ্বরীর মন্দিরেই হবে আমাদের দুর্গোৎসব।

জাহ্নবী চোখ দুটি কপালে তুলিয়া এই অদ্ভুত মানুষটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

অদ্বৈতবাবু বলিলেন—নূতন ইউনিভারসিটী হচ্চে, তার কথা শুনেছেন ত, আপনার দাদা ছিলেন তার প্রবর্ত্তক, তাঁর অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করবে প্রতাপ, দুর্গা দেবে তাকে প্রেরণা সহধর্ম্মিণীর পরিপূর্ণ-শক্তি প্রয়োগ করে। তারপর আমরাত আছিই। আপনিও বাদ যাবেন না জাহ্নবীবাবু! আপনার দাদার কীর্ত্তি-মন্দির—এই আদর্শ ইউনিভারসিটী আমাদের খাড়া করতেই হবে। **বিহার-প্রবাসী আঠারো লক্ষ বাঙ্গালীর এই হবে সাধনা।**

কুণ্ডেশ্বরী মন্দিরের সেবাইত মহাশয় এই সময় হাসিমুখে জাহ্নবীবাবুর ড্রয়িংরুমে ঢুকিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সম্বর্দ্ধনার সুরে জাহ্নবী বলিলেন,—আসুন, আসুন—কি সৌভাগ্য!

সৌম্যমূর্ত্তি ঋষিকল্প সেবাইত মহাশয় সহাস্যে কহিলেন—সৌভাগ্য বাঙ্গালীর, যে এত বড় ত্যাগী পুরুষকে আমরা পেয়েছি জাহ্নবীবাবু! জানেন —এই অদ্বৈত বাবুটির সত্যকার পরিচয়? জানেন সমস্ত ব্যাপারটার গোড়ায় আছে কি?

সপ্রশ্নদৃষ্টিতে জাহ্নবী সেবাইত মহাশয়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

সেবাইত মহাশয় কহিলেন—আগাগোড়াই মায়ের খেলা, দুই প্রবাসী বাঙ্গালীর ভেতরে ছিল অহি-নকুল সম্বন্ধ। অদ্বৈতবাবুর স্বার্থ-বলির ফলে সেখানে হয়েছে হর-হরির মিলন। বিবাদী জমি আর সঞ্চিত বাইশ লক্ষ টাকা ইনি একলাই দিয়েছেন আপনার দাদার কীর্ত্তি-মন্দির তুলতে—বাঙ্গালীর একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠান রচনা করতে। আপনাকে দলে ভেড়াতে মায়ের ইচ্ছায় অনেক কাণ্ডই এঁকে করতে হয়েছে। আসলে সবই মায়ের ইচ্ছার খেলা, মানুষের ভাগ্য নিয়ে মা জগদম্বার—আলো ছায়ার খেলা।

পরদার পাশ দিয়া মুখখানি বাড়াইয়া বিচ্চু এই সময় কহিল—দিদিমণি এসেছেন হুজুর!

ঘরের সকলেরই দৃষ্টি দরজার পরদাটির দিকে আকৃষ্ট হইল। বিচ্চু অতঃপর মুখখানি হাসিতে ভরাইয়া ও সেই সঙ্গে তাহার কালো মুখের উপর সাদা সাদা দাঁতগুলির সবকয়টি বিকাশ করিয়া কহিল—আর,—তাঁর সঙ্গে সেই—বাহাদুর!

পিছন হইতে দুইটি সবল হস্তের মৃদুমন্দ চাপে বিচ্চুর বিহসিত মুখখানি সহসা মুসড়াইয়া গেল। সেই অবস্থায় তাহাকে ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিল প্রতাপ ও তাহার পিছু পিছু দুর্গা।

বিচ্চু তাহার বিচিত্র মুখখানার এক অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া তাহাদের পানে চাহিল।

কুণ্ডেশ্বরীর সেবাইত মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম হাসিমুখে এই দুইটি বাঞ্ছিত তরুণ-তরুণীকে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট-ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন—আরে এসো-এসো—বাবাজী এসো, দুর্গামায়ী এসো; জাহ্নবী বাবুর ঘরখানি, এতক্ষণে সত্যিসত্যিই আলোয় কুরকুট্টি হল।

জাহ্নবী আজ প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া ও একখানি চেয়ার দেখাইয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন—বস, বাবা—বস।

দুর্গা পিতৃব্যের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সুদর্শন বাবু, কেমন আছেন কাকাবাবু?

জাহ্নবী উত্তর দিলেন—ক'দিন ত জ্বরে ও বেহুঁস হয়েই ছিল। জ্বর একশো চার পর্য্যন্ত উঠেছিল। হরিহরবাবু, কালীবাবু, সৌরীণবাবু, পরেশবাবু চার জনকেই কল্ দেওয়া হয়েছিল, কাল থেকে অনেকটা সামলেছেন।

দুর্গা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—জ্বর ছেড়েছে?

জাহ্নবী বলিলেন—না, তবে নেমেছে। সকালে ছিল একশো এক। পরশু থেকে জ্ঞান হয়েছে। কথাবার্ত্তাও কয়েছে, তবে মুখখানা এখনো ফুলে আছে, আর নাকটাত ব'সে বোঁচা হয়ে গেছে বললেই হয়!—কথাটার সঙ্গে সঙ্গে চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটি একবার প্রতাপের মুখের উপর না ফেলিয়া পারিলেন না!

প্রতাপ মুখখানা ফিরাইয়া লইল।

পিতৃব্যের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে দুর্গা কহিল—আমি একবার সুদর্শন বাবুকে দেখে আসব কাকাবাবু?

ড্রয়িং রুমের দ্বারদেশ হইতে দুর্গার এই কথাটার উত্তর অতিশয় তীক্ষ্ণ স্বরেই আসিল—থাক্, অত দয়া দেখিয়ে দরকার নেই আর।

সকলেই সবিস্ময়ে স্বর লক্ষ্য করিয়া চাহিতেই দেখিলেন—পরদার পী পীঠ দিয়া ও দ্বারের একটা অংশ ধরিয়া প্রেতের মত ভয়াবহ মূ দাঁড়াইয়া আছে সুদর্শন। মুখখানা তাহার ভীমরুলের চাকের মত ফু উঠিয়াছে, নাকের টিকালো ডগাটি দুমড়াইয়া গিয়াছে, অমন যে সুন্দর আকৃতি, তাহার কি কদর্য্য পরিণতিই হইয়াছে!

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দুর্গা কহিল—সুদর্শন বাবু!

বিকৃত মুখখানা আরও কদর্য্য করিয়া সুদর্শন কহিল—থামো! তোমাদের চালাকী আর চালবাজী পুলিশ-সুপার জাহ্নবী বাবুর কাছে চাপা থাকলেও আমি সব জেনেছি।

জাহ্নবী মুখখানা নামাইয়া লইলেন, কথাটার উত্তর দিলেন না।

অদ্বৈতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি জেনেছ?

সুদর্শন কহিল—আপনি কি জানেন না অদ্বৈতবাবু? নাটের গুরুই ত ...পনি। জাহ্নবী বাবু আপনার ভাঁওতায় ভুলে আপনাকে মস্ত মা...কার ভেবে আহ্লাদে আটখানা হয়েছেন, কিন্তু এতে পুলিশের প্রেষ্টিজটাকে ... তার পা... থেঁতলে ফেলেছে...—সে দিকে ওঁর হুঁস নেই! এতে চোরকে ... ...কে অপর...কে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না? আমি যদি ওঁর জায়গায় ...—তাহলে ঐ ডাকাতটাকে—

সুদর্শনের দেহের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার মনের এই বিপুল উত্তেজনার ...রটি বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল, সুতরাং এইখানের সুদর্শনের ...গানি বন্ধ ও দেহটি ধরাশায়ী হইবার জো হইল।

অদ্বৈতবাবু তাহার অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ঠিক সময়েই ... উঠিয়া তিনি সুদর্শনকে ধরিয়া একখানি সোফার উপর বসাইয়া ...লেন। তাহার পর মৃদু হাসিয়া কহিলেন—তোমার কথাটা আমিই ... শেষ করছি বাবাজী, তাতে কি হয়েছে। তুমি ততক্ষণ একটু জিরে... ... ...ন দিয়ে নাও। ভাবনা কিছু নেই, কথা শোনানো আর ...না, এই ত আমাদের দেনা-পাওনা—

সুদর্শন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া অদ্বৈতবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ... ...ড় বিজলী ...ার সুইচটি খুলিয়া দিল।